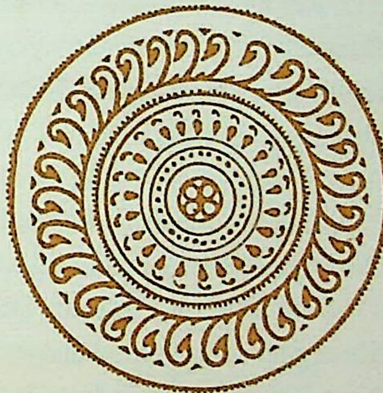
Bengali
2001

মা আনন্দময়ী

অমৃত বার্তা



VOL.-5 JANUARY - 2001 NO.1

SHREE SHREE ANANDAMAYEE SANGHA

❄ Branch Ashrams ❄

1. AGARPARA : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, P. O. Kamarhati, Calcutta-700058 (Tel : 033-5531208)
2. AGARTALA : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, Palace Compound, P.O. Agartala-799001. West Tripura
3. ALMORA : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, Patal Devi, P.O. Almora-263602, (Tel : 05962-33120)
4. ALMORA : Shree Shree Ma Anaudamayee Ashram, P.O. Dhaul-China, Almora-263881, (Tel : 05962-62013)
5. BHIMPURA : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, Bhimpura, P.O. Chandod, Baroda-391105, (Tel : 02663-833208
6. BHOPAL : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, P. O. Bairagarh, Bhopal-462030, M.P. (Tel : 0755-521227)
7. DEHRADUN : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, Kishenpur, P.O. Rajpur, Dehradun-248009 (Phone : 0135-734271)
8. DEHRADUN : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, Kalyanvan, 176, Rajpur Road, P.O. Rajpur, Dehradun-248009, (Phone : 0135-734471)
9. DEHRADUN : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram. P.O. Raipur Ordnance Factory, Dehradun-248010
10. DEHRADUN : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, 47/A Jakhan, P.O. Rajpur, Dehradun,
11. JAMSHEDPUR : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, Near Bhatia Park, Kadma, Jamshedpur-831005, Bihar
12. KANKHAL : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, P.O. Kankhal, Hardwar-249408, (Tel : 0133-416575)
13. KEDARNATH : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, Near Himlok, P.O. Kedarnath, Chamoli-246445,
14. NAIMISHARANYA : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, Puran Mandir, P.O. Naimisharanya, Sitapur-261402, U.P.

মা আনন্দময়ী — অমৃতবার্তা

শ্রীশ্রী মা আনন্দময়ীর দিব্য জীবন
ও
অমূল্যবাণী সম্বলিত ত্রৈমাসিক পত্রিকা

বর্ষ - ৫ | জানুয়ারী, ২০০১ | সংখ্যা — ১

❋

❋

বার্ষিক চাঁদা (ডাক ব্যয়সহ)

ভারতে - ৬০/- টাকা
বিদেশে - ১২ ডলার অথবা ৪৫০/- টাকা
প্রতি সংখ্যা - ২০/- টাকা

মুখ্য নিয়মাবলী

❋ ত্রৈমাসিক পত্রিকা বাংলা, হিন্দী, গুজরাতী ও ইংরাজী এই চার ভাষায় পৃথক পৃথকভাবে বৎসরে চারবার জানুয়ারী, এপ্রিল, জুলাই এবং অক্টোবর মাসে প্রকাশিত হইয়া থাকে। পত্রিকার বর্ষ জানুয়ারী সংখ্যা হইতে আরম্ভ হয়।

❋ প্রধানতঃ শ্রী শ্রী মায়ের দিব্য জীবন ও অমূল্যবাণী বিষয়ক প্রবন্ধাদি প্রকাশনই এই পত্রিকার মুখ্য উদ্দেশ্য। অবশ্য দেশ-কাল-ধর্ম্ম ও সম্প্রদায় নির্বিশেষে যে কোন আধ্যাত্মিক বা দার্শনিক হৃদয়গ্রাহী প্রবন্ধ এবং বিশিষ্ঠ মহাপুরুষদের জীবনী ও উপদেশ সম্বলিত লেখা সাদরে গৃহীত হইবে। নিতান্ত ব্যক্তিগত অনুভব ব্যতীত শ্রী শ্রী মায়ের দিব্যলীলা বিষয়ক লেখাও শ্রী শ্রীমায়ের অগণিত ভক্তবৃন্দের নিকট হইতে আশা করা যাইবে।

❋ প্রতিটি লেখা সাদা কাগজের এক পৃষ্ঠায় সুস্পষ্ঠ অক্ষরে লিখিত থাকা বিশেষ আবশ্যক। কোনও কারণবশতঃ লেখা পত্রিকায় প্রকাশিত না হইলে লেখকের নিকট ফেরৎ পাঠান অসুবিধাজনক।

❋ অগ্রিম বার্ষিক চাঁদা কেবলমাত্র মনি অর্ডার বা ডিমান্ড ড্রাফ্ট দ্বারা **"Shree Shree Anandamayee Sangha - Publication A/C"** এই নামে পাঠাইবার নিয়ম।

❋ পত্রিকা সম্পর্কিত যোগাযোগ নিম্নলিখিত ঠিকানায় করিতে হইবে –

Managing Editor,
Ma Anandamayee - Amrit Varta
Mata Anandamayee Ashram
Bhadaini, Varanasi - 221 001

❖ ❖ ❖ ❖ ❖

পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিবার নিয়ম ঃ-
সম্পূর্ণ পৃষ্ঠা — ২০০০/- বাৎসরিক
অর্দ্ধেক পৃষ্ঠা — ১০০০/- "
১/৪ পৃষ্ঠা — ৫০০/- "

বিজ্ঞাপনের বিষয়বস্তু সহ অগ্রিম টাকা উপরোক্ত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

শ্রীশ্রী আনন্দময়ী সংঘের পক্ষে মুদ্রক ও প্রকাশক শ্রী পানু ব্রহ্মচারী দ্বারা শ্রী শ্রী আনন্দময়ী সংঘ, ভাদাইনী, বারাণসী - ২২১ ০০১ উঃপ্রদেশ হইতে প্রকাশিত এবং রত্না প্রিন্টিং ওয়ার্কস, বি ২১/৪২ কামাচ্ছা, বারাণসী - ১০ হইতে মুদ্রিত। সম্পাদক — শ্রী পানু ব্রহ্মচারী।

সূচীপত্র

*

"হরি কথাই কথা, আর সব বৃথা ব্যথা।"

— শ্রীশ্রী মা

পেন্‌সিলভেনিয়া আমেরিকাতে স্থায়ী রূপে পঞ্জীকৃত প্রতিষ্ঠান "মা আনন্দময়ী সেবা সমিতি'র পক্ষ হতে পরমারাধ্যা শ্রীশ্রীমায়ের সকল ভক্তজনকে সপ্রেম 'জয় মা' জানানো হচ্ছে।

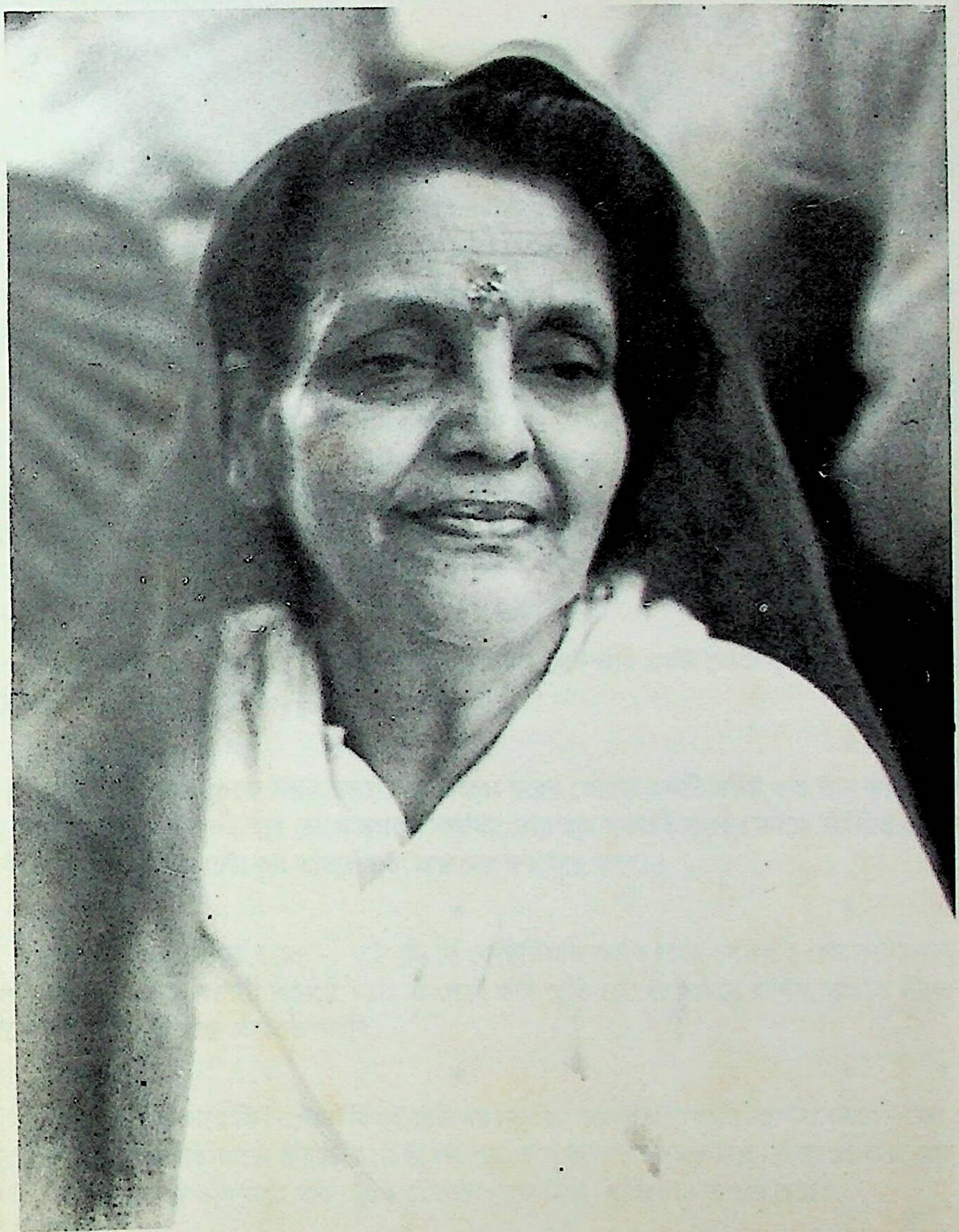
এই প্রতিষ্ঠানের মুখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে শ্রীশ্রীমায়ের জীবনলীলা ও অমূল্য বাণীর প্রচার, বিবিধ আধ্যাত্মিক কার্য্য সম্পাদন। সৎসঙ্গের পরিচালন, সনাতন ভাগবৎ ধর্ম্মযুক্ত প্রক্রিয়ার পরিচালনা এবং জনজনার্দ্দনের সেবা।

আমেরিকান সরকার দ্বারা এই সমিতি আয়কর হতে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত ঘোষিত হয়েছে —No. 23/2967597/I.R.S Code 501 (C) (3)

আমেরিকা ও নিকটবর্ত্তী দেশসমূহের স্থায়ী রূপে নিবাসী ভক্তদের কাছে অনুরোধ জানানো হচ্ছে যে 'মা আনন্দময়ী অমৃতবার্তা' (ত্রৈমাসিক পত্রিকা যা বাংলা, ইংরাজী, হিন্দি ও গুজরাতী এই চার ভাষায় প্রকাশিত হয়ে থাকে) সেই পত্রিকা এবং শ্রীশ্রী মায়ের দিব্যজীবন লীলা ও অমূল্য বাণী সম্বলিত নানা গ্রন্থ উপরোক্ত সেবা সমিতির কাছ থেকে সংগ্রহ করতে পারেন।

বিস্তৃত বিবরণের জন্য নীচের ঠিকানায় সম্পর্ক স্থাপন করুন —

Dr. Mahadev R. Patel
Ma Anandamayee Seva Samiti Inc.
212 Moore Road
Wallingford, P.A. 19086-6843
Tel : 610-876-6862, Fax : 610-879-1351



মাতৃ-বাণী

যেখানে ভগবানের নামকীর্ত্তন বা তাঁর গুণগান হয় তিনি সেখানে বিরাজমান। তাঁর ছেলেমেয়ে যেখানে তাঁর গুণগান করছে তিনি তো সেইখানে আছেনই।

* * *

গাছের তলায় বসতে হয়, মানে সব সময় সৎসঙ্গ করতে হয়। গাছের তলায় বসলে কেউ যেতে বলবে না অথচ ফলটি ও পাওয়া যায়।

* * *

যে পেয়েছে সে জানে, পরীক্ষা দেবে কেন? এটা তো অনুভবের বিষয়। দিল্লী যেতে হলে হেঁটে যেতে পারো, রেল গাড়ীতে যেতে পারো - মোটরে - প্লেনে। এক একজন এক -এক রকম বিবরণ দেবে। কিন্তু যিনি দিল্লীতে থাকেন তিনি সহরের সব কিছু জানেন, তিনি প্রত্যেকের কাছ থেকে শুনে বলবেন যে হ্যাঁ, তোমারটা ঠিক তুমিই ঠিক। এখানে বিরোধের প্রশ্ন নেই। যিনি প্রকৃত আত্মদর্শন করেছেন তিনি সব বিরোধের মীমাংসা করে দেবেন।

* * *

বাবা বুঝতে চেষ্টা করলেই মুস্কিল। একটা বোঝা নামালেই আর একটা বোঝা তুলতে হবে। কিছু করলে হবে না, সম্পূর্ণ করতে হবে।

* * *

সাধারণ গৃহধর্মীর পক্ষে ঈশ্বর চিন্তার জন্য অন্ততঃ ঘরের কোণায় একটি নির্দিষ্ট শুদ্ধ স্থান করা আবশ্যক। যে ভগবৎ প্রেমে সর্ব্বত্যাগী, যার চোখে ভগবান সর্ব্বময়, তার স্থান সর্ব্বত্রই সুলভ। মনকে নিয়মিত করে সকল অবস্থার উপরে উঠবার চেষ্টা কর তাহলে স্থান অস্থানের দ্বন্দ্ব ঘুচে যাবে।

* * *

"কর্ম্মে শুধু তাঁরি সেবা হচ্ছে" — এই বুদ্ধি তে যে স্থিতিলাভ করতে পারে, সে কর্ত্তব্য শেষ করে ফলাফলের আশায় ফিরে চায় না। কর্ম্মের আরম্ভে, মধ্যে ও শেষে তাঁর স্মৃতি চোখের সামনে রাখিস, তাহলে সকল কর্ম্ম তাঁকে অর্পণ করে নিশ্চিন্ত থাকতে পারবি।

* * *

দেখ সংসারে আছে কি? এখানে কিছুই স্থায়ী নয়। সুতরাং চাওয়া তাঁর কাছে। প্রার্থনা করবে - যেন এ যন্ত্র দ্বারা শুদ্ধ কর্ম হয়। প্রতি কাজে তাঁর চিন্তা। চিন্তা যত শুদ্ধ হবে কাজ তত সুন্দর হবে। দুনিয়াতে আজ আছ কাল নেই। কাজেই সেবার ভাব নিয়ে থাক। তুমি এইভাবে সেবা নিচ্ছ। শান্তি চাও ত তাঁর চিন্তা।

* * *

জগতে নানা জায়গায় নানা জিনিষ ছড়িয়ে আছে। এগুলিকে কুড়িয়ে নেবার জন্য কতরকম কল কারখানা, বিজ্ঞান কৌশলের নতুন নতুন ব্যবস্থা হচ্ছে। ঠিক তেমনি করে ভগবানের কৃপা কুড়িয়ে নেবার জন্য মন প্রাণ লাগা

দেখি, তাঁর কৃপা হাতে হাতে পাবি।

* * *

জগতের বিচিত্রতার ভিতর দিয়ে সকল কর্ম্ম, জগতপিতার একনিষ্ঠ সেবকরূপে সম্পাদন করবার চেষ্টা করতে করতে তাঁর প্রতি প্রেম, অনুরাগ জাগ্রত হয়। এরূপে অহং-এর সঙ্কীর্ণ গণ্ডি যতই ভাঙ্গতে থাকে, ততই বিরাটের অভিমুখে মন প্রাণ একলক্ষ্যে ধাবিত হবে। তখন বিবিধ চিত্র একচিত্রে পরিণত হবে এবং এক রস সাগরে খণ্ড খণ্ড ভাবগুলি মিলে যাবে।

* * *

আত্মাভিমান শূন্য হয়ে জগতের ভিতর ছড়িয়ে পড়, দেখবি তোর শূন্যতা পূর্ণ করবার জন্য সকলে ব্যস্ত হবে এবং তোর আদর্শ কর্ম্মে ও ধর্ম্মে সর্ব্বত্র মঙ্গল বিধান করবে। এই ভোগ-বিলাসের দিনে ত্যাগপূত সরলতাই মানুষের বিশেষ প্রয়োজন। বাস্তবিক পক্ষে পূর্ণত্যাগের নামই পূর্ণভোগ।

* * *

সন্ন্যাস নেওয়া ও সন্ন্যাসী হওয়ার মধ্যে তফাৎ। সন্ন্যাস নেওয়া অর্থাৎ কলেজে ঢুকে ছেলেদের প্রফেসর হবার আকাঙ্খা থাকে, কিন্তু সকলে কী প্রফেসর হতে পারে; সেইরূপ সন্ন্যাস নেওয়া আর সন্ন্যাসী হওয়ার তফাৎ আছে।

* * *

বাবা, তোমরাই তো সর্ব্বত্যাগী, সেই মহাধনকে ভুলে আছো। হরেকৃষ্ণ স্মরণ কর, সাধনা-স্বধন সাধ করে বলছি, সাধছি। বিষয় বিষ হয়। ছোট্ট মেয়েটাকে তোমরা কেন এত ভালবাস জানো, তিনি যে তোমাদের মধ্যে থেকে তাকে এত ভালবাসছেন।

* * *

প্রশ্ন - "আমি গাড়ীতে বড় উঠি না। ঘোড়াকে কষ্ট দেওয়া ত পাপ।"

মা - দেখ ইহাতে পাপ হয় না। কারণ তুমি যেমন কতকগুলি কর্মের জন্য জন্মগ্রহণ করিয়াছ তাহা না করিলে তোমার কর্মক্ষয় হইবে না। কাজেই সেই কাজের যদি কেহ সুবিধা করিয়া দেয় তাহাতে তোমার উপকারই করা হয়; তেমনই এই ঘোড়াগুলির কর্মক্ষয় করিবার জন্যই জন্ম লইতে হইয়াছে। ঘোড়া ত আর ডাক্তারী পড়িয়া কর্মক্ষয় করিতে পারিবে না, এইভাবে গাড়ী টানিয়া তাহার কর্মক্ষয় করিতে হইবে। কাজেই সেই কাজের সুবিধা মানুষের দেওয়া দরকার।

* * *

কাহারও কাছে প্রকাশ করিও না। কারণ বীজটি পুঁতিয়া যদি তাহা বারে বারে উঠাইয়া দেখা যায়, তবে সেই বীজে আর গাছ বাহির হয় না। বীজটি মাটির ভিতর পুঁতিয়া যত্নে রক্ষা করিতে হয়, জল সেচন করিতে হয়। শেষে গাছ বাহির হইয়া বড় হইয়া গেলে, সেই গাছ হইতেই আবার কত বীজ হয়। স্বাভাবিকভাবেই কত ফুল ফল ঝরিয়া পড়ে।

*

শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী প্রসঙ্গ

— শ্রী অমূল্যকুমার দত্তগুপ্ত

সোলনের রাজবংশ লোপের কারণ

মা আরও বলিলেন, "যোগীভাইয়ের বংশলোপ সম্বন্ধে যোগীভাইয়ের নিকট যে গল্প শুনিয়াছি তাহাই তোমাদিগকে বলিতেছি — যোগীভাই হইতে উর্দ্ধ চারিপুরুষের মধ্যে এক রাজা ছিলেন, যিনি যোগীপুরুষ ছিলেন। তাঁহার নাকি সমাধি হইত। একদিন তিনি তাঁহার স্ত্রীকে বলিলেন, "আমি ঘরে কপাট বন্ধ করিয়া থাকিব; যে পর্য্যন্ত আমি নিজ হইতে কপাট না খুলি সে পর্য্যন্ত তোমরা আমাকে ডাকাডাকি করিও না, বা ঘরে প্রবেশ করিতে চেষ্টা করিও না।" এই বলিয়া তিনি ঘরে কপাট বন্ধ করিলেন। এইভাবে ৩/৪দিন চলিয়া গেল। তখন রাজার অন্যান্য আত্মীয়স্বজন রাজার জন্য উদ্বেগ বোধ করিতে লাগিলেন এবং তাঁহারা কপাট ভাঙ্গিয়া ঘরে প্রবেশ করিয়া রাজার অবস্থা দেখিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। রাজা রাণীকে যাহা বলিয়াছিলেন উহা তাহাদিগকে বলা হইলেও তাহারা রাণীর কথা উপেক্ষা করিয়া কপাট ভাঙ্গিয়া ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন যে রাজা স্থির হইয়া বসিয়া আছেন। তাঁহারা রাজাকে ডাকাডাকি করিয়া কোন সাড়া না পাইয়া ডাক্তার ডাকিয়া আনিলেন। ডাক্তার পরীক্ষা করিয়া বলিলেন যে রাজা বাঁচিয়া নাই। তখন রাজাকে দাহ করিবার জন্য শ্মশানে লইয়া যাওয়া হইল। রানীর এসব কিছুই ভালো লাগিতেছিল না। তাঁহার বিশ্বাস ছিল যে রাজা মরেন নাই, কিন্তু চিকিৎসক এবং আত্মীয়স্বজনের কথার জন্য আর আপত্তি করিতে পারিলেন না। রাজাকে চিতায় তুলিয়া যখন আগুন দেওয়া হইল তখন দেখা গেল যে রাজার পায়ের বুড়া আঙ্গুল কাঁপিতেছে। ইহা দেখিয়া রানী শোকে অধীর হইয়া এই শাপ দিলেন যে এই রাজবংশ নির্ব্বংশ হইবে। ঐ শাপ সত্ত্বেও দুই তিন পুরুষ চলিয়া শেষে যোগীভাইয়ের সময়েই বংশলোপের অবস্থা হইয়াছে। সোলনে যোগীভাইয়ের নিকট এই গল্প শুনিয়া নারায়ণ স্বামী আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, "তবে এই রাজাই কি সেই যোগী যাহাকে সমাধি অবস্থায় দাহ করা হইয়াছিল?" তাহার এই প্রশ্ন শুনিয়া আমি বলিয়াছিলাম, "এ দেহ সে সম্বন্ধে এখনও কিছু বলে নাই।" তবে যোগীভাইয়ের রকমটা তোমরা দেখিতে পাইতেছ। শুনা গিয়াছে যে ছোটবেলা হইতেই তাহার রাজা হইবার কোনো ইচ্ছা ছিল না। যে দিন সে রাজা হইয়াছিল সে দিন দুঃখে তাহার চোখ দিয়া জল পড়িয়াছিল। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর যখন তাহার রাজত্ব গেল তখন তাহার কি আনন্দ! এখন অবশ্য সে বৃত্তি পাইতেছে। যোগীভাই বলে যে ইহাও যদি বন্ধ হইয়া যায় তবে তাহাই বা মন্দ কি? তখন মায়ের কোনো আশ্রমে নিশ্চিন্ত হইয়া বসা যাবে।"

এই সব গল্প করিতে করিতে রাত্রি ১১।। বাজিয়া গেল। আমরা মাকে প্রণাম করিয়া চলিয়া আসিতেছি এমন সময় মা আমাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। আমি মায়ের কাছে গেলে তিনি আমাকে বলিলেন, "ভাইজীকে বাঁচাইয়া রাখার জন্যই যে আমি একদিন পর একদিন খাইতাম তাহা কিন্তু ভাইজীকে কখনও বলা হয় নাই।" মায়ের এই কথা শুনিয়া আমি বড়ই আশ্চর্য্যবোধ করিলাম। আমার ঐ ভাব দেখিয়া মা বলিলেন, "আচ্ছা, বলত

কাহাকে এসব কথা বলিব? কেবল ভাইজী কেন, কত লোকের সম্বন্ধেইত এরূপ করা হইতেছে। যাহাদের সম্বন্ধে এরূপ করা হইতেছে তাহারা কি আমা হইতে আলাদা যে ইহা প্রচার করিতে হইবে? শরীরে যখন চুলকানি উঠে, উহা চুলকাইতে গিয়া কেহ কি দশজনকে ডাকিয়া বলে, "তোমরা দেখ আমি কেমন চুলকাইতেছি।" এ দেহের কাছে অপর বলিয়াত কিছু নাই। তাই এ দেহের প্রচারের কোন ভাবই হয় না।"

"আবার দেখ, কাহারও কিছু করিতে হইলে শুধু খেয়াল দ্বারাই কিন্তু উহা করা যায়। ভাইজীকে শুধু খেয়াল দ্বারাই বাঁচাইয়া রাখা যাইত। কিন্তু তাহা না করিয়া একদিন পর একদিন যে খাওয়ার নিয়ম করা হইয়াছিল উহা একটা উপলক্ষ্য মাত্র। যেবার কৈলাসে যাওয়া হয় সেবার পথে এক ডাণ্ডিওয়ালাকে একটি সাপে কাটিয়াছিল। সাপটি দেখিতে খুব কালো, এরূপ সাপে কামাড়াইলে লোকে কখনও বাঁচে না। আমাকে যখন ঐ কথা বলা হইল তখন আমি ঘাস জাতীয় একটা গাছ দেখাইয়া উহার পাতার রস ডাণ্ডিওয়ালাকে খাওয়াইতে বলিলাম এবং দেখা গেল যে উহার ফলে তাহার কিছু হইল না। অথচ যে গাছ দেখাইয়া দেওয়া হইল উহা কিন্তু সাপের বিষের কোনো ঔষধ নয় এবং সাপে কাটা কোনো রোগীকে উহা খাওয়াইলে সে বাঁচিবেও না।

"আবার অনেক সময় কাহাকেও কাহাকেও তাহার ইচ্ছামত তাহার পথেই চলিতে দেওয়া হয়, কিন্তু ঐ সঙ্গে তাহাকে এমন একটা স্থিতি দেওয়া হয় যাহার জন্য সে যে সকল কর্ম করে তাহার ফলভোগ তাহাকে করিতে হয় না। এই যে কথাটা বলিলাম ইহার সহিত পূর্বের কথার কোন যোগ নাই। অন্য একটা বিষয় লক্ষ্যে পড়াতে কথাটা বলা হইয়া গেল। আজ অনেক রাত্রি হইয়াছে এইবার তোমরা এস গিয়া।"

আমি মাকে প্রণাম করিয়া আসিলাম। তখন রাত্রি ১২টা।

স্বামী অখণ্ডানন্দের গতি ও স্থিতি

১১ই শ্রাবণ, রবিবার (ইং ২৭/৭/৫২) আজ সকালবেলা মায়ের দরবারে যে সকল আলোচনা হইতেছিল উহার মধ্যে স্বামী শঙ্করানন্দ বলিয়াছিলেন, "শাস্ত্রে এমনও দেখা যায় যে সবিকল্প বা নির্বিকল্প সমাধির পর কেহ কেহ উহা হইতে ব্যুত্থিত হইয়া কর্মবিপাকে যে কোথায় গিয়া পড়ে তাহার ঠিকানা নাই।" ইহা শুনিয়া মা স্বামীজীর কথা স্বীকার করিয়া বলিলেন, 'গতকাল রাত্রিতে তুমি উপস্থিত ছিলে না তখন এই জাতীয় কথাই হইয়াছিল। যোগীভাইয়ের যাহাতে পুত্রলাভ হয় এই উদ্দেশ্যে জ্যোতিষ অন্ন ত্যাগ করিয়াছিল। কৈলাস হইতে ফিরিবার পথে তাহাকে আমি গরজ করিয়া ভাত খাওয়াইয়াছিলাম। এই কথা শুনিয়া অবধূতজী বলিয়াছিল, "মা ত ঐরূপ করিবেনই, পাছে ভাইজীর জড়ভরতের মত কোন অবস্থা হয়।"

"অখণ্ডানন্দ স্বামীর মৃত্যুর পর দুইদিনের মধ্যেই দেখিতে পাইলাম যে এ দেহ কৈলাসে আছে এবং স্বামীজীও ঐখানে আছে। তাহার সর্বশরীর উলঙ্গ। পরিধানে শুধু একটা কৌপিন। সে দুই হাত দোলাইয়া চলিয়াছে। দেখিতে দেখিতে মনে হইল যে তাহার দেহটা যেন লালবর্ণ হইয়া গেল। গণেশের শরীর দেখিতে

যেরূপ লাল স্বামীজীর শরীরও সেইরূপ দেখাইতে লাগিল। এদিকে চলিতে চলিতে তাহার কৌপিনটি ও খুলিয়া পড়িয়া গেল, কিন্তু সে দিকে তাহার ভ্রুক্ষেপ ও নাই। কি এক তন্ময় ভাবে সে হাত দোলাইয়া চলিয়াছে। পেটটি তাহার আগে আগে চলিতেছে। ঐ চলার অবস্থায় আবার দেখিতে পাইলাম যে তাহার গায়ের লাল রং বদলাইয়া গিয়া উহা সাদা জ্যোতির্ময় রূপ ধারণ করিল এবং উহার ভাবটিও শান্ত গম্ভীর হইয়া গেল।

আমি। মা, স্বামীজী কি তোমার দেহের সহিত মিলিয়া গেলেন না?

মা। হাঁ, তাইত বলিলাম।

আমি । কোথায় বলিলে?

মা। (নিজেকে দেখাইয়া) দেহ বলিতে তুমি কি শুধু এই দেহটাই বুঝ? এ দেহটাত আছেই। ইহা ছাড়াও দেহ আছে। এই যে স্বামীজীকে গণেশের মূৰ্ত্তিতে দেখিলাম তাহারও কারণ আছে। একবার এ দেহ শশাঙ্কবাবু প্রভৃতিকে লইয়া দাক্ষিণাত্যে গিয়াছিল। তখনও শশাঙ্কবাবুর সন্ন্যাস হয় নাই। সন্ন্যাস তো উহার অনেক পরে হইয়াছে। সেই সময় আমরা ত্রিভেন্দ্রাম বা ঐরকম কোনো এক জায়গায় পদ্মনাভের মন্দিরে গিয়াছিলাম। সেখানে গিয়া দেখি যে ঐ মন্দিরে দুইবেলা প্রায় ২।। হাজার স্ত্রী পুরুষের প্রসাদ পাইবার বন্দোবস্ত আছে। এতগুলি লোকের রান্না করিয়া উহারা গণেশের এক মূৰ্ত্তির সামনে ভোগ দিয়া পরে ঐ প্রসাদ সকলের মধ্যে বিতরণ করিত। ওখানে ঐ গণেশের মূৰ্ত্তি দেখিয়া স্বামীজীর খুব ভালো লাগিয়াছিল। গণেশ মায়ের অর্থাৎ ভগবতীর সন্তান। তাহাকে ভোগ দিয়া যে প্রসাদ দেওয়া হইতেছে ইহা তাহার খুব ভালো লাগিয়াছিল। এ দেহের প্রতি তাহার যে ভাব ছিল তাহাত তোমাদের জানাই আছে। পরে যখন দাক্ষিণাত্য হইতে ফিরিয়া আসা হইল তখন ঐখান হইতে এক গণেশের মূৰ্ত্তি আনা হইয়াছিল যে মূৰ্ত্তি পরে সাবিত্রীযজ্ঞের সময় ব্যবহার করা হইয়াছিল। যাহা হউক অনেক পরে যখন কাশীতে কন্যাপীঠ স্থাপন করা হইল তখন সেখানেও রান্না হইলে গণেশের ভোগ দিয়া উহারা সকলে প্রসাদ পাইত। উহাই এখন পর্য্যন্ত চলিয়া আসিতেছে। স্বামীজীর গণেশের প্রতি অনুরাগ ছিল বলিয়া তাহার স্মৃতিমন্দিরে তাহার ফটোর কাছে গণেশের মূৰ্ত্তি রাখা হইয়াছে। স্বামীজীর মৃত্যুর পরে যে তাহাকে গণেশের মূৰ্ত্তিতে দেখা গিয়াছিল উহার কারণ হইল তাহার গণেশের প্রতি অনুরাগ। পরে অবশ্য উহা কাটিয়া গিয়াছিল। জ্যোতিষের বেলায় অন্নত্যাগের দরুণ যে কর্মের আঁশটি তাহার ভিতরে ছিল তাহা যেমন কাটাইয়া দেওয়া হইয়াছিল, স্বামীজীর বেলায়ও তেমনই করা হইয়াছিল।

আমি। মা তুমি জ্যোতিষবাবুর কামনা এবং স্বামীজীর আসক্তিকে দেখি এক পর্য্যায়ে ফেলিলে।

মা। এক পর্য্যায় কিরূপ?

আমি। জ্যোতিষবাবুর যে বাসনা ছিল উহা জাগতিক বাসনা — রাজাসাহেবের একটি ছেলে হউক ইহাই ছিল তাহার বাসনা। আর স্বামীজী ভালবাসিতেন গণেশকে কেন না তিনি জগন্মাতার পুত্র। এই দুইটি কি এক

শ্রেণীর আসক্তি হইল?

মা। না, আমিত ঐ দুটিকে এক পর্য্যায়ে দেখি নাই। আমি যাহা দেখিতেছিলাম তাহা হইল এই — বাবাজী (অর্থাৎ স্বামীজী) যদি গণেশের মূর্ত্তিতেই আবদ্ধ হইয়া থাকিত তবে ত তাহার আর স্বরূপস্থিতি হইত না। লোকে কালী, দূর্গার সাধনা করিয়া যদি কালী, দুর্গার সহিত তদাত্ম হইয়া যায় তবে ঐ অবস্থায় আর স্বরূপস্থিতি কোথায়? লোককে যেমন জাগতিক বাসনা ত্যাগ করিতে হয় সেইরূপ তাহাকে শুদ্ধ বাসনাও ত্যাগ করিতে হয়। তবেই স্বরূপে স্থিতি লাভ হয়। (স্বামী শঙ্করানন্দকে লক্ষ্য করিয়া) বাবাজী কর্ম্মের আঁশের কথা তুলিয়াছিল কি না, তাই এই সকল কথা আসিয়া গেল।

মায়ের খেয়ালের অর্থ অনন্ত প্রকার হইতে পারে

আজ রাত্রিতেও মা মৌনের পর চত্বরে আসিয়া বসিলেন এবং নিজ হইতেই নানা কথা উঠাইলেন। আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে আমি গোপীবাবুর বাসায় গিয়াছিলাম কি না এবং সেখানে কি আলোচনা হইয়াছে? আমি বলিলাম, "আমি আজই গোপীবাবুর বাসায় গিয়াছিলাম এবং গত রাত্রিতে এবং আজ সকালবেলা এখানে যে সব কথা হইয়াছে তাহা আমি গোপীবাবুকে বলিয়াছি।" ইহা শুনিয়া মা হাসিতে লাগিলেন। আমি আরও বলিলাম, "তোমার একদিন পর একদিন খাওয়ার খেয়াল এবং বর্ত্তমানে গৃহস্থদের বাড়ীতে না যাওয়ার খেয়ালের মধ্যে যে পার্থক্য আছে তাহাও আমি গোপীবাবুকে বলিয়াছি। উহা শুনিয়া গোপীবাবু বলিলেন, "আচ্ছা, মানিয়া নিলাম যে মা যে গৃহস্থদের বাড়ীতে যান না ইহার কোন উদ্দেশ্য নাই, ইহা শুধু খেয়ালের জন্যই; কিন্তু এইযে কর্ম্মটি হইতেছে ইহারও ত একটা ফল আছে? ইহা শুনিয়া মা হাসিয়া বলিলেন, "তোমরা ইচ্ছা করিলে এ সম্বন্ধে কত কিছুই অনুমান করিতে পার।"

"দেখ, এ দেহ দ্বারা কাহারও কখনও সেবা হয় না। অনেক সময় খেয়ালবশে এ দেহ এঘরে ওঘরে ঘুরিয়া বেড়ায় এবং কোন জিনিষ কিভাবে রাখিতে হইবে সেই সম্বন্ধে কিছু কিছু বলে। এইসব কথা বলিবে বলিয়াই যে এ দেহ এঘর ওঘর করে তাহা নয়। ঘরে ঘরে ঘুরিয়া বেড়ান ও যেরূপ খেয়ালবশে হইয়া থাকে, "কোথায় কি করিতে হইবে উহাও খেয়ালবশে বলা হইয়া থাকে। ইহার কোনটাই উদ্দেশ্যপূর্ণ নয়। সেদিন মেয়েদের ঠাকুরঘরে খেয়ালবশে গেলাম। সেখানে গিয়া দেখি যে একটি ইলেকট্রিকের তার ঝুলিতেছে। উহা দেখিয়া বার বারই এ দেহের খেয়াল হইতে লাগিল যে এই তার স্পর্শ করিয়া যে কোনো দুর্ঘটনা হইতে পারে। ঐ ঝুলান তারটা দেখাইয়া বলিলাম, "ইহা এভাবে আছে কেন?" দিদি বলিল, "ওরূপ ত কতই থাকে।" একটি মেয়ে তারটি সরাইয়া রাখিতে গেলে আমি তাহাকে বাধা দিলাম। কিন্তু দিদি আমার বাধা না মানিয়া যেই তারটি স্পর্শ করিল অমনি সে ছিটকাইয়া পড়িয়া গেল এবং যে আঙ্গুল দিয়া সে ঐ তার স্পর্শ করিয়াছিল উহা পুড়িয়া উহাতে ফোস্কা পড়িয়া গেল। তখন কমলকে ডাকা হইল। সে ইলেকট্রিক ইঞ্জিনীয়ারিং পাশ। সে ঐ তার দেখিয়াই বলিল যে উহা হইতে যে কোন বিপদ হইতে পারে। সে তখনই ঐখান হইতে তারটি সরাইয়া ফেলিবার বন্দোবস্ত করিল। দেখ,

এই যে মেয়েদের ঘরে যাওয়া এবং ঐ তার সম্বন্ধে যাহা যাহা বলা হইয়াছিল তাহা কিন্তু এ দেহের খেয়ালবশেই হইয়াছিল। তোমরা অবশ্য ইহার যে কোন অর্থ করিতে পার। তোমরা বলিতে পার যে মেয়েদের বিষম বিপদ কাটাইবার জন্যই মা হঠাৎ ঐ ঘরে গিয়া তারটি সরাইবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। সেইরূপ এদেহ যে গৃহস্থদের ঘরে যায় না সে সম্বন্ধেও তোমরা নানা অর্থ করিতে পার।"

আমি। হ্যাঁ, গোপীবাবু বলিয়াছেন যে আমাদের দিক হইতে মায়ের ঐরূপ ব্যবহারের অনন্ত অর্থ হইতে পারে, কিন্তু উহার আসল অর্থ কি তাহা কেবল মা-ই বলিতে পারেন।

ইহা শুনিয়া মা হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন এবং বলিলেন, "ইহা সত্য, তবে কেন যে গৃহস্থদের বাড়ীতে এখন যাওয়া হইতেছে না এ সম্বন্ধে যদি কখনও কথা আসে তবে বাবাকে বলা যাইবে। তবে পূর্ব হইতে কোনো উদ্দেশ্য বা সঙ্কল্প লইয়া এ দেহ যে কিছু করে তাহা নয়। এ দেহের সমস্ত কাজই খেয়ালবশে হইয়া যায়।

আমি। আচ্ছা, তুমি যে এই জগতে আবির্ভূত হইয়াছ ইহাও কি খেয়ালের বশে, ইহারও কি কোনো উদ্দেশ্য নাই?

মা। (হাসিয়া) ঐ সম্বন্ধে এ দেহ কিছু বলিতেছে না। (সকলের হাস্য)



"নিজে শিষ্য হ'তে চেষ্টা কর। গুরু মিলবে। কৃপা পাওয়ার দিক খুলবে। করুণাধারার সন্ধান মিলবে। প্রার্থী হ'লে না জিনিষ মিলবার সম্ভাবনা। প্রার্থীত হও।"

— শ্রীশ্রীমা

সমকালীন দৃষ্টিতে মা আনন্দময়ী

— ডঃ নিরঞ্জন চক্রবর্ত্তী

(তিন)

কাশীর পূণ্য পাদপীঠে অধ্যাত্মরাজ্যের জ্যোতির দীপশিখাটি যাঁরা প্রোজ্জ্বল রেখে ছিলেন তাঁদের অন্যতম হলেন বিশুদ্ধানন্দ সরস্বতী (১৮৫৬-১৯৩৭)। দীর্ঘকাল তাঁর ঋদ্ধি-সিদ্ধির লীলা-বিলাস ভক্ত সমাজে তাঁকে 'গন্ধবাবা' নামে পরিচিত করেছিল। তাঁর স্বভাব অভিমানহীন, সরল ও বালকোচিত। এত জ্ঞান, ঐশ্বর্য ও সাধন সম্পদ সত্ত্বেও তাঁহাকে মুর্হূতের জন্য অবিনয়ের প্রশ্রয় দিতে দেখি নাই। সাধারণতঃ দেখা যায়, পরিচয়ের গাঢ়তার সহিত ভক্তির হ্রাস হইয়া থাকে — কিন্তু তাঁহাকে যিনি যত ঘনিষ্ঠভাবে চিনিবার সৌভাগ্য পাইয়াছেন, তিনি তত অধিক মুগ্ধ হইয়াছেন;— যেন অনন্ত বস্তু, দেখিয়া দেখিবার সাধ মিটে না, প্রতিক্ষণেই নব নব ভাবের উদয় হয়।" (সাধুদর্শন ও সৎপ্রসঙ্গ, ৪র্থ খণ্ড, ১৯৮২, পৃঃ৭) গোপীনাথ কবিরাজের এই দর্শন বিশুদ্ধানন্দের জীবনের যথার্থ পরিচয়বাহী। গোপীনাথ কবিরাজ বিংশ শতাব্দীর প্রখ্যাত দার্শনিক। তিনি সাধক ও যোগীও। বহু সিদ্ধ মহাত্মার সংস্পর্শে তথা ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে এসেছেন তিনি। তিনি বিশুদ্ধানন্দের দীক্ষিত সন্তান। ১৯১৭ খৃষ্টাব্দের শেষ ভাগে তাঁর সঙ্গে বিশুদ্ধানন্দের পরিচয় ঘটে। "পরমহংস বিশুদ্ধানন্দজীর সহিত প্রথম সাক্ষাতেই আমি আশীর্বাদ প্রাপ্ত হইয়াছিলাম। আমি বিনা প্রার্থনাতেই তাঁহার ইঙ্গিতের মাধ্যমে বুঝিতে পারিয়াছিলাম বা অনুভবশক্তির প্রভাবেই জানিয়াছিলাম যে, তাঁহার নিকটেই আমার দীক্ষা লাভ হইবে।" (তদেব, পৃঃ১) ১৯১৮ খৃষ্টাব্দের শীতকালে শ্রীশ্রী বিশুদ্ধানন্দ পরমহংসের নিকট তাঁর দীক্ষা লাভ ঘটে। এর পর তাঁর অবিচ্ছিন্ন যোগের পথটি দৃঢ়তর হয়। মা আনন্দময়ীর সঙ্গে গোপীনাথ কবিরাজের মধুর সম্বন্ধের কথা প্রায় কিম্বদন্তীর রূপ নিয়েছে। মহামহোপাধ্যায় 'আনন্দময়ী মা' প্রসঙ্গে (তদেব, ৫ম খন্ড, ১৯৮২) লিখেছেন, - "১৯২৮ সালে ৬ই সেপ্টেম্বর মাতা আনন্দময়ীর সঙ্গে আমার প্রথম সাক্ষাৎ লাভ হয়। ... সেবার যতদিন তিনি কাশীতে ছিলেন, ঐ মাসের ৮ই হইতে ১৯ তারিখ পর্যন্ত দুই বেলাই, প্রাতে ও সন্ধ্যায় দর্শন ও আলোচনার নিমিত্ত তথায় উপস্থিত হইতাম।

"একদিন ভারতধর্ম মহামন্ডলের স্বামী দয়ানন্দকে মাতাজীর নিকট দেখিয়াছিলাম। স্বামী দয়ানন্দের একান্ত বিশ্বাস ছিল যে, — সাক্ষাৎ ভগবতীই মাতা আনন্দময়ী রূপে পৃথিবীতে অবতীর্ণা হইয়াছেন (তদেব, পৃঃ ২)"।

"কুঞ্জবাবুর গৃহে মা এইবার স্বল্পকাল অবস্থান করিয়া ছিলেন। কুঞ্জবাবুর গৃহ সেইসময়ে সমস্ত দিন রাত্রি উৎসব-মুখরিত থাকিত। সমাজের সর্ব্বশ্রেণীর মানুষ পন্ডিত, সাধু, সাধারণ মানুষ, স্ত্রী ও পুরুষ সেখানে সমবেত হইত। মাকে দর্শন করা, তাঁকে প্রণাম করা এবং সম্ভব হইলে দুটি একটি কথা বলাই মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। মার সান্নিধ্যে একবার উপস্থিত হইতে পারিলে পুনরায় তাঁহার কাছে উপস্থিত হইয়া সকলেই কৃতার্থ হইত। মাতা আনন্দময়ী যত দিন কাশীতে ছিলেন সেই সময়ে বিভিন্ন স্থান হইতে আগত বিভিন্ন প্রকার লোকের ভীড় সর্ব্বদাই লাগিয়া থাকিত। এবং তাঁহাকে নানাপ্রকার জিজ্ঞাসার ও বিচারের উত্তর দিতে হইত, মাতা আনন্দময়ী কোন স্থিতিতে কিরূপে কোথায় অবস্থান করিতেছেন, তাহা কাহারও বোধগম্য হইত না। প্রত্যেক ভক্তই আপন আপন দৃষ্টিকোণ হইতে তাঁহার বিষয়ে বিচার করিতেন। কেহ কেহ বলিতেন ইনি কালী অবতার, ঢাকাতেও (পূর্ববঙ্গ) এই প্রকারে প্রসিদ্ধ ছিলেন। বিভিন্ন 'মহাবিদ্যা' সমূহের সহিত মায়ের সাক্ষাৎকারও হইয়াছিল বলিয়া কোন কোন

ভক্ত মনে করিতেন। আবার অন্যান্য ভক্তের নিকট তিনি "শুকদেবের" অবতার বলিয়াও স্বীকৃত হইয়াছিলেন, বাহ্যজগতে তাঁহার কোনও গুরু ছিল না। কিংবদন্তী ছিল যে মাতাজী মাতৃগর্ভ হইতে পূর্ণ জ্ঞান লইয়াই ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন।

"মায়ের দর্শনে আমার মনে যে প্রাথমিক প্রভাব সেদিন পড়িয়াছিল বহুদিন পর তাহা বিশ্লেষণ করিয়া আমার পক্ষে বলা সম্ভব নয়। তবে একথা বলা যায় যে আমি স্বচক্ষে সেদিন যা দেখিয়াছিলাম তা আমার পূর্বের দেখা সব কিছু থেকেই ভিন্ন। মনে হইয়াছিল এমনটা আর কখনো দেখিনি। এ যে স্বপ্নে দেখা বিষয় জাগরণে প্রত্যক্ষ করা।

"প্রতিদিন বৈকালে যে সৎসঙ্গ হইত তাহাতে বিভিন্ন শ্রেণীর লোক মা'কে প্রশ্ন করিত। অল্পকথায় অনুপম মাধুর্য্যে মা এই সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দিতেন। প্রশ্ন যত জটিল বা দূরূহ হোক না কেন উত্তর অনায়াসে প্রকাশ পাইত। মনে হইত যেন উত্তরের জন্য কোন অপেক্ষা নাই, ভাবনা বা চিন্তা নাই।

"একদিন এক বৃদ্ধা মহিলা রাত্রিবেলায় আসিয়া মাতা আনন্দময়ীকে (দ্রষ্টাভাবে) বলিলেন — "মা। আমি যখনই আসনে বসি, আমার ইচ্ছা হয় — তোমার কাছে আসি কিন্তু সব সময় তাহা হইয়া ওঠে না। তাই আমার চিত্তে দুঃখ উৎপন্ন হয়, — যখন আসিতে পারি তখনই আনন্দ হয়। তোমার সান্নিধ্যে থাকিলেই সুখ পাই।' মাতা আনন্দময়ী সকল কথা শুনিয়া হাসিতে লাগিলেন এবং বলিলেন — 'তোমার কথা আমার ঠিক লাগিতেছে না, তুমি বলিলে তোমার সাক্ষীভাব বা দ্রষ্টাভাব বা অন্তঃচক্ষু খুলিয়া গিয়াছে, ইহা তো খুবই আনন্দের বিষয়। তবে তুমি এরূপ কেন বলিতেছ যে, — এখানে যখন আস তখনই শুধু আনন্দ লাগে বা সুখ পাও। না আসিলে দুঃখ-সুখের অনুভব হয়, সুতরাং মনে হয় তোমার সুখদুঃখের বোধ রহিয়াছে, কাজেই দুঃখ-সুখ ভোগের অন্তর্গত। দ্রষ্টার বা সাক্ষীর ভোগ কি হয়"? এই বলিয়া মাতা হাসিতে লাগিলেন।

"মাতা আনন্দময়ী যখনই মাঝে মাঝে কাশীতে আসিতেন তখনই আমি তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতাম। প্রথমে মাতা আনন্দময়ী ধর্মশালাতে উঠিতেন, কোন গৃহস্থের বাড়ীতে বাস করিতেন না। কখনও কখনও নৌকোতে বাস করিতেন। কিছুদিন পর ভাদাইনীতে আশ্রম তৈয়ারীর পর ওখানেই থাকিতে লাগিলেন। ধীরে ধীরে মাতা আনন্দময়ীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপিত হইল, একবার তিনি আমার সঙ্গে তাঁহার পিতা শ্রীবিপিন বিহারী মহাশয়কে পুরীর জগন্নাথের রথযাত্রা দেখিবার জন্য পাঠাইয়াছিলেন, আমি তাঁহাকে লইয়া আমার গুরুদেবের (স্বামী বিশুদ্ধানন্দ) আশ্রমে রহিলাম। রথযাত্রা উৎসব দর্শন হইয়া গেলে পুরীর অন্যান্য বিশিষ্ট স্থানগুলিও দর্শন করিলাম। গুরুদেব তখন ওখানেই ছিলেন, গুরুদেবকে দর্শন করিয়া বিপিনবাবু খুবই প্রসন্নতা লাভ করিলেন, — বিপিনবাবু কহিলেন, — "এই প্রকার শক্তিসম্পন্ন পুরুষ পুর্ব্বে কখনও দেখি নাই। আমার (বিপিনবাবুর) একান্ত ইচ্ছা কোন সুবিধা মত সময়ে বা বিশেষ সময়ে মা'র বাবার সহিত সাক্ষাৎ হওয়া প্রয়োজন।" তিনি আমাকে এরূপভাবেই কহিলেন এই মহামিলনের ব্যবস্থার জন্য এবং আমি যেন তাঁহার এই মহা ইচ্ছা রক্ষার জন্য চেষ্টা করি। বিপিনবাবুর অনুরোধ রক্ষা করিতে পাঁচ বৎসর আমার সময় লাগিয়াছিল! (পুরীক্ষেত্রে আশ্রমের নাম 'বিশুদ্ধানন্দধাম'। পুরীধামে আশ্রমের নির্মাণ ও ব্যবস্থাদির সমস্ত ব্যয়ভার কলিকাতা হাইকোর্টের উকীল বাবাজীর পরমভক্ত শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়, এম. এ. বি. এল, মহাশয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই আশ্রমটি আর্মষ্ট্রঙ্গ রোডের উপর পুরী জেলা স্কুলের সন্নিকটে অবস্থিত।)

"১৯৩৫ ইং সালে গুরুদেব যখন কাশীতে ছিলেন এবং মাতা আনন্দময়ীও যখন গোধুলিয়াতে বীরেশ্বর পাণ্ডে ধর্মশালাতে অবস্থান করিতেছেন। সেই সময়ে আমি খুবই আগ্রহ সহকারে মাতা আনন্দময়ীকে গুরুদেবের আশ্রমে লইয়া গেলাম। গুরুদেবও খুব আনন্দিত হইয়া মাতা আনন্দময়ীকে স্বাগত জানাইলেন। ১৪ ই অগ্রহায়ণ ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দের ৩০ শে নভেম্বর শ্রীশ্রী বিশুদ্ধানন্দ পরমহংসের সঙ্গে শ্রীশ্রী মা আনন্দময়ীর সাক্ষাৎ হয়।

"মাতা আনন্দময়ীকে বীরেশ্বর পাণ্ডে ধর্মশালা হইতে বাসে করিয়া মালদহিয়া রোডস্থিত গুরুদেবের আশ্রম বিশুদ্ধানন্দ কাননেতে আমি লইয়া আসিলাম। তাঁহার সঙ্গে ১৫ জন ভক্ত ছিলেন। সঙ্গে পতিদেব ভোলানাথ এবং তাঁহার পরমভক্ত ভাইজীও (জ্যোতিষচন্দ্র রায়) ছিলেন। মা'য়ের সঙ্গে কাশ্মীর এবং অন্যান্য প্রদেশের কয়েকজন ভক্ত ছিলেন, স্ত্রী এবং পুরুষ উভয় ভক্তই ছিলেন। গুরুদেব সমস্ত ভক্তজনের জন্য অভ্যর্থনার উদ্দেশ্যে সূর্য্য বিজ্ঞান মন্দিরের (দোতালা) উপরের বারান্দায় পূর্বদিকে বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। ঐ বারান্দায় কম্বল বিছাইয়া দেওয়া হইয়াছিল (ভক্তদের জন্য), মা'য়ের ও অন্যান্য বিশিষ্ট ভদ্রমহোদয়ের জন্য পৃথক পৃথক আসনের ব্যবস্থা ছিল। কোণে একটি আরামকুর্শীতে গুরুদেব বসিয়াছিলেন, আশ্রমে ভক্তগণের পশ্চিমদিকে বসিবার জায়গা ছিল। আমি মনে করিয়াছিলাম সমস্ত ভক্তজন সহিত মাতা উপরে পৌঁছিবার পূর্ব্বেই গুরুদেবকে সংবাদ দিব কিন্তু মাতা আনন্দময়ী আমার পৌঁছিবার পূর্বেই দোতলাতে পৌঁছিয়া গেলেন, আমি তাঁহার পিছু পিছু উঠিলাম দোতলায় পৌঁছিয়াই গুরুদেবকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন — 'বাবা! তোমার এই ছোট মেয়ে উপস্থিত, এখন কন্যা পিতার নিকট আসিয়াছে।'

"গুরুদেব আরামকুর্শীতে বসিয়াছিলেন তখন দাঁড়াইয়া মাতা আনন্দময়ীকে অভ্যর্থনা করিয়া কহিলেন — "হ্যাঁ, মেয়ে তার ঘরেতেই আসিয়াছে।' মাতাকে বসিবার জন্য আসন পাতা হইয়াছিল, কিন্তু বাবার আসনের সম্মুখে না বসিয়া, মাটির উপরেই বসিয়া পড়িলেন। ভোলানাথ আসনের উপরেই বসিয়াছিলেন অন্যান্য মায়ের ভক্তগণ কম্বল আসনেই আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাই বারান্দাটা একেবারে ভরিয়া গিয়াছিল।

"কিছুক্ষণ পর মায়ের কাশ্মীরি ভক্তগণের প্রতি দৃষ্টি যাওয়াতে বাবা জিজ্ঞাসা করিলেন — এরা সব কোথা হইতে আসিয়াছেন? কোন দেশের? তখন মা আনন্দময়ী বলিলেন, ইহারা সকলেই একই জগৎ হইতে আসিয়াছে যেরূপ সকলেই আসে। বাবা ভাবিলেন মা পরিহাস করিতেছেন। তখন বাবা বলিলেন — "হ্যাঁ মা। সব তএক জগত হইতেই আসে, কিন্তু বাহির হইয়াই নানা জগতের হইয়া যায়।" মা কহিলেন — "হ্যাঁ বাবা! নানা হয়েও তো সেই একেরই মধ্যে।"

"তারপর মা, ভাইজীকে কহিলেন — 'জ্যোতিষ। তুমি অনেকদিন হইতে বাবার নিকট নানা বিষয়ে জানিতে চাহিতেছিলে — বিশেষ করিয়া সূর্য্যবিজ্ঞান সম্বন্ধে; এখন যখন আসিয়াছ তখন বাবার সম্মুখে তোমার যাহা ইচ্ছা জিজ্ঞাসা কর। বাবা সবই দেখাইবেন।" এই বলিয়াই মাতা আনন্দময়ী আমার দিকে তাকাইলেন — আমি তাঁহার ইচ্ছা ও কথার তাৎপর্য্য বুঝিতে পারিয়া বাবাকে বলিলাম — আপনার জীবনচরিত পড়িয়া জ্যোতিষবাবুর সূর্য্য বিজ্ঞানের বিষয় জানিতে ইচ্ছা হইয়াছে, সূর্যবিজ্ঞান কি এবং উহা কিরূপে হয়? বাবা বলিলেন — "সূর্য্য বিজ্ঞান যোগ বিভূতি নয়, যিনি বুঝিতে পারেন না তিনি ভাবেন ইহা যোগ বিভূতির অন্তর্গত কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে এই সূর্য্য বিজ্ঞানের সঙ্গে যোগ বিভূতির কোন সম্বন্ধই নাই। সূর্য-বিজ্ঞান, বিজ্ঞান হইতেই সৃষ্ট।

"যোগ এবং ইচ্ছা শক্তিতেই সৃষ্টি হয় অর্থাৎ ব্রহ্মজগতের যে কোন পদার্থ দুই প্রকারেই সৃষ্টি হইতে পারে। অথচ দুই এর ভিতরে বহু প্রকারের ভেদ আছে। সূর্য্য বিজ্ঞানেতে সূর্য্যের রশ্মি চিনিয়া বিভিন্ন রশ্মিগুলির সংঘটন করিয়া সৃষ্টি করিতে হয়। সূর্য্যের অপর নাম "সবিতা" অর্থাৎ প্রসব কর্ত্তা। সমস্ত জগতের সৃষ্টি সূর্য্য হইতেই হইয়াছে। ইহা হইতেই সৃষ্টি, পালন, সংহার সব কিছু হইয়া থাকে।

"সূর্য্য বিজ্ঞানবিদ্ এই সকল রহস্য আয়ত্ব করিয়া লইতে পারে কিন্তু রহস্যের স্বরূপ জানিয়া — ইহাদিগকে পরস্পর মিলাইয়া ও সংমিশ্রণের শুদ্ধ প্রণালী শিখিবার পর, ইচ্ছানুরূপ বস্তুসৃষ্টি করা সম্ভব। নানাপ্রকার ক্রিয়া করাও সম্ভব। ইহাতে যোগীর আত্মিক শক্তির উপর কোনরূপ প্রভাব পড়ে না। কিন্তু ইচ্ছাশক্তির প্রভাবে যদি কোন সৃষ্টি করিতে হয় — তখন উপাদান বাহির হইতে লওয়া সম্ভব নয়, তাহা আত্মস্বরূপ হইতেই লইতে হয়। সেইরূপ সূর্য্য বিজ্ঞানেতে সূর্য্যরশ্মি হইতেই উপাদান সংগ্রহ করিতে হয়। সেই প্রকার চন্দ্র বিজ্ঞান চন্দ্র হইতে; বায়ু বিজ্ঞান বায়ু হইতে; শব্দ বিজ্ঞানেতে শব্দ হইতেই উপাদান সংগ্রহ করিতে হয়।

ইচ্ছাশক্তির মাধ্যমে যে সৃষ্টি হয়, তাহাতে কোনরূপ উপাদান কখনও লওয়া হয় না, তাহা আত্মার নিমিত্তেই হইয়া থাকে; আত্মাই উপাদান রূপে পরিগণিত হয়। সুতরাং যোগ অর্থাৎ ইচ্ছাশক্তি হইতে সৃষ্টি করা বিশেষরূপে নিষিদ্ধ; তাহাতে আত্মিক হানি হইয়া থাকে। যদিও উহার ক্ষতিপূরণ হওয়া সম্ভব; তথাপি ঐ যোগীর ইষ্টসিদ্ধির বাধা উৎপন্ন হয়। উপরন্তু সূর্য্য বিজ্ঞানের দ্বারা সৃষ্টি হইলে কোনপ্রকার আত্মিক উন্নতির ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না।"

"এইরূপ কহিয়া নিজের পুরাতন শিষ্য দুর্গাকান্ত রায়কে বলিলেন — 'ভিতর হইতে লেন্স লইয়া এখানে উপস্থিত হও।' দুর্গাকান্তবাবু অবসরপ্রাপ্ত সাব জজ ছিলেন। পেনসন নেওয়ার পর হইতে বাবার সহিত সর্বদাই থাকিতেন। বাবার আদেশানুসারে 'জ্ঞানগঞ্জ' হইতে প্রাপ্ত একটি ছোট লেন্স লইয়া আসিলেন। বাবা উহার দ্বারা বিভিন্ন প্রকার রশ্মি বাহির করিয়া নানাপ্রকারের দৃশ্য দেখাইতে শুরু করিলেন।

"প্রথমতঃ নানা প্রকারের গন্ধ সৃষ্টি করিলেন; দ্বিতীয়তঃ বহু প্রকারের ফুল তৈরী করিলেন, উহা হইতে কর্পূর ও কেশর উৎপন্ন করিয়া দেখাইলেন। জ্যোতিষবাবু সূর্য্য রশ্মির দ্বারা উৎপন্ন ভৌতিক সত্তা সম্পন্ন স্থূল বস্তুর উৎপত্তি দেখিয়া বিস্মিত হইয়া গেলেন। মাতা আনন্দময়ী কহিলেন — "বাবা! ইহাতো প্রকৃতি শক্তির খেলা, অথচ ইহা এক প্রকার মায়ারই অলৌকিকত্ব।" তখন বাবা বলিলেন — "হ্যাঁ, মায়া তো বটেই, সমস্ত বিশ্ব সৃষ্টিই তো মহামায়ার মায়ার দ্বারা আবৃত। উহাতে কোন প্রকার সন্দেহ আছে কি?" তারপর মাতা আনন্দময়ী কহিলেন — 'এক মায়ার ধাক্কাতেই তো এসব লোক মোহিত হইয়া পড়ে।'

"আমি তখন দাঁড়ানো অবস্থায় ছিলাম। মাতা আনন্দময়ী আমাকে দেখিয়া কহিলেন — "বাবাকে ধরো; তাঁহার কাছে পরমবস্তু রাখা আছে; ইনি ঢাকনার উপর ঢাকনা দিয়া আবরণ করিয়া রাখিতেছেন।" তারপর বাবাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন — "বাবা আবরণে আর আবদ্ধ করিও না, সকল প্রকার আবরণ মুক্ত কর — পরম বস্তুর দ্বার খুলিয়া দাও।" বাবা উত্তর দিলেন — "আমি তো দেওয়ার জন্যই আসিয়াছি, — দেওয়ার জন্য প্রস্তুতও আছি। দুই হাত বাড়াইয়াই আছি। — কিন্তু কে তাহা লইবে!" এই বলিয়াই হাসিতে লাগিলেন।

"অতঃপর বাবা কহিলেন — 'এখানকার সকলকে জল খাবার দাও।' বন্দোবস্ত করাই ছিল। মাতা আনন্দময়ীকে বলিলেন — 'মেয়ে পিতার ঘরে আসিয়াছে — কিছু খাইতে হইবেই।' মাতা আনন্দময়ী কহিলেন, — 'ইহারা আমাকে খাওয়াইয়া এখানে লইয়া আসিয়াছে।' ইহা শুনিয়া বাবা ভাবিলেন যে, মাতা আনন্দময়ীর বোধহয় খাইবার ইচ্ছা নাই — সেজন্য পুনরায় বলিলেন — "তাহা হইলে তুমি কি কিছুই খাইবে না?' তখন মা কহিলেন — 'খাইব না কেন? ছোট মেয়ে কি বার বার খায় না? কিন্তু এই মেয়েটির একটি আবদার আছে, এই মেয়েটি নিজের হাতে খায় না, খাওয়াইয়া দিতে হইবে।' ইহার পর একটি প্লেট হইতে কিছু ফল লইয়া বাবা চেয়ারের সম্মুখে খাওয়াইবার জন্য দাঁড়াইয়া গেলেন, মা উঠিয়া দাঁড়াইলেন। বাবার ইচ্ছা ছিল যে মিষ্টান্ন লইয়া মায়ের মুখে দিবেন, কিন্তু মা প্রথমেই মিষ্টান্ন তুলিয়া বাবার মুখে দিলেন।

"কে প্রথম দিলেন বোঝা গেল না; কেহই আগে পিছে দেন নাই; এমনকি দুই জনেই একসঙ্গে একই সময়ের মধ্যে খাইয়া ফেলিলেন। এরূপ দেখিয়া সমস্ত লোকই হাসিতে লাগিলেন। সকলেরই যখন জলযোগ সমাপ্ত হইল তখন মা কহিলেন — 'এখন মেয়েটী যাইতে চায়,রাবা এবার অনুমতি দাও, যাই।' বাবা ভাবপূর্ণ শব্দতে কহিলেন — 'মেয়ে যখন যাইবেই তখন যেন এই বুড়ো বাবার কথা না ভোলে।'

"মাতা আনন্দময়ীর সঙ্গে তখন হইতেই আমার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপিত হইল। আমি তাঁহাকে জগদম্বার স্বরূপ বলিয়াই সম্মান করিতাম। চল্লিশ বৎসরেরও অধিক কাল যাবৎ মার সঙ্গে আমার সম্পর্ক বিদ্যমান।

"মাতা আনন্দময়ীর সহিত পরিচয়ের পর আনন্দময়ী সংঘ দ্বারা প্রকাশিত 'আনন্দবার্ত্তা' প্রতি সংখ্যাতেই আমার নিবন্ধ থাকিত। তাহা ছাড়া মা'র বাণীর (অমরবাণী) মদীয় ব্যাখ্যা দীর্ঘকাল যাবৎ ঐ পত্রিকায় প্রকাশিত হইতে থাকে, পরে সব নিবন্ধ সংকলিত করিয়া আনন্দময়ী সংঘ কর্তৃক গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। ঐ পুস্তকের মুখবন্ধও আমি লিখিয়া দিয়াছিলাম।

মার সম্বন্ধে আমার ব্যক্তিগত ধারণা ও বিশ্বাস আমার হৃদয়ের বস্তু। অবশ্য তাহা নির্বিচারে অন্য সকলে গ্রহণ করিতে বাধ্য নয়। সে বিষয়ে অন্যের সঙ্গে তর্ক বিতর্ক সম্ভব নয়। যাহা হৃদয়ে সংগোপনে রক্ষা করার বস্তু তাহা বাহিরে আনিয়া আলোচনার বিষয় করিতে মন কখনও সম্মতি দেয় না। মা স্বরূপে ভাবাতীত মহাভাবস্বরূপিনী. মা অনন্ত প্রকারে অনন্তভাবের সঙ্গম এবং উদগম হইয়াও সমস্ত ভাবের অতীত। মার এই তুরীয়াতীত স্বরূপ কে গ্রহণ করিতে পারে। মাকে চিনিতে হইলে মায়ের চরণে আত্মসমর্পন করিয়া তাঁহার সঙ্গে একাত্মতা লাভ করিতে হইবে। মা হইতে পৃথক থাকিয়া মা'র পরিচয় লাভ করা কখনও সম্ভব নয়।"

ভারতবিশ্রুত দার্শনিক মহামহোপাধ্যায় পদ্মবিভূষণ পন্ডিত গোপীনাথ কবিরাজের কাছে — "শ্রীগুরুদেব ছাড়া মার সমান এ সংসারে আমার আর কেহ নাই।" বস্তুতঃ আমাদেরও সেই একই মনন, — "মা ছাড়া আমাদের এ সংসারে আর কেহ নাই।"

(ক্রমশঃ)



ঠাকুর ঘর

—ডাঃ চিত্ততোষ চক্রবর্তী

গয়া কাশী বৃন্দাবন
অনেক তীর্থ ঘুরে এলাম
মনে বড়ো শান্তি পেলাম।।

ব্রহ্মকুণ্ডে ডুব দিয়ে
শরীর শীতল করে নিলাম
কংখলে মার সমাধিতে
প্রাণটা আমার জুড়িয়ে নিলাম।।

এত শান্তি এত আনন্দ
পাব কি তা ভেবেছিলাম
না চেয়ে যা পাওয়া যায়
সে পাওয়ায় মন ভরে নিলাম।।

এ জীবনে খুদ কুঁড়ো
যা কিছু চেয়েছিলাম
অনেক কিছু পেয়েছি আর
পাইনি যা তা ভুলে গেলাম।।

চাওয়া পাওয়ার শেষ পাওয়া
মায়ের সঙ্গ পেয়েছিলাম
সেই স্মৃতি নিয়ে আমি
বাকি জীবন কাটিয়ে দিলাম।।

পুজোর ঘরে চোখ বুজে
সে কথাটি ভাবি যখন
মায়ের স্নেহের কথা ভেবে
নয়ন জলে ভাসে তখন।।

মনে হয় কোথায় কাশী
কোথায় আছে বৃন্দাবন
নিভৃত এই ঠাকুর ঘর
এইতো সেই বৃন্দাবন।।



মাতৃ - স্বরূপামৃত

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

— শ্রী প্রিয়ব্রত ভট্টাচার্য্য

ভক্ত সন্তানদের ভাবে মার সঙ্গে কালীর একাত্মতার যে লক্ষণগুলি শাহবাগের কালীপূজায় প্রকাশিত হল তা সাধারণ লোকভাবনাকে প্রভাবিত করে। তবে লোকধারনায় মাকে কালীমা রূপে প্রতিষ্ঠা করা ভক্ত সন্তানদের পক্ষে সম্ভব হয় নি। মা আনন্দঘন, গৌরবর্ণা, দ্বিভূজা এবং পদতলে শব বা শিবহীন। অতি সাধারণ জনগণের চিন্তায় দেবী কালীর যে একটা পরিচয় প্রকাশিত হয়ে রয়েছে, মার মধ্যে তার অনুপস্থিতি বড় হয়ে উঠেছিল।

একথা বলা যায় যে কালীর স্বরূপ অনন্তভাবে বলেও শেষ করা যায় না। পূরাণগুলিতে কালী বলে হিমালয় কন্যা উমাকেই ভাবা হয়েছে। পার্ব্বতী উমার নামই কালী। কালিকাপূরাণ বলেছেন, "তান্তু নীলোৎপলদল শ্যামাং হিমবতঃ সুতাং। কালীতিনাম্না হিমবানাজুহাব কৃতে দিনে। বান্ধবৈস্তু সমস্তৈস্তন্নাম্না সা পার্ব্বতী। কালীতি চ তথা নাম্নী কীর্তিতা গিরিনন্দিনী।।" অর্থাৎ হিমবান নীলবর্ণা শ্যামা কন্যার নাম রাখলেন কালী এবং বান্ধবগণ পার্ব্বতী নামে অভিহিতা করায় দেবী দু নামেই খ্যাতা হলেন।' এখানে উল্লেখ করতে হয় যে উমা যখন কালী নামে পরিচিতা তখনও শিবের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ঘটে নি। কালী হলেই পদতলে শিব থাকবে এমনটি ভাবা যায় না। কূর্মপবরাণ উমার রূপ সম্পর্কে বলেছেন, "নীলোৎপল দল প্রখ্যাং নীলোৎপল সুগন্ধিঞ্চ। দ্বিনেত্রাং দ্বিভূজাং সৌম্যাং নীলালক বিভূষিতাম।" — কালী রূপই উমার স্বরূপ, তাই পিতার অনুরোধে মা উমা তাঁর নীলপদ্মবর্ণ, নীলপদ্মগন্ধ, দ্বিনেত্র, দ্বিভূজ, নীলকেশ ও সৌম্য শরীর নিয়ে আবির্ভূতা হন। কালিকাপূরাণের মত কূর্ম পূরাণের উমাও স্বতন্ত্রা এবং স্বশ্রয়া — শব বা শিবের সঙ্গে সংযোগ তাঁর তখনও ঘটেনি। ছোট্ট মেয়ে কালী-উমা কেন কাল হলেন? বরাহপুরাণ বলেছেন, "স্বশরীরাগ্নিনা দগ্ধা ততঃ শৈলসূতাভবৎ। উমা নামেতি মহতী কৃষ্ণ চেত্যভিধানতঃ।।" — সতী অগ্নিদগ্ধ হয়েছিলেন বলে, উমা কাল রূপ নিয়ে কালী নামে পরিচিত হলেন।' কালী উমাই আবার গৌরী হলেন। কালিকা পুরাণ বিস্তারিতভাবে বলেছেন যে পার্ব্বতী-কালী বয়স্কা হলে দেবর্ষি নারদ এসে প্রস্তাব দিলেন বিয়ের। হিমালয়কে দেবর্ষি নারদ বললেন, "স্বর্ণগৌরী সুবর্ণাভা তপসা তোষিতে হরে বিদ্যুদ্‌গৌরীত্বিয়ং কালী তব পুত্রী ভবিষ্যতি।। গৌরীতি নাম্না পশ্চাত্তু খ্যাতিমেষা গমিষ্যতি।।" (কালিকাপুরাণ, ৪১.৬৭)। অর্থাৎ 'তপস্যা করে মহাদেবকে তুষ্ট করলে আপনার কালী-কন্যা, সোনার বরণী হয়ে স্বর্ণগৌরী - বিদ্যুদ্‌গৌরী হয়ে উঠবে এবং শেযে তাঁর 'গৌরী' নামেই খ্যাতি হবে।' এই গৌরী মাকে প্রথম কেন-উপনিষদে উমা রূপে দেখা যায় — তিনি সেখানে ব্রহ্ম বিদ্যাস্বরূপিনী, ব্রহ্মশক্তি। প্রথম জ্যোতি বলে উমা স্বর্ণরূপা। তিনি হৈমবতী - হেমকান্তিময়ী। 'হেমকান্তিং' শব্দটির বিশেষ অর্থ রয়েছে। 'হেমকান্তি' জ্ঞানের সঙ্গে অর্থাৎ ব্রহ্মবিদ্যার সঙ্গে যুক্ত বলেই মা হৈমবতী উমা। কালী-উমা তাই কখনও গৌরী, কখনও নীলা।

কালী পরমসত্ত্বা পরমেশ্বরী। বিভিন্ন পুরাণ ও উপপুরাণের মধ্যে কালীর কথা যেভাবে প্রকাশিত হয়েছে তাতে কালীই মহাদেবী রূপে প্রতিষ্ঠা পেয়েছেন। কালীই মূল দেবী এবং পার্ব্বতী দেবী। উমা, গৌরী, দুর্গা, চণ্ডী প্রভৃতি সর্বরূপেই এই মহাদেবী কালী থেকে প্রসূতা — কালীরই রূপভেদ মাত্র। তন্ত্রালোকে আচার্য অভিনব গুপ্ত দ্বাদশ কালীর নাম করেছেন। সৃষ্টিকালী হলেন তাঁর সৃষ্টি স্বরূপ। প্রমেয় গত স্থিতি স্বরূপ হলেন রক্ষাকালী।

প্রমেয়গত সংহার স্বরূপে তিনি স্থিতিনাশ কালী। মৃত্যুরূপা হয়ে তিনি মৃত্যুকালী — তিনিই রুদ্রকালী, মার্তণ্ডকালী, কালাগ্নিরুদ্রকালী, মহাকালী,পরমার্ককালী এবং মহাভৈরবকালী। এক কালীরই দ্বাদশ রূপভেদ। শুধু তাই নয়, প্রত্যেক কালীরই ভিতর রয়েছে অন্য দ্বাদশ কালী। সাধনার সময় একশো চুয়াল্লিশ কালীর পূজা করতে হয়।

মহাদেবী অনন্তরূপা, তাঁর একটি রূপ হল দক্ষিণাকালী। চণ্ডী সপ্তসতীতে রয়েছে যে দেবী কৌশিকী, পার্ব্বতী; উমার দেহ থেকে নির্গতা হলে পার্ব্বতী কৃষ্ণা হলেন এবং কালী রূপে খ্যাতা হলেন। চামুণ্ডা দেবীও কালীর রূপভেদ। তাছাড়া অম্বিকাকে চণ্ডমুণ্ডরা ধরতে গেলে ক্রোধে দেবীর মুখমণ্ডল মসীবর্ণ হল, তখন তাঁর ভ্রুকুটিকুটিল ললাট থেকে করালবদনা কালী বের হলেন। তোড়লতন্ত্র বলেছেন কালী অষ্টধা — যেমন দক্ষিণাকালী, সিদ্ধকালী, গুহ্যকালী, শ্রীকালী, ভদ্রকালী, চামুণ্ডাকালী, শ্মশানকালী এবং মহাকালী। নববিধা কালীর কথা বলেছেন মহাকাল সংহিতা। তাঁরা হলেন দক্ষিণাকালী, ভদ্রকালী, শ্মশানকালী, কালকালী, গুহ্যকালী, কামকলাকালী, ধনকালী, সিদ্ধিকালী, চণ্ডিকাকালী। তাছাড়া জয়দ্রথ যামলে কালিকা, ডম্বরকালী, রক্ষাকালী, ইন্দীবরকালী, ধনকালী, রমণীকালী, ঈশানকালী, জীবকালী, প্রজ্ঞাকালী এবং সপ্তার্ণকালী প্রভৃতির নাম প্রকাশিত হয়েছে।

কালীকে যে নামেই ডাকা হোক না কেন, সবকালীই স্বরূপতঃ এক। তন্ত্রতত্ত্ব অবশ্য বলেছেন যে কালীর দশমহাবিদ্যা রূপই প্রকৃষ্টা, "এতাঃ সর্বাঃ প্রকৃষ্টাস্তু মূর্তয়ো বহুমূর্ত্তিষু"। মহাভাগবত পুরাণে বলা হয়েছে যে মহাদেবী সতী ক্রুদ্ধ হয়ে ছিলেন শিবের ওপর। তাই তিনি ভাবলেন "তাংক্তেনমপি দর্পিষ্টং পিতরঞ্চ প্রজাপতিম। সংস্থাস্যামি কিয়ৎকালং স্বস্থানং নিজলীলয়া।" অর্থাৎ শিবকে এবং আমার পিতা দক্ষ-প্রজাপতিকে ত্যাগ করে কিছু সময় নিজ লীলায় অবস্থান করিব।' তারপর তিনি শিবকে দশমহাবিদ্যা রূপ প্রদর্শন করান। মহানির্ব্বাণতন্ত্রে এই প্রসঙ্গে শিব মহাদেবীকে বলেছেন, "ত্বং কালী তারিণী দুর্গা ষোড়শী ভুবনেশ্বরী। ধূমাবতী ত্বং বগলা ভৈরবী ছিন্নমস্তকা। ত্বমন্নপূর্ণা বাগ্‌দেবী ত্বং দেবী কমলালয়া।" — অর্থাৎ 'তুমি কালী, তারা, দুর্গা, ষোড়শী, ভুবনেশ্বরী, ধূমাবতী, বগলা, ভৈরবী, ছিন্নমস্তা, অন্নপূর্ণা, বাগদেবী ও কমলা বা লক্ষ্মী।' তন্ত্র বলেছেন যে নিরাকারা কালী যখন আপন ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতির সঙ্গে যুক্ত হন তখন ভক্তদের মনোকামনা পূরণের জন্য দশমহাবিদ্যার রূপ ধারণ করেন। বিভিন্ন তন্ত্রে দশমহাবিদ্যার বিভিন্ন নাম দেওয়া হলেও প্রচলিত নামগুলি হল ঃ কালী, তারা, ষোড়শী, ভুবনেশ্বরী, ভৈরবী, ছিন্নমস্তা, ধূমাবতী, বগলা, মাতঙ্গী ও কমলা। আসলে সত্ত্বাদিগুণের তারতম্য অনুসারে এই দশরূপ হয়েছে মা কালীর, তবে মহানির্ব্বাণতন্ত্র বলেছেন, "গুণক্রিয়ানুসারে রূপং দেব্যাঃ প্রকল্পিতম।" — 'গুণ ও ক্রিয়া অনুযায়ী দেবীর রূপ কল্পনা করা হয়েছে।'

মাকে কালীরূপে ভাবের ঘোরে অনেকেই দর্শন করেছেন। অন্তরের চাওয়ায় তাঁদের ভাব জগতে মার যে কালী রূপ প্রকাশিত হয়েছিল, তার অপরূপ লীলা কথা গুরুপ্রিয়াদিদি 'শ্রীশ্রী মা আনন্দময়ী', পঞ্চম ভাগে বর্ণনা করেছেন। আলমোড়াতে "ভোলানাথের মুখের সামনে হাত নিয়া ভয়ানক অট্টহাসি হাসিতে লাগিলেন এবং আঙ্গুলিগুলি আপনভাবে ঘুরাইতে লাগলেন। পরে সরিয়া আসিয়া ভোলানাথকে বলিতেছেন — 'চুপ, চুপ, সব সময়ই পাগলামী।' যে ভাবে, যে মূর্ত্তিতে এই ব্যবহারগুলি করিলেন তাহা ভাষায় প্রকাশ করিবার ক্ষমতা আমার নাই।" এই ঘটনার সময় প্রাণকুমারবাবুর ছেলে টুনু শ্রীশ্রীমায়ের ভয়ানক মূর্ত্তি দেখে ভীত হন। নাগপুরের ডি-পি -এম- জি-র স্ত্রী তো স্পষ্টভাবেই প্রকাশ করে বলেছিলেন যে, " আমি আমার পিতার নিকট শিশু বেলায় কালী

দেবীর মূর্ত্তির বর্ণনা শুনিয়া ছিলাম। আমি মায়ের সেই মূর্ত্তি তখন দেখেছিলাম।"

দশমহাবিদ্যার অন্যতমা হলেন ছিন্নমস্তা। তাঁর লীলাকথা নারদপঞ্চরাত্রে প্রকাশিত হয়েছে। ছিন্নমস্তা রজোগুণ প্রধানা সত্ত্বগুণাত্মিকা। তিনি ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ প্রদান করেন। তাঁর নাম উচ্চারণে ভক্তসন্তান সব পাপ থেকে মুক্ত হয়। শুধু তাই নয়, তাঁর করুণা লাভ করলে মানুষ শিব হয়ে যায়- "যস্যা প্রসাদমাত্রেণ শিব এব ভবেন্নর" (পুরশ্চর্যার্নব তন্ত্র, তরঙ্গ ৯)। দিদির বর্ণনাতে পাওয়া যায় যে বিদ্যাকূটে এক বাড়িতে ছিন্নমস্তার ছবি দেখে মা বলেছেন — "ঠিক এই রকম এই শরীরটার ভিতর হইয়া গিয়াছে। বাহিরের দৃষ্টিতে যদিও মাথাটা কাটা নয়, কিন্তু ভাবটা এবং দেখা যাইতেছে প্রত্যক্ষ মাথা কাটা - ঠিক এই রকম হাতে মাথা, রক্তের শিরাগুলি ঠিক এই রকম যেমন ব্লাড প্রেসার হইলে হয় — সেই রকম সজোরে যেন রক্তের ধারা উঠিতেছে। আর এই রকম দু'ধারে দুইজন অর্থাৎ নিজেই যেন এই রকমভাবে আবার রক্তপান করা হইতেছে। ঐভাবে ভাবান্বিত কেহ থাকিলে ঐ মূর্তি পরিষ্কার দেখিতে পায়।"

প্রমথবাবু কিন্তু ভাবে ভাবান্বিত হয়ে মায়ের দেহে ছিন্নমস্তা রূপ প্রত্যক্ষ করেছিলেন। শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী প্রথম ভাগে গুরুপ্রিয়া দিদি লিখেছেন, প্রমথবাবু গল্প করেছেন যে তাঁর মনে সংশয় জেগে ছিল। মনে হল, সেদিন তিনি যে দেবীর বিষয় মনে করেছিলেন, যদি মা তাঁকে সেই মূর্ত্তিতে দেখা দিতে পারেন তবে তাঁর সংশয় দূর হবে। প্রথমবাবু এ বিষয়ে কাউকে কিছু জানান নি। মা একদিন সিদ্ধেশ্বরী কালী মন্দিরের বারান্দায় বসেছিলেন। অনেক রাত্রি হয়েছিল। মা কখন ফিরবেন তার ঠিক ছিল না। ভোলানাথ ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। প্রমথবাবু বসে জপ করে চলেছেন। তখন মার বড় ঘোমটা ছিল মাথায়, মার মুখ প্রায়ই দেখা যেত না. মা কালী মন্দিরে বসেছিলেন একইভাবে। নীরব নিস্তব্ধ রাত্রি। মা হঠাৎ উঠে দাঁড়ালেন, তাঁর মাথার ঘোমটা খসে পড়ল, মাথা উল্টো পিঠের সঙ্গে মিশে গেল, চুল খুলে পড়ল। প্রমথবাবু সেদিন ছিন্নমস্তা মূর্ত্তি দেখবার বিষয় মনে করে ছিলেন, তা'ই মার মধ্যে দেখে তিনি স্তম্ভিত হয়ে গেলেন এবং মাকে প্রণাম করলেন। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করতে হয় যে প্রমথবাবুর সঙ্গে এক চাপরাশি ছিল, সেও এসব দেখেছিল। শুধু ছিন্নমস্তা নয়, সে দশমহাবিদ্যার রূপ মাতৃদেহে দেখেছিল। প্রমথবাবু চাপরাশিকে আলিঙ্গন করে বলেছিলেন যে সে প্রমথবাবুর চেয়ে ভাগ্যবান, কারণ তিনি একরূপ দেখেছিলেন আর চাপরাশি দেখেছিল দশমহাবিদ্যার রূপ।

(ক্রমশঃ)



স্মৃতিচারণ
(দুই)

— শ্রীমতী রেণুকা মুখার্জ্জী

বিন্দু প্রায়ই আমার মায়ের কথায় শ্রীশ্রীমায়ের কাছে গান গাইত। মা একদিন বল্লেন, "তুমি রোজ আমাকে গান শোনাবে?" বিন্দু বলল, "তুমি তো চলে যাবে বেরেলী থেকে।" শ্রীশ্রী মা বল্লেন, "তাতে কি, আমি যেখানেই থাকি তোমার গান শুনব। একটা সময় ঠিক কর, সেই সময়ে গাইবে ও আমি শুনব। পুরো গান না গাইতে পার, এক লাইন গাইবে, তাও না পারলে "আঁ" করে শব্দ করবে। কেমন?"

আমরা একটু consult করে নিয়ে রাত্রি ৮টার সময় শ্রীশ্রীমাকে দেওয়া হল। বহু বৎসর বিন্দু ঐ সময়ে যেখানেই থাকুক মন দিয়ে একটি গান করত। চাকরির ঝামেলায় ঐ অভ্যাসটুকু ছেড়ে যায়। শ্রীশ্রী মা কিন্তু নিজের কথা ভোলেননি — বিন্দু যখনই গাইত, মা শুনতেন।

কৈলাস যাবার পথে শ্রীশ্রী মা বেরেলী আসেন। এই সময়ে আমরা দেখতাম ভাইজী আমার বাবার ও মার সঙ্গে একান্তে অনেক কথা বলতেন। আমাদের বহুদিন পর্য্যন্ত ধারণা ছিল যে ভাইজী তাঁদের দীক্ষা গুরু। কিন্তু তা নয়। তিনি শ্রীশ্রী মায়ের বিষয়ে তাঁর নিজের যে ধারণা সেই কথাগুলি বোঝাবার চেষ্টা করতেন। তাঁর ভাষা ও ভাবে আমার মা খুবই প্রভাবিত হন। ভাইজী একটি স্বরচিত গান, কাগজে লিখে আমার মাকে দিয়ে যান। ঐ গানটি বাঁধিয়ে ছবির মত আমাদের বাড়ীতে টাঙ্গানো ছিল।

ভাইজীর সঙ্গে এই শেষ দেখা। আমার মা সমানেই চিঠি পত্র লিখতেন, খবরের জন্য। মানিকদা ও যূথিকা মাসীমা পত্রদ্বারা খবরাখবর দিতেন। পিতাজী বিন্দুকে দুটি চিঠি এই সময়ে লেখেন — প্রথমটি আলমোড়া থেকে, ভাইজীর আসন্ন মৃত্যুর সময়ে ও অন্যটি কিষণপুর এসে।

ভাইজীর মৃত্যুর সংবাদে সবাই মর্ম্মাহত হয়। মা, বাবা ও আমরা কিষণপুর আশ্রমে যাই। শ্রীশ্রী মা তাঁর নিচেকার কোণার ঘরটিতে বেশীরভাগ সময়ে শুয়েই থাকতেন। পিতাজী আমাকে ও মাকে মায়ের ঘরে বা দরজার বাইরে বসতে বল্লেন। দিদি ছিলেন না। রুমাদেবী যৎকিঞ্চিৎ রান্না করতেন। আমি মাঝে মাঝে মার শরীর ঘসে দিতাম কিংবা চুপ করে বসে থাকতাম। একদিন ঐ রকম বসে আছি। মনে হল একটি অস্বাভাবিক আলোতে ঘর ভরে গেল। মায়ের দিকে তাকিয়ে দেখি মা আমার দিকে চোখ চেয়ে আছেন ও মৃদু হাসছেন। জিজ্ঞাসা করলেন, "কিছু দেখলি না কি?"

আমি মাথা নাড়লাম। শ্রীশ্রী মায়ের অপূর্ব জ্যোতির্ময় শরীরের থেকে বেশী কোথাও কিছু দেখবার আছে জানিও না। মা আর কিছু বললেন না। এই সময়ে আমার মায়ের দীক্ষা হয়েছিল। এর যথাযথ বিবরণ আমরা বহুপরে অর্থাৎ আমার মায়ের মৃত্যুর দুবছর আগে জানতে পেরেছি। আমার মা প্রায় দৃষ্টিহীন হয়ে গিয়েছিলেন কিন্তু জপ, ধ্যান নিয়মিত করতেন। একদিন বীথুকে বল্লেন যে ভাইজীর বইতে শ্রীশ্রীমায়ের মুখ নিঃসৃত যে সংস্কৃত স্তবটি ছাপা আছে সেটা পড়ে দিতে। বীথু পড়ে দিতে মা বল্লেন, "ঠিক আছে আমার মনে হয়েছিল, হয়ত একটু ভুল হচ্ছে।"

আমরা তখন সব সময়ে আমাদের মায়ের খুবই কাছাকাছি থাকি — তাই প্রায়ই শুনতে পেতাম যে মা কিছু একটি মন্ত্র বলছেন যেটা ঠিক চিনতে পারতাম না। এখন বুঝলাম যে ঐ স্তবের দুই লাইন এক সময় খানিকটা জপ করেন। নিজের মন্ত্র প্রকট করতে নাই বলে পুরো স্তবটিই পড়তে বলেছিলেন। মাকে জিজ্ঞাসা করাতে মা এই ঘটনা বল্লেন, "কিষণপুরে একদিন শ্রীশ্রীমা ডেকে বল্লেন, "ভোলানাথ কাগজে কি লিখেছেন - পড়তো।" আমাদের মা পিতাজীর হাত থেকে কাগজ নিয়ে ঐ স্তবের দুই লাইন পড়লেন (মাতৃদর্শন তখনও ছাপা হয় নাই। পিতাজীর কাছেই স্তবটি ছিল নিশ্চয়ই।)

শ্রীশ্রী মা আমার মাকে ঐ মন্ত্র নীচের গুহায় গিয়ে জপ করতে বল্লেন - কিছু সংখ্যা বলেছিলেন যা করতে তিন চার ঘন্টা অনায়াসে আনন্দে কেটে গিয়েছিল। আমি পিছনের বারান্দায় বসেছিলাম। আমার মাকে গুহায় যেতে দেখলাম। কয়েক ঘন্টা পরে মাতাজী ও পিতাজী দুজনেই গুহায় নামলেন। পিতাজী একটি যজ্ঞ কুণ্ডে অগ্নি প্রজ্বলিত করে কিছু আহুতি দিলেন এবং মাকে দিয়ে দেওয়ালেন। ঐ অগ্নিতে কাগজটি আহুতি দেওয়া হল। পূর্ণাহুতির পর শ্রীশ্রীমা ও পিতাজী দুজনেই আমার মায়ের মাথায় হাত রেখে আশীর্ব্বাদ করলেন।

আমার মা যে কত অসাধারণ ছিলেন, আমরা পরে বুঝেছি। শ্রীশ্রীমা একবার বলেছিলেন, "যেমন গুরু তেমন শিষ্য।" এই প্রশংসাবাক্য আমাদের কাছে অতি মূল্যবান। আমার মাকে দিদিমা তান্ত্রিক মতে দীক্ষা দিয়েছিলেন- সোলনে ১৯৪৬এ শ্রীশ্রীমার কথায়। আমার মা বোধহয় দিদিমার প্রথম গৃহস্থ শিষ্যা। এই কারণে দয়ানন্দজী মাকে 'বড়দি' বলেন।

বাবা ১৯৩৮ এর হরিদ্বার কুম্ভর সময় একবার শ্রীশ্রীমার কাছে দুএকদিন থাকবার সুযোগ পেয়েছিলেন। অনেক গল্প বলেছিলেন। পিতাজীর কীর্ত্তনে মহা উৎসাহ। তাঁর হুঙ্কার শুনলেই কয়েকজন ভদ্রলোক লুকিয়ে পড়বার চেষ্টা করতেন- কেন না তা না হলে পিতাজীর সঙ্গে নগরকীর্ত্তনে বেরোতে হবে। যাদের পিতাজী দেখতে পেতেন তাদের ছাড়তেন না।

১৯৩৮ সনের গরমের ছুটিতে আমরা সকলে কিষণপুর আশ্রমে যাই। বাবা প্রথম প্রথম আশ্রমের উপর ভার হবে বলে নিজেদের থাকবার ব্যবস্থা অন্যত্র করে নিতেন। ঐ সময়ে ধীরেনবাবু শ্রীশ্রী মায়ের সেবায় আছেন। পিতাজী অল্প কয়েকদিন হল দেহ রেখেছেন। আমরা তাঁকে শূন্যভাবে বোধ করতাম। যেন খালি খালি লাগত। আমাদের জন্য ধীরেনবাবু পাশের একটি বাড়ী ঠিক করে রেখেছিলেন। এইবার আমার অন্যান্য বোনেদের ও জ্যাঠাইমার প্রথম মাতৃদর্শন। আমরা অর্থাৎ সিদু, রেণু, কণা ও বীথু সর্ব্বদাই মার কাছাকাছি থাকতাম। সিদু, কণার মা (আমাদের জ্যাঠাইমা) ও আমাদের মা মাতৃসেবার সুযোগ পেলেন কেননা দিদি ছিলেন না। আমরা সারাদিন মার কাছে কাছে থাকতাম। কত কথা, আনন্দের মেলা। অভয়দাকে দেখলাম। খুবই উৎপাত করত বলে মা মৌন করে রেখেছিলেন। সন্ধ্যার পর মৌন শেষ করে সান্ধ্য কীর্ত্তন করত। তখন তার সুমধুর গলা শুনে সকলেই সবদোষ অভয়দার ভুলে যেত।

আমরা মার সঙ্গে সন্ধ্যার আগে হাঁটতে যেতাম। মা কয়েকদিন আমাদের রান্না শেখালেন। তরকারি কাটার কি অপূর্ব কৌশল। রান্নায় মসল্লার বিশেষ ব্যাপার নেই- অথচ কি স্বাদ। রংও সুন্দর হত। আমাদের তখন কোনও রকম কাজ কর্ম্মের অভ্যাসই নেই — এই শ্রীশ্রীমা হাতে খড়ি যেন করালেন। জ্যাঠাইমা ও বোনেরাও খুব ভক্ত

হয়ে গেল — আমাদের পরিবারে তখন মা ছাড়া আর কোনও কথা নেই।

এই বছরই শ্রীশ্রীমাকে আবার আমরা পাই হরিদ্বার পীতকুঠীতে পূজার ছুটিতে। বীথু ও আমি কন্যাপীঠ প্রতিষ্ঠা হবার সময় উপস্থিত ছিলাম। মায়ের সামনে যজ্ঞ হল। শান্তি ও ভক্তি বলে দুটি মেয়েকে নিয়ে কন্যাশ্রম আরম্ভ হল। সেই অঙ্কুর যে কত বড় বৃক্ষ হয়ে উঠবে তখন ভাবিনি।

এই সময় একদিন দেখলাম, আমার বাবা আরও তিনজনের সঙ্গে যজ্ঞ করছেন। অন্য তিন জন ছিলেন ডাঃ পন্থ, মন্মথবাবু ও যোগেশদা। বাবাকে মাথায় পাগড়ি পরা দেখে প্রথমটা চিনতেই পারিনি। পরে আমাদের মার কাছে শুনেছিলাম যে শ্রীশ্রী মা বাবাকে দীক্ষা দিয়েছিলেন (কিভাবে তা কেউ জানে না) ও ঐ যজ্ঞের আদেশ দিয়েছিলেন। পূর্ণাহুতির পর সকলে গঙ্গাস্নান করলেন।

শ্রীশ্রীমা কত জায়গায় কতভাবে এইরকম নিজেদের বিস্মৃত কর্ম্মকাণ্ডের অধিকার কতজনকে মনে করিয়ে দিয়েছেন। আমাদের মত পাশ্চাত্য শিক্ষায় প্রভাবিত একটি পরিবারের নিজ ধর্ম্ম বিষয়ে যেন জাগৃতি এনে দিলেন।

(ক্রমশঃ)



"সব কাজে তাঁকে ধ'রে থাক ।

তাহলে আর কিছুই ছাড়তে হবেনা।

— শ্রীশ্রীমা

তীর্থময়ী মা আনন্দময়ী

— শ্রী অরুণ কুমার সেনগুপ্ত

আনন্দময়ী মা উত্তর কাশীতে এলেন। এখানে কালীমন্দির প্রতিষ্ঠা হয়েছে। মায়ের ভক্ত সাধক শংকরানন্দ গিরি এলেন। তিনি স্বামী দেবীগিরি মহারাজের শিষ্য। তিনি মাকে প্রণাম করলেন। তিনি মায়ের নির্দেশেই উত্তর কাশীতে সাধন ভজন করেন। তিনি সবসময় মায়ের নাম করেন। পূর্বাশ্রমের নাম সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। আদি বাড়ী ঢাকার বিক্রমপুরের কামারপাড়াতে। বাবা শ্রীনাথ মুখোপাধ্যায় ছিলেন ঋষিতুল্য লোক। সব সময় মুখে হরিনাম। শংকরানন্দ গিরির ছেলে চিত্তরঞ্জন মুখোপাধ্যায় মায়ের পরম ভক্ত।

মায়ের আসার খবর পেয়ে ছুটে এসেছেন মহাত্মা কৃষ্ণানন্দজী। তিনি পরম যোগী। পরনে ভূর্জপত্রের ছোট নেংটি। বহু সাধু আসেন। শীত নেই, গ্রীষ্ম নেই, বর্ষা নেই, সব সময় এই সব সাধু উলঙ্গ।

মা গঙ্গোত্রীতে এলেন। স্বামী পরমানন্দ খবর পেয়ে ছুটে এলেন। মা গঙ্গার ধারে কালী কম্বলী বাবার ধর্মশালায় দুদিন থেকে উত্তর কাশীতে ফিরে চললেন।

* * *

মা অমৃতসরে এলেন। তিনি স্বর্ণমন্দিরে যাবেন। মায়ের সঙ্গে রয়েছেন পাঞ্জাবী ভক্ত সাধু সিং। মা গ্রন্থসাহেব পাঠ শুনতে বসলেন। মা বললেন - সব ধর্মই এক ধারা। সকল ধারাই এক, আমরা সকলেই এক।

* * *

মা সেবাগ্রাম আশ্রমে এলেন। মহাত্মা গান্ধী মাকে সাদর অভ্যর্থনা জানালেন। গান্ধীজী বললেন, 'মাতাজী'। মা গান্ধীজীকে বললেন, 'পিতাজী'। গান্ধীজী বললেন, মা তোমার কথা সর্বপ্রথম আমাকে জানিয়েছে কমলা নেহেরু। গান্ধীজী মাকে দুদিন থেকে যেতে বললেন। মা বলেন, পিতাজী, এই ছোট্ট মেয়েটার মাথা কিছুটা খারাপ। সব সময় কথা রাখতে পারে না। তার কি করবো পিতাজী? তোমার স্বভাবই মেয়েটা পেয়েছে? মহাত্মাজী হেসে বললেন - আমি ত অনেকেরই বাবা। তুমিও আমাকে বাবা বলছ, ভালই। আমি ভুলে প্রথমে তোমাকে মাতাজী বলে ফেলেছি।

মা মহাত্মাজীকে বলেন, আমি একবার নিজের হাতে সুতো কেটে এক জোড়া কাপড় বানিয়েছিলাম। আমি চরকায় সুতো কাটতে জানি। আর আমি ও পিতাজীরই কাপড় পরি।

কস্তুরবাঈ এসে মাসে প্রণাম করলেন আর বললেন, খুব ভাগ্য যে আপনার দর্শন পেলাম। আমার অনেক দিনের ইচ্ছা দর্শন করব আপনাকে। আজ সার্থক হলো। ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছা পূর্ণ হলো।

* * *

আনন্দময়ী মা আলমোড়াতে এলেন। তিনি ভাইজীর সমাধি মন্দির দর্শন করলেন। আলমোড়াতে উদয়শংকর তখন সপরিবারে ছিলেন। উদয়শংকর মায়ের কাছে ছুটে এলেন। উদয়শংকর মাকে প্রণাম করতে চাইলেন। মা ইচ্ছা পূরণ করলেন। ছেলে, মেয়েরা নাচ গান কীর্তন করলেন। শ্রীমা উদয়শংকর ও নৃতশিল্পীদের বললেন, দেখ পৃথিবীতে সবই নাচ ছে। এই যে কথাবার্তা হচ্ছে এত নাচেরই একটা তরঙ্গ ছাড়া আর কি? দেখ কি তামাসা! এই

শরীরটার ভিতর যখন সাধনার খেলাটা চলছিল তখন তিনদিন আরতির ভাবে ঐ শরীরটা দিয়ে কত ক্রিয়াই যে হয়ে গেছে তা আর কি বলবো ? ওগুলিকে তোমরা নাচই বলো আর যাই বলো। কখনও দেহটা পড়ি পড়ি করেও পড়ে যায়নি। কখনও বা আঙুলের উপর ভর দিয়ে কখনও বা হয়ত পা, ঘাড়, মস্তিষ্ক ও শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলি একভাবে ক্রিয়া করতো। আর সেই সঙ্গে সঙ্গে শ্বাসের গতিও হয়ে যেতো পরিবর্তিত।

আনন্দময়ী মা বলে চলেছেন, নৃত্যেরই তালে তালে সব কিছু। গতি এবং স্থিতি একসঙ্গেই আছে। যেমন বলা যায়- একটা জলাশয় একভাবেই আছে; এ হলো স্থিতি। আবার জলাশয়ে তরঙ্গ আছে এ হলো গতি। আবার দেখো নাচের মধ্যেই আধ্যাত্মিকতার সম্বন্ধ আছে। যদি ওই ভাবটা নিয়ে কাজ করা যায় তবে সহায়তা হবেই। এই নাচের তরঙ্গ তারপর নিস্তরঙ্গভাবে গিয়ে শেষে তরঙ্গ নিস্তরঙ্গের উপরে চলে যাওয়া। যা হতে এই সবই আসছে। সেই মূলে যাওয়া চাই কি বল ?

শ্রীমা নৃত্যশিল্পের কি অসাধারণ ব্যাখ্যা দিলেন। মায়ের এই অনবদ্য ব্যাখ্যা শুনে মুগ্ধ হয়ে গেলেন উদয়শঙ্কর, অমলাশংকর, ফরাসী মহিলা সিমকি ও অন্যান্য নৃত্যশিল্পীরা।

উনিশে বৈশাখ মায়ের জন্মোৎসব পালিত হল। উদয়শংকরের পরিচালনায় নাচগান হল। এক অনবদ্য পরিবেশ। মা বললেন - দেখ, একান্ত না হলে শ্রীকান্তকে পাওয়া যায়না।

* * *

শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী স্বয়ং পরম তীর্থ। শ্রীশ্রীমাকে দর্শন করলেই পরমতীর্থ দর্শন করা হয়। আবার তীর্থময়ী মা আনন্দময়ী ভারতের নানা প্রান্তে গেছেন। প্রতিটি তীর্থক্ষেত্রে মা ভক্তদের অমৃতময়বাণী পরিবেশন করেছেন। তীর্থময়ী মায়ের এ এক অপূর্ব আনন্দলীলা।

বাংলা ১৩৩২ সালে শাহবাগেই শ্রীশ্রী মায়ের সামনে প্রকাশ্য কীর্তন গান শুরু হয়। কীর্তন গান শুনে মায়ের অর্পূব ভাবাবেগ হল। মা নিজে গাইলেনঃ

হরে মুরারে মধুকৈটভারে
গোপাল গোবিন্দ মুকুন্দ সৌরে।

ঢাকায় ঘরে ঘরে মায়ের মহিমা ছড়িয়ে পড়ল। মা আবার ঢাকায় এলেন। তিনি সিদ্ধেশ্বরী কালীমন্দিরে এলেন। মা কালীকে প্রদক্ষিণ করলেন। এরপর তিনি দরজার সামনে পড়ে রইলেন। তিনি ভাবসমাধিস্থ হলেন।

* * *

১৩৩৩ সাল। ফাল্গুন মাস। হরিদ্বারে পূর্ণকুম্ভ। শ্রীশ্রীমা কাশী থেকে হরিদ্বারে যাবেন। মা কয়েকটা দিন কাশীতে এক ভক্তের কাছে রইলেন। যে কটা দিন শ্রীশ্রীমা কাশীতে ছিলেন, সে বাড়ী ক'দিন নামগানে মুখরিত ছিল। তিনি হরিদ্বার যাত্রা করলেন।

আনন্দময়ী মা হরিদ্বারে ধর্মশালায় উঠলেন। তিনি কুম্ভযোগে মহাস্নান করলেন। তিনি ভক্তদের নিয়ে পরমতীর্থ হরিদ্বারে কাটালেন। শ্রীমা হৃষীকেশ যাত্রা করলেন। তিনি হৃষীকেশে কালী কম্বলীওয়ালার ধর্মশালায় উঠলেন। পরম পবিত্র তীর্থভূমি ত্রিবেণী ঘাটে শ্রীমা এলেন। তাঁর ভাবাবেশ হল। মা লছমনঝোলায় এলেন। পুণ্যভূমি এই লছমনঝোলা। গঙ্গা উদ্দামগতিতে ছুটে চলেছে। মা যেন শুনলেন পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণের বাঁশীর অপূর্ব সুর।

* * *

আনন্দময়ী মা বৃন্দাবনে এলেন। তিনি মহানন্দে বৃন্দাবন্রে নানা তীর্থস্থান ঘুরছেন, তাঁর দেহে রাধারানীর ভাব ফুটে উঠেছে। মা মথুরায় এলেন। তিনি দর্শন করলেন মথুরানাথ শ্রীকৃষ্ণকে। তিনি রাধাকুণ্ড, শ্যামকুণ্ড দর্শন করলেন। তিনি ধ্রুবঘাট, গিরি গোবর্ধন দর্শন করলেন। তিনি পরম তীর্থ বৃন্দাবনের নানা কুঞ্জ দর্শন করলেন। শ্রীকৃষ্ণ বিভিন্ন কুঞ্জে কত লীলাই করেছেন। তাই মা বিভিন্ন কুঞ্জে ঘুরে বেড়ালেন।

মা মথুরা, বৃন্দাবন তীর্থভ্রমণ করে ঢাকায় ফিরে এলেন। এখানে তাঁর ধর্মপুত্র জ্যোতিষ চন্দ্র রায় (ভাইজী) অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। শ্রীমা প্রতিদিন তাঁর কাছে আসেন। প্রতিদিন তাঁর কাছে প্রসাদ পাঠান।

* * *

১৩৩৪ সাল। আনন্দময়ী মা কলকাতা হয়ে কামাখ্যা দর্শনে বেরিয়ে পড়লেন। অন্যতম মহাপীঠ এই কামাখ্যা। মা কামাখ্যা দেবীকে দর্শন করেন। এক পরম পবিত্র ভূমি কামাখ্যা পাহাড়। আর এই কামাখ্যা পাহাড়ে ভোলানাথজী জগজ্জননী আনন্দময়ী মাকে মহাদেবী রূপে আরাধনা করলেন। শ্রীশ্রী মা অনেকক্ষণ সমাধিস্থ হয়ে রইলেন। মায়ের জ্যোতির্ম্ময়ী মূর্তি যারা দেখবার সুযোগ পেলেন, তাঁরা মহাপুণ্যবান। মা বেশ কয়েকটা দিন কামাখ্যায় কাটালেন।

* * *

মা ঢাকায় ফিরবেন। তিনি লামডিং হয়ে পি রোজপুরে এলেন। তিনি পিরোজপুরে তাঁর ভক্ত মুনসেফ্ দীনেশ চন্দ্র রায়ের বাড়ীতে উঠলেন। তাঁর বাড়ীতে কীর্তন গান শুরু হল। মায়ের ভাবাবেগ শুরু হল। একটু পরে মা স্বাভাবিক হলেন। শ্রীশ্রীমা এখান থেকে বাইসারি গ্রামে তাঁর ভক্ত গিরিজাশংক রের বাড়ীতে উঠলেন। তিনি পায়ে হেঁটে গ্রামে গ্রামে ঘুরলেন। মা সকলকে বলেন, - বেশ সুন্দর করে আনন্দের খেলা খেলতে শেখ। তাহলে খেলার ভেতর দিয়েই চরম আনন্দ পাবে।

১৩৩৫ সাল। বৈশাখ মাস। মা ঢাকায় এসেছেন। সিদ্ধেশ্বরীতে শ্রীশ্রী মায়ের প্রথম জন্মোৎসব অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হল। রাতের শেষ প্রহরে ভোলানাথ মহাদেবী শ্রীশ্রীমাকে পুজা করলেন। মায়ের বাবা বিপিনবিহারী ভাবে বিভোর হয়ে কীর্তন গান গাইলেন। সে এক অপূর্ব দৃশ্য।

মা উঠলেন উত্তমা কুটিরে। এখানে কালীমূর্তি আনা হয়েছে। বাড়ীর কাছেই ঢাকেশ্বরীর বাড়ী। বহু ভক্ত মাকে দর্শন করলেন। বাড়ী মন্দিরে পরিণত হয়েছে। একদিন শ্রীশ্রী রামঠাকুর মাকে দর্শন করতে এলেন। শ্রীশ্রী রামঠাকুর আনন্দময়ী মাকে দেবী ভগবতী বলে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করলেন। বিশ্বজননী, কৈবল্যদায়িনী শ্রীশ্রী মা আনন্দময়ী শ্রীশ্রী রাম ঠাকুরের প্রণাম গ্রহণ করলেন। শ্রীশ্রীরাম ঠাকুর ছিলেন পরম যোগী। পরমযোগী পরমযোগিনীকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করছেন, এ এক পরম দৃশ্য।

শ্রীশ্রী মা বললেন, এই শরীর তো একটা ঢোল. তোরা যে তালে বাজাবি সেরূপ আওয়াজ পাবি। আমি তো দেখতে পাই, সর্বত্রই একেরই তো খেলা চলছে।

(ক্রমশঃ)



সংযম সপ্তাহ মহাব্রত প্রসঙ্গে

(পাঁচ)

—ব্রহ্মচারিণী গীতা ব্যানার্জ্জী

শ্রী শুকদেবের স্থান শুকতাল। দ্বাদশতম সংযম সপ্তাহ মহাব্রতের অনুষ্ঠান এখানে। শ্রী কল্যাণদেবজী মুজফ্‌রনগর স্টেশনে বিরাট শোভাযাত্রা সহ মাকে অভ্যর্থনা করেন।

ব্রহ্মশাপ হতে মুক্ত হওয়ার জন্য অনশনে প্রায়োপবেশনে গঙ্গাতীরে উপবিষ্ট পরীক্ষিতকে সাত দিন ভাগবতামৃত পান করিয়েছিলেন শ্রী শুকদেব। মৃত্যু-পথ-যাত্রীর করণীয় কি? এই প্রশ্নই ছিল পরীক্ষিতের।

আজও সেই ভবরোগ থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য অমরত্ব প্রাপ্তির জন্য মাতৃসান্নিধ্যে সপ্তাহব্যাপী সংযমের অনুষ্ঠান এই আনন্দতীর্থে। শ্রীশ্রী মা বলেছেন, 'এতো ব্রহ্মবিদ্যা। নিজ স্বরূপ প্রাপ্তির জন্য এই কঠোরতা। প্রথম দিন গঙ্গাজল - এতে নাড়ী শুদ্ধ করে। এইটি চিত্ত নির্মলকারীও বটে।"

স্বামী বিষ্ণু আশ্রমজী, স্বামী অখণ্ডানন্দজী, স্বামী মহেশ্বরানন্দজী, স্বামী কৃষ্ণানন্দ অবধূতজী সকলেই এই সংযমে এসেছিলেন। প্রত্যেকেই এই তীর্থের বিষয়ে, সংযমের বিষয়ে খুব সুন্দর বলেন। শ্রীচরণদাসবাবাজী এখানে এক বটবৃক্ষের তলায় শ্রীশুকদেবজীর দর্শন পান।

একদিন মাতৃ সৎসঙ্গের সময় মা এখানে বললেন, "শুকদেবের স্থানে বসেও কিছু অনুভব হচ্ছে না বলছ — কিন্তু তিনি কৃপা করে এই স্থানে না আনলে কি তোমাদের এখানে আসা হত? তিনি সব সময় আছেন, সকলের মধ্যে আছেন — যতক্ষণ আমি আমার, ততক্ষণ সে বোধ নেই। বারোটি সংযমের মধ্যে দ্বাদশতম সংযমব্রতটি এখানে হল। তোমরা এবার ফিরে গিয়ে নিত্য এই তীর্থস্মরণ করবে।"

* * *

রাজস্থানের একটি ছোট্ট শহর পিলানী। শ্রীযুগল কিশোর বিড়লাজীর জন্মস্থান। মহাভারতের যুগে এই পিলানীই বিরাট নগরীর রাজধানী "উপপ্লব্য" নামে বিশেষ খ্যাতি লাভ করেছিল। এই উপপ্লব্য হতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ রাসপূর্ণিমার দিন পাণ্ডবদের শান্তিদূত হয়ে হস্তিনাপুর গমন করেন। ঐদিনই আমাদের সংযম সমাপনের পর হোম হয়।

পাণ্ডবেরা দ্বাদশবর্ষ বনবাসের পর এয়োদশতম বর্ষ অজ্ঞাতবাসে বিরাটরাজের রাজধানীতে অতিবাহিত করেন। পাণ্ডবদের ত্যাগ, তপস্যা, ধৈর্য্য, সহিষ্ণুতা, কৃচ্ছ্রতায় পরিপূর্ণ সেই এক বৎসর। এইভাবে পাণ্ডবদের ত্রয়োদশতম বর্ষ এই পিলানীতেই অতিবাহিত হয় ও সমাপ্ত হয় তাঁদের বনবাস ও অজ্ঞাতবাস। এই পিলানীতেই ত্রয়োদশতম সংযমসপ্তাহ মহাব্রত অনুষ্ঠিত হয়। রাসপূর্ণিমার দিন শ্রীকৃষ্ণের শান্তিদূত হয়ে এখান থেকে হস্তিনাপুর গমন, আর আজ চিরশান্তি কামনায় ব্রতীরা মায়ের চরণে সংযম সাধনায় নিরত।

শ্রীযুগলকিশোর বিড়লাজীর আমন্ত্রণে এখানে সংযম সপ্তাহ অনুষ্ঠান। ৫ই নভেম্বর হতে ১১ই নভেম্বর, ১৯৬২ এই সংযম অনুষ্ঠিত হয়।

শ্রী বিড়লাজী নিজের বিরাট বাগানের মধ্যে অব স্থিত 'বিশ্রামবাটিকায়' মায়ের থাকার ব্যবস্থা করেন।

যদিও চীনের যুদ্ধ চলছিল, তবু সংযম সপ্তাহ যথাযথভাবেই সুসম্পন্ন হয়। বিড়লাজীর সৌজন্যে পিলানীতে বহু ভাল কলেজ নির্মিত হয়েছে। এখানে বিড়লা নির্মিত 'সরস্বতী মন্দির' একটি দর্শনীয় স্থল। পিলানীর প্রতিটি কলেজের ছাত্রছাত্রীরা মার দর্শনে এসেছিল এবং তারা প্রার্থনা জানায় যে এখানে এরূপ প্রতিবছরই সংযম সপ্তাহ হলে ভাল হয়। এখানে একটি সৎসঙ্গভবন হওয়া উচিত।

এখানে এসে মা প্রথম দিনই পিলানীর কিছু বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সূক্ষ্ম শরীরে দেখেন। তাঁদের মুক্তির জন্যই কি মার এখানে আসা?

প্রোফেসার ত্রিপুরারি চক্রবর্ত্তী মহাভারতের মধুর কথা সকলকে শুনিয়ে মুগ্ধ করেন।

এখানে মা একদিন সৎসঙ্গে পরোপকারী রাজার গল্প বলেন। অয্যোধ্যার এক রাজা। তিনি এক ব্যক্তির কিছু প্রার্থনায় তাঁকে নিজের সম্পূর্ণ রাজ্য দান করে তপস্বী বেশে বেরিয়ে যান। তিনি পথে এক কূপের মধ্যে সিংহ, বানর, সাপ ও একটি মানুষকে দেখতে পান। রাজা প্রথম জন্তুদের ওঠান। তারা মানুষকে ওঠাতে বারণ করা সত্ত্বেও পরোপকারী রাজা দয়া করে ঐ মানুষটিকেও ওঠান। সিংহ রাজাকে একটি স্বর্ণহার দেয়। রাজা তা মানুষটিকে দেন। কিন্তু অকৃতজ্ঞ মানুষ তাঁকে বধ করতে উদ্যত হয়। সাপ এসে রাজাকে রক্ষা করে। রাজা মানুষটির উপর ক্রোধ না করে তার আরো ধনদৌলতের ব্যবস্থা করে দেন। বানর রাজাকে একটি অমৃত ফল দেয়। সেই অমৃত ফল রাজা যাকে রাজত্ব দিয়েছিলেন, সেই ঋষিতুল্য ব্যক্তিকে দান করতে গেলেন। তখন সেই ঋষি আর একটি অনুরূপ ফল চাইলেন। রাজা সেই ফলের জন্য পুনঃ বানরের কাছে প্রার্থী হলেন। বানর বলল, মহাবীর তাকে এই ফল দিয়েছেন। মহাবীরের কাছে যাওয়ায় মহাবীর বললেন, "আমাকে এই ফল শংকর ভগবান দিয়েছেন।' শংকর বললেন, 'বিষ্ণু দিয়েছেন।' বিষ্ণুর কাছে যাওয়ায় বিষ্ণু বললেন, 'আমি এই ফলের সম্পূর্ণ বাগান পরোপকারী রাজাকে দিয়েছি।' সেই ঋষিতুল্য ব্যক্তি ছদ্মবেশী মহাত্মা ছিলেন। তিনি রাজাকে পরীক্ষা করছিলেন। তিনি রাজার রাজত্ব ফিরিয়ে দিলেন। এইরূপ পরোপকার গুণে রাজার রাজত্ব, অমরত্ব, অমৃত ফল, বৈকুণ্ঠলাভ সব সম্ভব হল।

একদিন মা খুব সুন্দর কীর্তন করলেন —

"হে ভগবান,হে ভগবান,হে ভগবান,হে ভগবান।
জ্ঞেয় ভগবান, ধ্যেয় ভগবান, প্রেয় ভগবান, শ্রেয় ভগবান,
হে ভগবান, হে ভগবান, হে ভগবান, হে ভগবান।।
মঙ্গলময় হে ভগবান, শান্তিময় হে ভগবান।।
প্রেমময় হে ভগবান, আনন্দময় হে ভগবান।।"

* * *

মায়ের পুরাতন ভক্ত শ্রীকান্তিভাই মুন্‌শা মাকে আমেদাবাদে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন চতুর্দশতম সংযম সপ্তাহ মহাব্রতের জন্য। মা সম্মতি প্রদান করেছিলেন। কিন্তু ইতিপূর্বে তাঁর দেহাবসান হয়েছে। তাঁর ধর্মপত্নী শ্রীমতী কুন্দনবেনের আগ্রহে মায়ের আমেদাবাদে আগমন। এখানে ২৩ শে নভেম্বর হতে ২৯ শে নভেম্বর, ১৯৬৩ চতুর্দশতম সংযম মহাব্রত অনুষ্ঠিত হবে।

কান্তিভাইর বাড়ীর ওখানেই প্যান্ডেল নির্মিত হয়েছে। দ্বিতীয় দিনই ব্রতীর সংখ্যা এত অধিক হল যে প্যান্ডেলের ঘেরাও খুলে দিতে হয়। স্বামী মহেশ্বরানন্দজী, স্বামী কৃষ্ণানন্দজী, স্বামী নির্দোষানন্দজী, শ্রী কৃষ্ণানন্দ অবধূতজী, শ্রীযোগেশব্রহ্মচারীজী প্রভৃতি মহাত্মাগণ সংযমে সম্মিলিত হন। বিদেশ থেকে লস এঞ্জেলস হতে যোগানন্দ আশ্রমের দুর্গামাতা বলে একজন বিদেশিনী সন্ন্যাসিনী মার কাছে এসেছেন এবং প্রখ্যাত জার্মান উপন্যাস-লেখিকা শ্রীমতী মেলিটা ম্যাশ্‌ম্যানও এসে এই সংযমে যোগদান করেছেন।

সংযমের তৃতীয় দিন সকালে পৌনে ৮টায় প্যাণ্ডেলে যাওয়ার সময় মা হঠাৎ দিদিকে বললেন, "দিদি, কোনদিনও তো সংযমে বৃষ্টি হয়নি। এবার ভাগবতেও বৃষ্টি হল। আজকে দিনটা ভালোও না।" এই বলে মা প্যাণ্ডেলে চলে গেলেন।

এদিকে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। খুব জোরে বাতাস বইতে লাগল। মেঘের গুরুগম্ভীর গর্জন আরম্ভ হল। আর মুষলধারায় বৃষ্টি আরম্ভ হল। মা ধীর স্থির হয়ে বসে রইলেন। তাই দেখে সকলেও নিজের নিজের আসনে স্থির হয়ে বসে রইলেন। এরপর মার কাছে জল পড়তে লাগল। ধীরে ধীরে এরপর মার উপর ঝর্ণার মত জল পড়তে লাগলো। মার উপর ছাতা ধরা হল। মা কিন্তু স্থির হয়ে বসে আছেন। এরপর প্যাণ্ডেলের উপর বাসের মাচাও ভেঙ্গে পড়ল। মার মাথার উপরেও প্যাণ্ডেল ভেঙ্গে পড়ে আর কি। বাঁশ ইত্যাদির সাহায্যে কোনমতে ঠেকিয়ে রাখা হল। মা স্থির হয়ে বসে রইলেন। ব্রতীরাও কেউ আসন ছেড়ে ওঠেনি।

একি মার গিরি গোবর্দ্ধনধারী রূপ? ধ্যানের এক ঘন্টা কোনমতে কেটে গেল। যথারীতি "হে পিত" ও "মা-মা" কীর্তন শেষ হওয়ার পর মা সকলকে প্যাণ্ডেল ছেড়ে বাইরে যেতে বললেন। মাকে ভিতরে দেখে কেউ-কেউ প্যাণ্ডেলেই দাঁড়িয়ে রইলেন। মা তাঁদের মনোভাব বুঝতে পেরে জোর গলায় বললেন, "সবাই না বের হলে এই শরীরও উঠবে না।" তখন সকলের বের হওয়ার পর মাও উঠে স্টেজের পা-দানিতে সবে মাত্র পা দিয়েছেন অমনি মড়মড় শব্দে সমস্ত প্যাণ্ডেলটি ভেঙ্গে পড়ল। উপরের জল পড়ে সেই জায়গাটি পুকুরের মত হয়ে গেল।

পরে মা বললেন, যে মা দুখানি হাত দেখেছিলেন। হাত দুখানি রাধিকারই হোক বা ভগবতীরই হোক এ দুখানি হাতই দীর্ঘ একঘন্টা কাল ধরে সামিয়ানাটিকে ধরে রেখেছিল।

ধ্যানের পর দেখা গেল ঝড়বৃষ্টি একটু কমেছে। মা কান্তি ভাইয়ের গাড়ি বারান্দায় দাঁড়িয়ে ড্রয়িংরুমে সৎসঙ্গের ব্যবস্থা করালেন। মা সকলকে ডেকে বললেন, "এখন এদিকে কেউ থেকো না। ঘরেও যেওনা। সময় এখনো খারাপ। ভেবে দেখ আরো কত কি হতে পারত। এতগুলো লোক ভিতরে। ঐ অবস্থায় প্যাণ্ডেল যদি ভেঙ্গে পড়ত, কি হত। ঝড় জলের উপর দিয়েই ঝঞ্ঝাট গেল।" প্যাণ্ডেলের মাথার উপর কত লাইট ও ফ্যান ঝুলছিল একজনেরও মাথার উপর পড়লে কি কাণ্ড হত? একজনেরও কিছু হয়নি মারই কৃপা। মার গিরিগোবর্দ্ধনধারীরূপ দর্শনে সকলে স্তম্ভিত।

মার ঘরও জলে ভরে গেছে। মার জন্য গ্যারেজে থাকার ব্যবস্থা হয়েছে। কিন্তু মা ঘরে গেলেন না। মা ভিজা কাপড়েই রইলেন। দুর্যোগ শেষের পরেই মা কাপড় ছাড়লেন।

জল কমার পর পরমানন্দ স্বামীজী এক রাত্রির মধ্যে আবার প্যাণ্ডেল তৈরী করলেন। হরিদ্বার থেকে ব্রতীদের জন্য ১০০টিন গঙ্গা জল আনা হয়েছিল।

এবার স্থানীয় সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক দেবী ভাগবত পাঠ করেন। ভগবানের চরণে নিজেকে অর্পণ করে তাঁর ধ্যানে পূর্ণরূপে মন বসাতে পারলে ভগবানই সমস্ত বিপদ হতে তাকে রক্ষা করেন। এবারের সংযম তারই শ্রেষ্ঠতম নিদর্শন।

* * *

বৃন্দাবন ধামে পঞ্চদশতম সংযম সপ্তাহ মহাব্রতকে আন্তর্জাতিক সংযম সপ্তাহ মহাব্রত বলা যেতে পারে। এবার বহু বিদেশী ভক্ত ব্রতী হয়ে সংযমে যোগদান করেন। যেমন আমেরিকা, ফ্রান্স, জামনী, সুইজারল্যান্ড, অস্ট্রিয়া, মস্কো, শ্রীলঙ্কা ও দক্ষিণ ভারত হতেও কিছু ভক্ত এসেছেন। শ্রীমান এবং শ্রীমতী Desjardins তাঁদের সাত বছরের কন্যা ও চার মাসের পুত্রটিকে নিয়ে মাতৃ-দর্শনে এসেছেন। সম্ভবতঃ ইওরোপীয়ান ভক্তদের মধ্যে এই শিশুটিই সবচেয়ে কম বয়সে মাতৃদর্শন করার সুযোগ পায়। মা তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "বন্ধু, তুমি কি আমায় চিনেছ?"

মহাত্মাদের মধ্যে বহু স্থানীয় গোস্বামী ও মহন্তরা এবং স্বামী অখণ্ডানন্দজী, স্বামী চৈতন্যগিরিজী, স্বামী শরণানন্দজী, হরিবাবা প্রভৃতি অনেকেই এসে যোগদান করেন। ১১ই নভেম্বর হতে ১৮ই নভেম্বর, ১৯৬৪ বৃন্দাবনে সংযম সপ্তাহ হয়।

বৃন্দাবন আশ্রমে এই প্রথম সংযম সপ্তাহ। এরপর বহুবার এখানে সংযম সপ্তাহ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

(ক্রমশঃ)

*

"ভগবানের নাম হবে, আর পবিত্রতা আসবেনা — এ কি হয়? যেখানে তাঁর নাম, সেখানে পবিত্র ধাম।"

— শ্রীশ্রীমা

আনন্দময়ী স্মৃতি

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

— কুমারী চিত্রা ঘোষ

উপরে এসেই মা বারান্দায় অনবরত পায়চারী করতে লাগলেন। চুলখোলা পিঠের উপর, খালি এদিক আর ওদিক। শুনলাম অবধূতজী নাকি গোবিন্দজীউর প্রসাদ নেবেন না; তাঁর রান্নার কোন ব্যবস্থা নেই বলে মা এত বিচলিত। আমি ঘরের চৌকাঠের কাছটিতে চুপ করে দাঁড়িয়ে দেখছি মাকে। বার দশেক পায়চারী করার পর হঠাৎ আমাকে বল্লেন, "তুই কিছু খেয়েছিস?" আমি — না মা তোমাকে দর্শন না করে কিছু খাইনি। মা — ঘরে ঢুকে পুষ্পকে — "ওকে লুচি ও হালুয়া দে।"

পুষ্প নীচে যাঁরা এসেছেন তাঁদের জলখাবার দিয়ে দিয়েছিল বলে হালুয়া আর ছিল না। তাই আমাকে লুচি ও মিষ্টি দিল।

মা — হালুয়া দে।

পুষ্প — হালুয়াতো আর নেই।

মা — তুই ঠিক করে কলাপাতা উঠিয়ে দেখ দেখি হালুয়া আছে কি নাই?

অবাক কাণ্ড ঠিক আমার মতন হালুয়া রয়েছে থালার একদিকে। আমার দিকে চেয়ে তখন মার কী হাসি।

মা — যা বাইরে গিয়ে খেয়ে আয়। ওকে জল দিয়ে আয়।

তারপর মা বেরিয়ে এসে আমাদের ঘরে ঢুকলেন। ইতিমধ্যে বুনিদি as usual তর্ক করছে যে মা তুমি কাল আমাকে বলোনি যে অবধূতজীর জন্য রান্না করতে হবে।

মা — দেখ্, এ শরীরটা মিথ্যা কথা কয় না, তোকে আমি নিশ্চয় বলেছি। যা - যা - যা - যা বলে বুনিকে রান্না করতে পাঠালেন।

হঠাৎ আমাদের বল্লেন যে তোদের জিনিষপত্তর ঐ বড় ঘরে নিয়ে যা, আমি এ ঘরে শোব। আমরা আর কিছু বলতে পারলাম না। বলা মাত্র সব এনে যে ঘরে মার ব্যবস্থা করা হয়েছিল সে ঘরে ফেলা হল। মা আমার কাছে বিন্দুদির বিছানা দেখে বল্লেন, "তোর বিছানা আন।" আমি সেটাই আমার বলে রাখলাম। বিছানা তো আমি নিয়েই যাইনি। মা তখন নিজে দাঁড়িয়ে জলের কলসী থেকে আরম্ভ করে সব গুছিয়ে রাখলেন।

মার ঘর তাড়াতাড়ি পরিষ্কার করে মার বিছানা করে দিলাম। ইতিমধ্যে অবধূতজী এসে half kneel down হয়ে খেতে বসলেন। মিষ্টি আলু ও আঙ্গুর — মা ও দিদি দাঁড়িয়ে খাওয়ালেন। তারপর মা বল্লেন, "দিদি আমি কলঘরে যাব।" মা নীচে গেলেন। আমরা মার জলের বালতী নীচে এগিয়ে দিয়ে প্রসাদ নিতে গেলাম।

নাট মন্দিরে বসে ২৫ জন নিরামিষ তরকারি দিয়ে অপর্যাপ্ত ভাত পোলাও খেয়ে উপরে এসে দেখি মা ভোগে বসেছিলেন। বেরিয়ে এসে আমাকে বল্লেন, "খেয়েছিস, এবার একটু তক্তপোষে গড়িয়ে নে"। বলে মা নিজের ঘরে শুতে চলে গেলেন।

ইতিমধ্যে দিদিও ঘুমিয়ে পড়লেন। দিদি আবার এক কাণ্ড করেছেন — এক বস্ত্রে চলে এসেছেন কাপড়ের সুটকেশ ফেলে। চুপি চুপি দিদির নতুন ধুতি এনে তা গেঁরু মাটি দিয়ে রং করে শুকানো হল। আমরাও একটু জিরোচ্ছি।

চারটে বাজতে না বাজতেই মার গলার আওয়াজ শুনে গিয়ে দেখি যে মা ঘরে তক্তপোষের উপর বসে কমলদা, স্বামীজী ও অন্যান্য সকলের সঙ্গে কথা বলছেন, আমি দোর গোড়ায় গিয়ে বসতেই মা বল্লেন — "একা একা লাগছে না কি? সকালে ভেট্ দিতে হয়েছিল? চা খাবি?"

তার কিছুক্ষণ পরেই মা উঠে ছাদে খালি পায়ে পায়চারী করতে লাগলেন, চুল as usual খোলা, খালি পা - আপন মনে বেড়াচ্ছেন। আমরাও পেছন পেছন হাঁটছি। হঠাৎ বল্লেন, "পাঞ্জাবে সাধুসেবা খুব ভাল হয়, এখানে সাধুসেবা ঠিক হয় না। যোগীভাই (সোলনের মহারাজ) আসছেন দেখে বলে উঠলেন, "যোগীরাজ — যোগীরাজ রাজা কিন্তু যোগী তবে একজনই হয়, সব হয় না, ওর চমৎকার ভাব।"

এখন কথা হচ্ছিল যে তার পরদিন ভোরে সব মেয়েরা চলে যাবে। মা বিকাল তিনটায় মোটরে রওনা হবেন। মেয়েরা ভোর ৬টার গাড়ীতে রওনা হবে ও সেই রাত্রেই পুরী যাবে। আমি তখন ভাবছিলাম যে ভোর ৬ টায় চলে গেলে তো মার সঙ্গ আজকেই শেষ। অমনি যেন মা মনের কথা বুঝে বলে উঠলেন, "চিত্রা ১টার গাড়ীতেই যাবে; ওতো আর পুরী যাবে না। যতীশ তুমি ওকে পৌঁছে দেবে।" আমার যে কী আনন্দ তখন। সত্যি মা তুমি এত ভালবাস! মন ভরিয়ে আমার আশা মিটিয়ে দিচ্ছ।

বিন্দুদি আমার কাছে সুরধনী দেখা হয়নি বলাতে আমি মাকে বল্লাম যে, "মা আমরা তো সুরধনী দেখিনি।" মা — "ও তোরা সুরধনী যাস নাই? তবে যা এখন দেখে আয়।" বলে এক বুড়োকে ঠিক করে দিলেন আমাদের দেখাতে নিয়ে যাবার জন্য।

সেই বুড়োর সঙ্গে আমরা হেঁটে সুরধনীর ধারে গেলাম। সুরধনীর অপূর্ব্ব মাহাত্ম্য। এর পারে বসেই মহাপ্রভু সদলবলে কীর্ত্তন করতেন। বিন্দুদি অবগাহন করল। পুষ্প, গঙ্গা ও আমি স্নান করলাম না। যখন ফিরে আসছি তখন ওরা সকলে বল্ল যে মা নিশ্চয়ই বাবাদের সঙ্গে দর্শনে চলে গেছেন। কিন্তু গোবিন্দজীউর মন্দিরে পৌঁছিয়েই দেখি দিদি একতাড়া চিঠিপত্তর নিয়ে মার ঘর থেকে বেরিয়ে আসছেন। একটু পরে মা পশমের জুতোটি পরে আমাদের ঘরের দিকে এলেন। মাকে দেখেই আমি বল্লাম — "মা তুমি কী দর্শনে যাচ্ছ? আমরা কী তোমার সঙ্গে যাবো ?" অমনি মা দুই হাত দিয়ে — "চল চল - নীচে যা" - বলে আমাদের এগিয়ে দিলেন।

নীচে এসে একটু অপেক্ষা করতেই মা এসে গেলেন। তিনটে রিক্সা ভাড়া করা হল। মেয়েদের জন্য মা সব বলে দিলেন কে কোনটায় যাবে। গঙ্গা, পুষ্প একটাতে— চিত্রা বিন্দুদি আর একটাতে, আর একটাতে মা নিজে ও

পায়ের কাছে দিদি। কোথায় মার রিক্সা lead করবে তা না হয়ে আমরা প্রথমে, মা মাঝে ও গঙ্গা, পুষ্প শেষে এই ভাবে আমরা রওনা হলাম। ছেলেরা সব হাঁটছিল। আমি একবার পেছন ফিরে দেখলাম যে মা কীরকমভাবে যাচ্ছেন। দেখি চুড়ো বেঁধে majestically বসার দরুন মাকে ঠিক যেন রানীর মতন দেখাচ্ছিল। সেই আপনভোলা দৃষ্টি, চারপাশ লোকজনের উপর যেন খেয়াল নেই, যেন কোন এক অদৃশ্য লোকে বিরাজ করছেন।

প্রথমেই আমরা শ্রীবাস অঙ্গনে এলাম; সাধুবাবাদের নিতে এলাম। নেমেই মা হনহন করে এগিয়ে চল্লেন। সাধুবাবারা তখনও স্নান করেননি, তাই বিগ্রহ দর্শন করতে মা অগ্রসর হলেন ও আমরাও মার পিছু নিলাম। শ্রীবাস অঙ্গনের মন্দিরে সব অবতারদের চমৎকার বিগ্রহ আছে। মূর্তিগুলি gallery র উপর পাশাপাশি সাজানো। মা সব জেনেও ছোটমেয়ের মতন আব্দার করে সেবায়েৎ কে বল্লেন "সব বুঝিয়ে দাও।" ও তিনি যা বলছেন মাথা নেড়ে হেসে হেসে শুনছিলেন। ইতিমধ্যে অবধূতজী ও হরিবাবা এসে উপস্থিত। অবধূতজী মেয়েদের একটুও পছন্দ করেন না, তাই আমরা একদম তটস্থ।

শ্রীবাস অঙ্গন থেকে আমারা সোনার গৌরাঙ্গ দেবের মন্দিরে গেলাম। সেখানে পৌঁছিয়ে দেখি তখন আরতি হচ্ছে, মা তো মন্দিরে ঢুকবার আগেই দিদির শত বলা সত্ত্বেও পশমের জুতো খুলে ফেললেন। তারপর মন্দিরে ঢুকেই সোনার গৌরাঙ্গদেবের সামনে একপাশে দাঁড়িয়ে ভাবে বিভোর হয়ে আরতি দেখছিলেন। সে যে কী অপরূপ চোখের দৃষ্টি ও মুখের ভাব তা আমি লিখতে পারি না। যা দেখেছি তা এ জন্মে যে ভুলব না তা জানি — সে দুর্লভ জিনিষ আমার মনের মধ্যে চিরদিনের জন্য ছাপ রেখে গেছে। আমি মাকে ভাল করে দেখব বলে মার পিছন থেকে সরে গিয়ে ছেলেদের দিকে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলাম। ঠাকুর দর্শন তো সকালেই করেছি ও তখন সব খুঁটিয়ে দেখেছি। এমন মা তো আমাদের 'সচল বিগ্রহ' তাই ঠাকুরের দিকে দৃষ্টি না দিয়ে অপলকনেত্রে মাকে দেখছি। অমনি হঠাৎ মা এ দিক ওদিক চেয়ে কাকে যেন খুজলেন, তারপর যেই আমার দিকে চোখ পড়ল অমনি হাত দিয়ে ইসারা করে আমাকে তাঁর পেছনে আসতে বল্লেন। চোখের পলকের মধ্যে অবধূতজী ও হরিবাবা এসে পৌঁছালেন। মা যেন এই জন্যেই আমাকে সরিয়ে নিলেন। বাবারা যে মেয়ে দুচক্ষে দেখতে পারেন না।

সোনার গৌরাঙ্গদেবের আরতি শেষ হল। হরিবাবা টানা পাখায় কিছুক্ষণ গৌরাঙ্গদেবকে হাওয়া করলেন। যেই আরতি শেষ হল অমনি মা থামের গায়ে গাল ঘসে ঠাকুরকে আদর করে হাত দুটি মুঠো করে মাথাটি একটু কাৎ করে ধীরে ধীরে বেরিয়ে এলেন। থামের সঙ্গে যখন মা গাল ঘেঁসে দাঁড়ালেন তখন যেন ঠিক বালগোপালের মতন দেখাচ্ছিল। মার চুড়া বাঁধা থাকাতে ভাবটি আরো সুন্দর হয়েছিল।

সোনার মহাপ্রভু দেখে আমরা রাস্তায় এসে মাকে একটি রিক্সায় উঠিয়ে পেছনে পেছনে সব হাঁটতে লাগলাম। মার রিক্সার সঙ্গে সমান তালে তাল রাখতে সুবিধা হবে বলে রিক্সার পেছন ধরে আমরা ছুটতে লাগলাম। মনে হল যেন মহাপ্রভুর আবার নদীয়ায় পুনরাবির্ভাব হয়েছে। দিদিও ঐ বয়সে আমাদের সঙ্গে ছুটছেন। সে যে কী আনন্দ বলা যায় না। রাস্তার লোকেরা কেউ কেউ চ্যাঁচাচ্ছেন — "ঢাকার মা এসেছেন রে।"

এবার আমরা যে মন্দিরে গেলাম সেখানে ললিতা সখী বাস করতেন, মন্দিরে তখন আরতি হচ্ছিল। এখানেও মহাপ্রভুর ও নিত্যানন্দ প্রভুর বিরাট দ্বৈত মূর্তি। এত সুন্দর করে সাজিয়েছে পুরোহিতরা, যে বলা যায়

না। প্রত্যেকটি মালা, পাঁখা ও যেন কত পরিশ্রম ও artistically করা হয়েছে। মহাপ্রভুর হাতে ফুটন্ত গন্ধরাজ গলায় চার রকমের মালা, নিত্যানন্দ প্রভুর গায়ের রং কাঁচা হলুদের মতন ও মহাপ্রভুর একটু তামাটে, দুজনের ঘাড় অবধি কাল চুল, চোখ দুটি অপূর্ব টানা টানা। মা ও বাবাদের একদম ঠাকুরের সামনে নিয়ে যাওয়া হল আমরা চত্বর থেকে দেখলাম। বৈষ্ণবরা হরিসংকীর্তন করছে ও কাঁসর ঘন্টা বাজিয়ে প্রায় ১৫ মিনিট ধরে আরতি হল। মার সেই এক ভাব, বেরিয়ে এসে মা ললিতা সখীর ঘরের দিকে গেলেন। সখীর ঘরের পাশে এক বারান্দাতে যেখানে মা ও সখীতে রসালাপ হত সেখানে আমরা গেলাম। সকালে এই স্থান আমরা দেখিনি।

(ক্রমশঃ



"কখনো নিরাশার ভয়ঙ্কর কালো মেঘে সব দিক দিয়ে ঘিরে ফেলে। কিন্তু চিন্তা কি? ভগবানতো আছেনই। তাঁর স্মরণে সব কালো মেঘ কেটে যায়।"

— শ্রীশ্রীমা

আমার মা আনন্দময়ী
(৮)

— 'বিশুদ্ধা'

বৈষ্ণবাচার্য্য ব্রজবিদেহী সন্তদাস বাবাজীর শিষ্যা শ্রদ্ধেয়া গঙ্গাদেবী, পঞ্চতীর্থ, কন্যাপীঠের পরিচালনার ভার নিয়ে আসেন। গঙ্গাদি আসার পর থেকে তাঁর বিশেষ আহ্বানে মা প্রতি বছর ঝুলন জন্মাষ্টমীতে কাশীতে থাকতেন এবং কন্যাপীঠে মাকে নিয়ে আমরা খুব আনন্দ করতাম। ঝুলন একাদশী থেকে রাখী পূর্ণিমা পর্য্যন্ত ৫/৬ দিন আমাদের হল ঘরে বড় দোলনা নিত্য নূতন সাজে সাজিয়ে মাকে ঝোলানো হতো। প্রতিদিন সান্ধ্য কীর্ত্তন ও সৎসঙ্গ শেষ হলে মৌনের পর রাত ৯ টায় গঙ্গাদি মাকে নিয়ে এসে দোলনায় বসাতেন। মায়ের এক গুজরাটি ভক্ত সম্ভবতঃ আমেদাবাদের শ্রী কান্তিভাই মুন্‌শা মায়ের জন্য বড় দোলনাটি দেন। মাকে দোলনায় বসিয়ে মালা চন্দন দিয়ে গঙ্গাদি আরতি করতেন। কন্যাপীঠে পুরুষ প্রবেশ নিষেধ, কাজেই এই অন্তরঙ্গ লীলায় শুধু স্থানীয় মহিলা ভক্তগণ ও আমরা কন্যাপীঠের মেয়েরাই থাকতাম। মায়ের আরতির পর আমরা মেয়েরা বিভিন্ন ভক্তমাল চরিত থেকে অভিনয় করে মাকে দেখাতাম। রেণুদি, বীথুদি, পুষ্পদিরা আমাদের অভিনয় করা শেখাতেন। মায়ের নির্দ্দেশমত আমাদের কতগুলো নিয়ম ছিল — যেমন যে ভূমিকাই মঞ্চস্থ করি না কেন, পুরুষ অথবা নারী-রাজা কিম্বা ভিখারী — আমাদের পোষাকে বিশেষ পরিবর্ত্তন হতো না। আমাদের অভিনয় হতো ভাব প্রধান অর্থাৎ ভাব ও ভাষা দ্বারাই চরিত্রটি ফুটিয়ে তুলতে হতো। শুধু ছোট্ট মেয়েদের অনেক সময় কুমারী পূজায় প্রাপ্ত রঙীন ঘাগড়া বা শাড়ী পরিয়ে দেবী সাজানো অথবা আরতির নাচ ইত্যাদি করানো হতো।

এই প্রসঙ্গে মনে পড়লো — তখন কাশী আশ্রম সবে হয়েছে। মা বেশী সময় এখানেই থাকেন। সন্ধ্যাবেলা গঙ্গার ধারে হলঘরের ছাদে মা বসেন। ভক্ত সমাগম হয়। গান, কীর্ত্তন সদালোচনা হয়। মাঝে-মাঝে অভয়দা, বিভুদা প্রভৃতি ভক্তলীলা অভিনয় করে মাকে দেখান। একদিন কমলদা, কান্তিভাই ও বিভুদা গেরুয়া বস্ত্র পরে সন্ন্যাসী সেজে কিছু লীলাভিনয় করেন। অভিনয় শেষে মা বললেন — "গেরুয়া নিয়ে খেলা নয়, লীলাচ্ছলেও তোমরা যখন একবার গেরুয়া ধারণ করেছো তখন আর ছাড়া চলবে না, গায়ের চাদরখানা অন্ততঃ গেরুয়া রাখ।" এই ঘটনার আগে তাঁরা সাদা কাপড় চাদর পরতেন। অনেক পরে তাঁরা সম্পূর্ণ গেরুয়া বস্ত্র ধারণ করে ব্রহ্মচারী এবং সন্ন্যাসী হন। তখন তাঁদের নাম হয় যথাক্রমে শ্রী বিরজানন্দজী, স্বামী ভাগবতানন্দ ও শ্রী ব্রহ্মানন্দ।

কন্যাপীঠের ঝুলন উৎসবে একবার ভগবান যীশুখৃষ্টের জীবনী থেকে কিছু লীলা মঞ্চস্থ করা হয়। যতদূর মনে পড়ে বিল্লোজী যীশুখৃষ্টের চরিত্র অভিনয় করেন। যীশুখৃষ্টের ক্রুশবিদ্ধ দৃশ্যও দেখানো হয়। মেয়েরা লীলাভিনয় করছে, মা দোলনায় বসে শুয়ে দেখছেন। লীলা শেষে যখন হলের সব বাতি জ্বালানো হয় দেখা গেলো মা ভাবাবস্থায় আছেন। দাদাভাই, গঙ্গাদি মাকে ধ'রে ওঠান, দেখা যায় মার জিহ্বার মধ্যভাগে রক্ত। কোথা থেকে রক্ত এলো, দাঁতেও রক্ত নেই, তখন বোঝা গেল যীশুখৃষ্টের ক্রুশবিদ্ধ লীলা দর্শনে মায়ের তদ্‌ভাবাবস্থা! লা

মিলারেপা, শঙ্করাচার্য্য, রামানুজাচার্য্য প্রভৃতি জীবনী অবলম্বনে এবং উপনিষদ্ ভক্তমাল চরিত থেকে অনেক লীলা মঞ্চস্থ করা হয়েছে। নচিকেতা চরিত অভিনয়ের সময় মা বললেন — "উপনিষদের লীলা সকলে দেখতে পারে।" সেদিন পুরুষ দর্শকরাও দেখতে এসেছিলেন। আমাদের হল বারান্দা লোকে লোকারণ্য হয়ে গিয়েছিল। আমাকে নচিকেতার ভূমিকায় অভিনয় করতে হয়েছিল। প্রায় ২/৩ ঘন্টা ব্যাপী অভিনয়ে ও যম নচিকেতা সংবাদের অপূর্ব তত্ত্ব প্রভাবে আমার সেদিন এক অদ্ভুত অনুভূতি হয়েছিল।

গম্ভীর তত্ত্বপূর্ণ বিষয় ছাড়া হাস্যরসাত্মক কমিক ইত্যাদিও দেখানো হতো। আমি স্কুলে এমনি একটি কমিক শিখেছিলাম, সেইটি মাকে দেখাই। কমিকটি দেখে মা ও উপস্থিত সকলে খুব হেসেছিলেন এবং দাদাভাইকে মা বলে ছিলেন — "দিদি ও ভিতর বাইর সব দেখাইয়া দিল।" দাদাভাই অত্যন্ত খুশী হয়ে পরে আমাকে বললেন — "দেখছো মা কি বলছেন — তোমার ভিতর বাইর সব মা দেখে নিলেন।" অভিনয়ের মাঝে বিরতির সময় যখন পর্দ্দা ফেলা থাকতো সেই অবসরে সকলের পিছন থেকে অন্ধকারে বেরিয়ে মা পর্দ্দার আড়ালে এসে চুপি চুপি বলতেন মার মত বেশ ভারী শরীর দেখে কয়েকজনকে ডেকে আনতে। তাঁরা এলে তাঁদের মঞ্চে ধ্যান-মুদ্রায় বসিয়ে আপাদমস্তক ঢেকে দিতেন. ২/৩ জনকে এভাবে বসিয়ে পর্দ্দা উঠাতে বলতেন। মা চুপটি করে আমাদের সাজঘরে দাঁড়িয়ে মজা দেখতেন। ইতিমধ্যে মাকে দোলনায় না দেখে সবাই ভাবছে ঐ বসা মুর্ত্তি মাই হবেন। তখন মার ইসারায় দর্শকবৃন্দকে জিজ্ঞেস করা হতো — বলুন ত এঁদের মধ্যে কোন্ জন মা ? সকলে আঙুল দিয়ে একজনকে দেখালেন, তাঁর ঢাকা তুলে দেওয়া হলো, দেখা গেল তিনি মা নন, তাঁকে দেখে সবাই হাসতে লাগলেন। আর মা ভিতরে সাজঘরে দাঁড়িয়ে নিঃশব্দে হেসে যাচ্ছেন, আমরাও খুব হাসছি। আবার কখনো মা নিজেও সাদা চাদরে সারা শরীর ঢেকে যোগাসনে টান-টান হয়ে বসে যেতেন। অন্যান্যদের মা ভেবে দেখে দেখে মাকে দেখতে না পেয়ে যখন সবাই অধীর হয়ে উঠতেন সেই সময় ঢাকা খুলে হাঃ হাঃ করে অট্টহাসি হেসে মা বেরিয়ে পড়তেন। এটা মার একটা মজার লীলা ছিল।

একবার মায়ের খেয়াল হলো আমাদের বড় ছোট সকলকে নিয়ে একটি লীলা করবেন। বীথুদিকে ডেকে কি কি করতে হবে সব বুঝিয়ে দিলেন। লীলাটি হলো — মা যেন তীর্থ ভ্রমণে বেরিয়েছেন, সঙ্গে সহচরী বীথুদি। নানা স্থানে বিভিন্ন উপাসকের উপাসনা রীতি দর্শন করে উপাসক মণ্ডলীকে কিছু দান করবেন ইত্যাদি। বীথুদিকে মা বললেন — "তুমি এই শরীরকে বলবে - এই দাসী!" বীথুদি শুনে বললেন — সে কি? তোমাকে এভাবে সম্বোধন করতে পারবো না, আমায় ক্ষমা করো। তখন মা বললেন — "আচ্ছা, তাহলে শরীরের ঠাকুরমা শরীরটাকে তীর্থবাসিনী নাম দিয়েছিল, সেই নামেই ডেকো। ঠিক হলো বীথুদি মাকে 'তীর্থবাসিনী মাঈ' বলে ডাকবেন। ঝুলন উৎসব চলছে। রাতে সেদিনকার মত অনুষ্ঠানাদি শেষ হয়ে গেল। মা দোলনায় বসেই কন্যাপীঠের বড় ছোট সব মেয়েদের ও দাদাভাই, গঙ্গাদি, মৌনীমা, ক্ষমাদি, রেণুদি, সতীদি, পুষ্পদি, বুবাদি সকলকে ডেকে কাকে কি করতে হবে বুঝিয়ে দিলেন। আমি মার দোলনা ধরে পাশেই দাঁড়িয়ে আছি। মা সকলকে বলে সবার শেষে আমাকে দোলনার সামনে হাঁটু মুড়ে হাতজোড় করে বসতে বলে নিজেও দুহাত জোড় করে অর্ধনিমীলিত নেত্রে মাথা একটু উপরের দিকে করে ভাবঘন মূর্ত্তিতে কিভাবে প্রার্থনা ও অস্ফুট স্বরে রাম নাম করতে হবে তা দেখিয়ে দিলেন। সে যে কী ভঙ্গী আর ভাব! ভাষা দ্বারা ব্যক্ত করা সম্ভব নয়।

পরদিন দুপুরে মা বীথুদিকে নিয়ে আমাদের হল ঘরে এসে ডেস্ক ও পিঁড়ি পেতে জায়গা করছেন, আমরা মেয়েরা দেখতে যেতেই মা দরজা জানালা বন্ধ করে দিয়ে হেসে বললেন — "তোমরা সাজাবার সময় যেমন এ শরীরকে দেখতে দাও না, তোমরাও আগে দেখতে পাবে না।" রাতে ৯ টায় মৌন শেষ হবার পর মা হলের পিছনের ছোট্ট বারান্দায় রইলেন। মায়ের নির্দ্দেশমত বীথুদি যথাস্থানে সকলকে বসিয়ে দিলেন। মা যেমন আগের দিন শিখিয়ে দিয়েছেন — আমরা সকলেই নিজ-নিজ উপাসনার ধারা অনুসারে কেউ ধ্যান, কেউ জপ, কেউ কীর্ত্তন, কেউ প্রবচন, কেউ প্রার্থনাদিতে মগ্ন হলাম।

তারপর মা বীথুদিকে সঙ্গে নিয়ে হলে প্রবেশ করলেন। পরণে সাদা আলখাল্লা, কাঁধে সাদা ঝোলা — মায়ের ভাবই অপূর্ব্ব। এক এক মন্ডলীর সামনে দাঁড়াচ্ছেন আর হাতের ইসারায় জিজ্ঞাসা করছেন — কি নাম? কি এঁদের উপাসনা? বীথুদি সংক্ষেপে পরিচয় দিচ্ছেন। তীর্থবাসিনী মাঈ তাঁর ঝোলা থেকে প্রত্যেক মণ্ডলীকে তার উপাসনার অনুকূল উপহার — যেমন শৈবমণ্ডলী প্রধান দাদাভাইকে ডমরু, বৈষ্ণবমণ্ডলী প্রধান গঙ্গাদিকে জপের মালা, শাক্ত মণ্ডলীকে মন্দিরা, অদ্বৈতমণ্ডলী প্রধান মৌনীমাকে উপনিষদ্ ও শ্রীরামভক্ত মহাবীর রূপী আমাকে রামতাল প্রদান করলেন। আমরা এই লীলার কুশী-লবরাই দর্শক হয়ে মায়ের সেই অপূর্ব্ব ভাবঘন রূপ দর্শনে মুগ্ধ চরিতার্থ হলাম।

একদিন মা দোলনায় বসেছেন। আমাদের অভিনয় পর্ব শেষে মাকে যখন দোলনা থেকে গঙ্গাদি ওঠাতে গেছেন দেখলেন মা এত ভারী যে একা তাঁর পক্ষে তোলা সম্ভব হচ্ছে না। দাদাভাই, মৌনীমারা এগিয়ে গেলেন, কিন্তু না তাঁরাও সকলে মিলে মাকে নাড়াতে পারলেন না। মা বিশ্বম্ভর হয়ে বসে আছেন আর মিটিমিটি হাসছেন। আমরা দোলনা ঘিরে দাঁড়িয়ে মার কাণ্ড দেখছি। বেশ কয়েকবার গঙ্গাদি দাদাভাইরা চেষ্টা করে যখন মাকে ওঠাতে না পেরে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন তখন ডান হাতখানি গঙ্গাদির দিকে এগিয়ে দিয়ে মিষ্টি হেসে বললেন — "এবার তোল ত।" গঙ্গাদি হাত ধরা মাত্র যেন শোলার মত হালকা, টক্ করে উঠে পড়লেন। আর একদিন রাতে সব অনুষ্ঠান হয়ে যাবার পর আমরা দোলনার কাছে মার সামনে দাঁড়িয়ে আছি। প্রথমে মৌনীমাকে, তারপর দিদিমা, গঙ্গাদি, দাদাভাই ও একে একে আমাদের হাত ধরে ধরে দোলনায় নিজের পাশে বসিয়ে দোলালেন। ঝুলন পূর্ণিমার মধ্যরাতে মায়ের দীক্ষা লীলা স্মরণে মায়ের সামনে মহানিশা ধ্যান হতো। সেবার কাগজের জুঁই ফুল বানিয়ে দোলনার উপরে মাঝখানে চাঁদোয়া করে টানিয়েছি। ধ্যানের সময় হলের সব বাতি নিভিয়ে দেওয়া হয়েছে। মা দোলনায় আধশোয়া রয়েছেন। পূর্বদিকের জানালা দিয়ে পূর্ণিমার ভরা জ্যোৎস্না মার দোলনায় এসে পড়েছে। গঙ্গার মৃদু হাওয়ায় জুঁই ফুলের চাঁদোয়ার ঝালর দুলছে। আমি মার পায়ের দিকে বসে মাকে দেখছি। আর দেখছি মা একদৃষ্টে চাঁদোয়ার দিকে তাকিয়ে আছেন। সার্থক হলো আমার সাজানো, আনন্দে মন ভরে গেল। আমাদের সবকিছু মাকে নিয়ে। সাজানো, অভিনয় সব মা দেখলেই আমাদের মহা আনন্দ।

পরদিন রাখী পূর্ণিমায় মাকে রাখী পরানো হতো, মাও উপস্থিত সকলের হাতে রাখী বেঁধে দিতেন। প্রথম বছর বাজার থেকে রাখী কেনা হয়েছিল। কিন্তু কন্যাপীঠের তহবিলে তখন এত টাকা কোথায় যে প্রতি বছর রাখী কেনা হবে?-কাজেই রাখী আমরাই বানাতাম। প্রতি বছর মা, দিদিমা, দাদাভাই, গঙ্গাদি ও হরিবাবার জন্য পাঁচটি বিশেষ রাখী বানাতাম। তাছাড়া সকলের জন্যও বানানো হতো। সব রাখী থালায় সাজিয়ে মার সামনে রাখা হতো,

মা আমাদের পরিয়ে দিতেন। একবার মনে আছে প্রায় দুশোটি রাখী বানিয়েছিলাম। মা আমাদের হাতে তৈরী রা দেখে খুব খুশী হতেন। দোলনাটি তখন ফল ও পাতা দিয়ে সাজানো হতো। রাখী পরাবার পর মা দোলন দাঁড়িয়ে ফল ছিড়ে ছিড়ে সবাইকে ছুঁড়ে দিতেন। এভাবে শেষ হতো প্রায় সপ্তাহ ব্যাপী ঝুলন উৎসব।

ঝুলন পূর্ণিমার পর জন্মাষ্টমীর দিন আমাদের হলঘরে শ্রীকৃষ্ণের ঝাঁকী সাজানো হতো। রেণুদি, বীণু আমাদের নিয়ে কত কি সাজাতেন — বৃন্দাবন, মথুরা, যমুনা, কংসের কারাগার। মা খুব খুঁটিয়ে দেখতেন অ খুশী হতেন। রাত ১২ টায় শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব সময়ে আমাদের ঠাকুরঘরে মাকে সিংহাসনে বসিয়ে আমরা সব পুজো করতাম। গোপাল আসার পর থেকে রাতে গোপালের অভিষেক ও ষোড়শোপচারে পুজো হত। একব মা বললেন — কন্যাপীঠের সামনের উঠানে, বাগানে ও যজ্ঞশালা ঘিরে ঝাঁকী সাজাতে। মা-ই বলে দিলেন কদি আগে টিন কেটে লম্বা পাত করে তার ওপর মাটি বিছিয়ে যব ছড়িয়ে দিতে। কদিন বাদে ছোট ছোট যব-চারা উ বেশ শস্যক্ষেতের মত দেখতে হলো। সেই গুলো মাঝে মাঝে দিয়ে কৃত্রিম নদীর পাড়ে গাছ, বাড়ী, পুতুল ও গ ইত্যাদি সাজিয়ে অপূর্ব্ব ঝাঁকী হলো, ঝাঁকীতে আমাদের বৃন্দাবন আশ্রম, তার দোতলার বারান্দায় মা বসে আছে সাজানো হয়েছে দেখে মা ও সকলে বিশেষ খুশী হলেন। জন্মাষ্টমীর পরদিন যথারীতি নন্দোৎসব হতো। আমাদে হলঘরে আমরা ২/১ টি মেয়ে মাথায় ফেট্টি বেঁধে কাঁধে বাঁক নিয়ে গোপবালক সেজে মাকে ঘিরে নাচতাম একবার নন্দোৎসবের দিন মা কি করলেন — মুক্তি নামের এক মজুরনীকে তার কচি বাচ্চাকে নিয়ে হলে বারান্দায় দাঁড়াতে বললেন। আমাদের বললেন — গোপবালক সেজে নন্দগ্রামের দিকে যেতে, নন্দবাবার ঘ শিশুর জন্ম হয়েছে চলো দেখে আসি। ওদিকে মা বুনিদিকে দিয়ে মুক্তি মজুরনীকে আগেই বলে দিয়েছেন কোলে শিশুটি যদি না কাঁদে একটু চিমটী দিয়ে কাঁদাতে। যেই বাচ্চার কান্নার শব্দ শুনেছি মার শেখানো মত আমি ব উঠলাম — ঐ শোনো নন্দবাবার লালা কাঁদছে। চলো চলো বধাই জানিয়ে আসি। তারপর আমাদের শ্রীকৃষ্ণ মধ্যমনি মাকে ঘিরে শুরু হলো — "ব্রহ্মা নাচে, শিব নাচে, আর নাচে ইন্দ্র, গোকুলে গোয়ালা নাচে পাই গোবিন্দ" — গেয়ে আনন্দ নৃত্য। মাও আনন্দ-ঘন মূর্ত্তিতে আমাদের সঙ্গে হাত তুলে কখনো আমাদের ঘাড়ে হা দিয়ে নেচে আনন্দোৎসবে মত্ত হতেন। ততক্ষণে বাঁক থেকে দৈ নিয়ে মার মুখে দেওয়া হলো মাও শুরু করলে আমাদের দৈ খাওয়াতে। এই নন্দোৎসব চলতো সকাল থেকে দুপুর পর্য্যন্ত। মার ও আমাদের দৈ মাখামাখি শেষে স্নানান্তে মার মধ্যাহ্ন ভোগ হ'তো। মহা আনন্দের ছোঁয়ায় আমরাও আনন্দ সাগরে ভাসতাম।

(ক্রমশঃ)



গান

—অতসী রায়

মা বলে প্রাণে ডাকো না,
মা বলে কেন কাঁদ না,
মা নামে জেগে ওঠো না,
মুছে যাক সব ভাবনা।

মাকে সদা রেখে সাথে,
মার নামে নামো পথে,
মার কাজে ওঠো মেতে,
কি মধু মার নামেতে।

মার হাতে দিয়ে ভার,
মার নাম করো সার,
মা যে তোমার আমার,
হৃদয়ে আছে সবাকার।

মা সর্বোপরি আপন,
মা আমাদের জীবন,
মাই পরম রতন,
তাই চাইনে অন্য ধন।

মা, মা, মা, জয় জয় মা।
জয় মা, শ্রী মা, জয় গুরু, জয় মা।



আশ্রম-সংবাদ

কনখল — দেবতাত্মা হিমালয়ের পাদদেশে অবস্থিত সুরম্য কনখলতীর্থে দেবনদী জাহ্নবী তীরে সচ্চিদানন্দময়ী শ্রীশ্রীমায়ের চিন্ময়ধাম এই আনন্দজ্যোতি পীঠম। যেখানে মাতৃভক্তদের সাধুসন্ত মহন্ত সুধীগণের দর্শনার্থীদের আসা যাওয়া দেখা যায় বর্ষ ভরে। যেখানে বারো মাসে তেরো পার্বণ শুধু কথার কথাই নয়, উৎসবের চরিতার্থতা, সার্থকতা ফলীভূত হতে দেখা যায় এখানে, সেই চরম পরমকে পাওয়ার উদ্দেশ্যে।

শ্রীশ্রী আনন্দময়ী সংঘ দ্বারা অনুষ্ঠিত বিভিন্ন উৎসবের মধ্যে "সংযম সপ্তাহ মহাব্রত" অন্যতম। প্রতি বছরের মত এবারেও ৪ঠা নভেম্বর হতে ১০ই নভেম্বর অনুষ্ঠিত হয় সংযম সপ্তাহ মহাব্রত।

পূর্বদিন ৩রা নভেম্বর সন্ধ্যাবেলা সংযম সপ্তাহের উদ্‌বোধন সমারোহে উপস্থিত ছিলেন কৈলাসপীঠাধীশ্বর পূজনীয় স্বামী বিদ্যানন্দজী মহারাজ, দিব্য জীবন সংঘের অধ্যক্ষ পূজ্যপাদ স্বামী চিদানন্দ সরস্বতীজী, নির্ব্বাণী আখাড়ার প্রাক্তন মহন্ত স্বামী গিরিধর নারায়ণ পুরীজী ও গরীবদাসজী আখাড়ার অধ্যক্ষ স্বামী শ্যামসুন্দর দাসজী।

সর্বপ্রথম শ্রীশ্রী আনন্দময়ী সংঘের স্বর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষ্যে ৫১টি প্রদীপ প্রজ্বলিত করেন স্বামী বিদ্যানন্দজী। সেই শুভক্ষণে শ্রী ভজনানন্দজীর (পুষ্পদির) মন্ত্র গম্ভীর স্বরে 'অন্তর্জ্যোতি বহির্জ্যোতিঃ প্রাক্ত্যজ্যোতিঃ পরাৎপরা। জ্যোতি র্জ্যোতিঃ স্বয়ং জ্যোতি আত্মজ্যোতির্নমোহস্তুতে।' এই প্রণাম মন্ত্রের সঙ্গে "এ জ্যোতি রূপ জ্বালাও মা, তেরী জ্যোতি সবসে নিরালী হ্যায়..."। এই হিন্দী ভজনটি কালোপযোগী ভাব লহরী সৃষ্টি করে সকলকে মাতৃভাবে ভাবিত করে তোলে।

এরপর ব্রহ্মচারিণী চন্দন শ্রীশ্রী আনন্দময়ী সংঘের দীর্ঘ পঞ্চাশ বছরের ইতিহাস, উদ্দেশ্য ও কর্মের বিভিন্ন দিকগুলির রূপায়ণের কথা সাবলীলভাবে সকলকে শোনান। মহাত্মাদের মায়ের চরণে শ্রদ্ধার্পণ ও ব্রতীদের প্রতি আশীর্বচনের দ্বারা উদ্‌ঘাটন সমারোহের সমাপ্তি ঘটে।

এবারের সংযমের যথারীতি সর্বাধিক আকর্ষণীয় বিষয় ছিল রাত্রিবেলা পূজনীয় স্বামী চিদানন্দজীর বিদগ্ধতাপূর্ণ ও সর্বকালের মানবের জীবনে অনুশীলন যোগ্য অনবদ্য প্রবচন। গীতা মন্দিরের মহামণ্ডলেশ্বর স্বামী মঙ্গলানন্দগিরীজীর এবং ভারতমাতা মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা স্বামী সত্যমিত্রানন্দজীর সুমধুর প্রবচন শ্রবণে সকলে মুগ্ধ হন। মহামণ্ডলেশ্বর জ্যোতির্ময়ানন্দজীও খুব সুন্দর বলেন। সুধীপ্রবর ডঃ গোবিন্দগোপাল মুখোপাধ্যায় তাঁর পিতা বাংলার শুক্ল সন্ন্যাসী দার্শনিকপ্রবর শ্রীপ্রাণগোপাল মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের মায়ের সঙ্গে কত গভীর আত্মিক সম্বন্ধ ছিল, মায়ের প্রথম দর্শন ও ভক্তাগ্রগণ্য ভীষ্ম পিতামহের মত কিরূপে তিনি মহানির্ব্বাণের সন্ধিক্ষণে মায়ের দর্শন, স্পর্শ এবং কৃপা লাভ করেন সেই সমস্ত অমূল্য কথা তিনি প্রাণস্পর্শী ভাষায় সকলকে শোনা তেন।

প্রতিবারের মত সকালে গীতাচণ্ডী পাঠের পর স্বামী বিদ্যানন্দজীর বৃহদারণ্যক উপনিষদের পাণ্ডিত্যপূর্ণ ব্যাখ্যা ও বিকালে সুরতগিরি বাংলার মহামণ্ডলেশ্বর স্বামী ব্রহ্মানন্দজীর বিষ্ণুপুরাণের উপর সারগর্ভিত প্রবচন হত। রাত্রিবেলা যথারীতি মাতৃপ্রসঙ্গ হত।

সংযম সপ্তাহের অন্তিম দিবসে রাত্রিতে বিদ্যাপীঠের ছোট ছোট ব্রহ্মচারীরা উল্লসিত চিত্তে বিভিন্ন কার্য্যক্রমের প্রদর্শন করে। শ্রীশ্রী আনন্দময়ী সংঘের অধ্যক্ষ শ্রী গোবিন্দ নারায়ণজী একদিন কন্যাপীঠের কন্যাদের মধুর মধুর

মাতৃস্মৃতি-কথা ব্যক্তিগতভাবে শ্রবণ করিয়ে আনন্দ দেন।

এবারেও 'শুভ স্বর্ণজয়ন্তী সংযম সপ্তাহ মহাব্রত' নামে একটি স্মৃতিগ্রন্থ প্রকাশিত হয় ও তা সকল ব্রতীদের বিতরণ করা হয়। এবারে ব্রতীর সংখ্যা অন্যান্য বার হতে বেশী ছিল।

সংযম সপ্তাহের অন্তিম দিবসে স্বামী বিদ্যানন্দজী এই কথা সকলকে স্মরণ করিয়ে দেন যে আজ ১০ই নভেম্বর পুণ্যতীর্থ হরিদ্বার নবীন রাজ্য উত্তরাঞ্চলে সমাবিষ্ট হল। এবারের এই সংযম সপ্তাহ মহাব্রতের আরম্ভ উত্তরপ্রদেশে এবং সমাপন উত্তরাঞ্চলে। সুতরাং এবারের এই সংযম সপ্তাহ মহাব্রতের একটি বৈশিষ্ট্য রইল সংযম সপ্তাহের ইতিহাসে। মহানিশার ধ্যান, হোমের পূর্ণাহুতি এবং সাধুভাণ্ডারা যথারীতি সম্পন্ন হল। ১১ ই নভেম্বর নাম যজ্ঞের অধিবাস ও পরদিন মহন্ত বিদায়ের সময় ছবিদির প্রাণ মাতানো কীর্তনে সকলে ভাবে বিভোর হয়ে ওঠেন।

অবশেষে সংযম সপ্তাহ মহাব্রতের সমাপনে ধ্বনিত হল স্বামী ভজনানন্দজীর কণ্ঠে শ্রী শৈলেশব্রহ্মচারী দ্বারা রচিত এই সংযম গীতি

"গাহি জয় গাহি জয়
দীর্ঘ - অর্দ্ধ - শতাব্দী ধরে দোলে মালা অক্ষয়।
- -
গাহি মায়ের জয় গাহি মহাব্রতের জয়
গাহি নির্ভীক ব্রতীর জয়।।"

বারাণসী — কাশী আশ্রমে শারদীয়া নবরাত্রিতে ভক্তদের আগ্রহে ঘটস্থাপন করে প্রতিবছর দেবী পূজা ও চণ্ডীপাঠ হয়ে থাকে। এবারেও স্মৃতি মন্দিরে ২৮ শে সেপ্টে স্বর হতে ঘটস্থাপন করে পূজা ও চণ্ডীপাঠ আরম্ভ হয়। সপ্তমী, অষ্টমী ও নবমী তিথিতে আনন্দজ্যোতি মন্দিরে শ্রীশ্রী মায়ের ষোড়শোপচারে পূজা সুসম্পন্ন হয়। পূজার সময় যথারীতি চণ্ডী পাঠ, কীর্তন ও পুষ্পাঞ্জলি ইত্যাদি অনুষ্ঠিত হয়। ব্রহ্মচারিণী জয়া ভট্টাচার্য্য প্রতি বছরের মত শ্রীশ্রীমায়ের পূজা করেন। নবমীর দিন নয়জন কুমারীকে যথাবিধি ভোজন করানো হয়।

৮ই অক্টোবর বিজয়া দশমীর দিন বিকাল সাড়ে ৫টায় আশ্রমের বয়োবৃদ্ধ সন্ন্যাসিনী প্রব্রাজিকা শান্তানন্দ গিরিজী মাতা আনন্দময়ী হাসপাতালে চিরতরে মাতৃক্রোড়ে শায়িতা হন। তাঁর পার্থিব শরীর ৯ই অক্টোবর সোমবার একাদশীর দিন সন্ন্যাসের বিধি অনুসারে গঙ্গায় প্রবাহিত করা হয়। এই সময়ে নিব্বাণী আখাড়ার সন্ন্যাসীগণ, আশ্রমের সেবকবৃন্দ এবং শান্তানন্দজীর পূর্বাশ্রমের ভ্রাতুষ্পুত্র প্রভৃতি উপস্থিত ছিলেন।

২৩ শে অক্টোবর ষোড়শীর দিন শান্তানন্দজীর মহাপ্রয়াণ উপলক্ষ্যে ষোড়শী ভাণ্ডারা আয়োজিত হয়। এই উপলক্ষ্যে ১৬ জন সাধুকে যথাবিধি সৎকার সহ ভোজন করানো হয়। সন্ন্যাসীদের শ্রাদ্ধের বিধান নেই। কারণ তাঁরা সন্ন্যাস গ্রহণের পূর্বে নিজেদের শ্রাদ্ধ নিজেরাই করে নেন। তাই ১৬ দিনের দিন ১৬ জন মহাত্মাকে ১৬ প্রকারের নানাবিধ বস্তু দ্বারা আপ্যায়িত করে ভোজন করানো হয়। তাই এই রূপে সাধু ভোজনকে ষোড়শী ভাণ্ডারা বলা হয়।

২৬ শে অক্টোবর দীপান্বিতা উৎসব উপলক্ষ্যে দীপালোকে চতুর্দিক আলোকিত হয়ে ওঠে। এবছর

আংশিকভাবে জীর্ণ শ্রীশ্রী অন্নপূর্ণা মন্দির, ভাণ্ডার ঘর, রান্না ঘর প্রভৃতিকে মেরামত করে নতুন করে গড়ে তোলা হয়। সুদক্ষ ইঞ্জিনীয়ারদের এইরূপই নির্দেশ ছিল। এভাবে মন্দিরের জীর্ণোদ্ধারের পর নবীন আলোকসজ্জায় আলোকিত মন্দিরের শোভা শতগুণে বর্দ্ধিত হয়।

১৯৫০ সনে দীপান্বিতার শুভ রজনীতে এই মন্দিরে প্রথম শ্রীশ্রী কালীপূজা ও অন্নকূট সুসম্পন্ন হয়েছিল। সেই হতে আজ সুদীর্ঘ পঞ্চাশ বছর ধরে এই মন্দিরে অখণ্ডভাবে শ্রীশ্রী অন্নপূর্ণা, মা কালী, নারায়ণ এবং শিব প্রভৃতির পূজা আরাধনা ভোগ ও প্রতিবছর বিশেষভাবে অন্নকূট উৎসব অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে।

২৮ শে অক্টোবর প্রতিবছরের মত এবারেও অন্নকূট মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। মন্দিরের নবীন রূপায়ণে সকলেই আনন্দিত। ধূপদীপ সুরভিত আলোকিত মন্দিরে সওয়া মণ অন্ন ও তদনুপাতে নানাবিধ ব্যঞ্জন ইত্যাদি সুসজ্জিত প্রায় ১৫৬ প্রকারের বিভিন্ন ভোগের সম্ভার দর্শনে সকলেই পুলকিত। সম্পূর্ণ ভোগ দেশী শুদ্ধ ঘৃতদ্বারা বানান হয় এবং রন্ধন কার্য্যে থাকেন ব্রহ্মচারিণী ব্রাহ্মণ কন্যারা।

আজ পঞ্চাশ বছর ধরে এই নিয়ম সমভাবে চলে আসছে, যা শ্রীশ্রী মায়ের অহৈতুকী কৃপার একটি জ্বলন্ত নিদর্শন।

বিন্ধ্যাচল — বিন্ধ্যাচল আশ্রমে এই সহস্রাব্দীর প্রথম নবরাত্রি অতি উল্লসিত চিত্তে আয়োজিত হয়। শ্রী নবব্রত ব্রহ্মচারীজী প্রায় মাসাধিক কাল এই আশ্রমে বাস করেন। তিনি এখানে একান্ত বাসে ছিলেন। কিন্তু ভক্তদের আগ্রহে সপ্তাহে দুই দিন রবিবার ও বুধবার সৎসঙ্গের জন্য তিনি সম্মত হন। তাঁর মধুর প্রবচন শ্রবণ করে সকলে আনন্দিত হন। প্রচুর ভক্ত সমাগম হত। ব্রহ্মচারীজী ভক্তদের আহ্বানে ভক্তগৃহেও পদার্পন করে শ্রীভগবানের গুণগান শ্রবণ করিয়ে সকলকে মুগ্ধ করেন। সৎসঙ্গের আয়োজনে শ্রীতপন ব্রহ্মচারীজীর উদ্যোগ অবশ্যই প্রশংসনীয়।

আগরতলা — সুরম্য সরোবরতীরে অবস্থিত শ্রীশ্রী উমা-মহেশ্বরের সুবৃহৎ রমণীয় মন্দির, বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণ এবং মাতৃআবাসে জ্ঞান প্রদায়িনী মা সরস্বতীর মন্দির সম্বলিত মায়ের এই আশ্রম দর্শনার্থীদের একান্ত দর্শনীয় স্থল। অদূরে সরোবরের অপর তীরে শ্রীশ্রী গৌড়ীয় মঠ, শ্রীশ্রী জগন্নাথ মন্দির ও বিরাট রাজপ্রাসাদ সহজেই পারিপার্শ্বিক পরিবেশকে সুন্দর করে তোলে। চতুর্দিকের দৃশ্য অতি চমৎকার।

সারাবছরই নানাবিধ জনহিতকারী কার্য্যে ব্যপৃত থাকে উৎসব মুখরিত মায়ের এই আশ্রম।

মাতৃভক্তগণের সহযোগিতায় আশ্রমে একটি নূতন দ্বিতল ভবন নির্মাণ কাজ আরম্ভ হয়েছে গত জুন মাস হতে। তিনটি কক্ষ ইতিমধ্যেই নির্মিত হয়েছে। প্রথমটি আশ্রমের অফিস ঘর, দ্বিতীয়টি পুস্তকালয়, তৃতীয়টি হোমিওপ্যাথিক দাতব্য চিকিৎসালয় রূপে ব্যবহৃত হবে নিদ্ধারিত হয়েছে।

গত ১০ ই ফেব্রুয়ারী, ২০০০ শ্রীশ্রী সরস্বতী পূজা মহাসমারোহে সরস্বতী মন্দিরে অনুষ্ঠিত হয়।

১৯৮২ সনে মায়ের আগরতলা আগমনের শুভক্ষণে শ্রীশ্রীমায়ের নিজ খেয়ালে মাতৃনির্দেশে মায়ের পূত সান্নিধ্যে এই সরস্বতী মূর্তি মায়ের ঘরে প্রতিষ্ঠিত হন। সেই হতে মায়ের ঘরই সরস্বতী মন্দির রূপে রূপায়িত হয়।

এ বছর ব্রহ্মচারী নির্ব্বাণানন্দজী সরস্বতী পূজার সময় উপস্থিত ছিলেন, তাই তিনি স্বয়ং সরস্বতী পূজা করেন। পূজার পর ভোগ ও মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

গত ৪ঠা মার্চ মহাশিবরাত্রি পূজা অনুষ্ঠিত হয়। ব্রহ্মচারী নির্ব্বাণানন্দজীর উপস্থিতিতে আশ্রমের নাট মন্দিরে সুষ্ঠুভাবে পূজা অনুষ্ঠিত হয়।

২১ শে ও ২২ শে মে শ্রীশ্রী মায়ের জন্মতিথিপূজা সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হয়। এই উপলক্ষ্যে সৎসঙ্গ ভক্তিগীতি আয়োজিত হয়। ২২ শে মে নাটমন্দিরে উদয়াস্ত নাম কীর্তন হয়। প্রায় ৩০০০ ভক্তদের প্রসাদ বিতরণ করা হয় ও ২০০ প্রণামী শাড়ী দরিদ্রদের বিতরণ করা হয়।

গুরুপূর্ণিমার পূণ্যতিথিতে গত ১৬ ই জুলাই শ্রীশ্রীমায়ের মহাপূজা অনুষ্ঠিত হয়। এদিন প্রায় ৫০০ ভক্ত প্রসাদ গ্রহণ করেন।

৪ঠা অক্টোবর হতে ১০ ই অক্টোবর শারদীয়া দুর্গাপূজা উপলক্ষ্যে মন্দিরে ঘট স্থাপন করে ঘটপূজা করা হয়। অষ্টমীর দিন প্রায় ৬০০ ভক্ত প্রসাদ গ্রহণ করেন।

গত ২৬ শে অক্টোবর উমামহেশ্বরের মন্দিরে শ্রীশ্রীকালীপূজা অনুষ্ঠিত হয়। নানা রঙের আলোয় আলোকিত আশ্রমের শোভা সেদিন দর্শনীয় হয়েছিল। সেদিন প্রায় ২০০০ ভক্তদের প্রসাদ বিতরণ করা হয়।

আগরতলার ভক্তগণের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় আশ্রমের পার্শ্ববর্তী ত্রিপুরা নরেশ প্রদত্ত এক ভূমিখণ্ডে নবনির্মিত ভবনে 'মা আনন্দময়ী বিদ্যালয়' নামে একটি নবীন সংস্থার উদ্‌ঘাটন হয়েছে। বর্তমানে প্রায় ৫০টি অতি অল্প বয়স্ক বালক বালিকারা সেখানে শিক্ষা লাভ করছে। শ্রীশ্রীমায়ের কৃপায় ভবিষ্যতে এই বিদ্যালয়টি এক বিশিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের রূপ ধারণ করবে আশা করা যায়।



শ্রদ্ধাঞ্জলি

প্রব্রাজিকা শান্তানন্দজী

শ্রীশ্রী মায়ের আশ্রমের সাধু সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারিণী সন্ন্যাসিনীদের সুদীর্ঘ পরম্পরা শ্রীশ্রী আনন্দময়ী সংঘের ইতিহাসে এক অতি উজ্জ্বলতম অধ্যায়। সকলেরই একান্ত আশ্রয়স্থল হল শ্রীশ্রীমায়ের স্নেহসুশীতল চরণতল। আজ তাদের মধ্যে কেউ আশী পার করেছেন কেউ বা আশীর নিকটে আর কেউ সত্তরের ঊর্দ্ধে। এদের সকলেরই লক্ষ্য হল **"মার কাছে যাওয়া"** আর মন্ত্র হল **"আমরা মায়ের জন।"**

শ্রীশ্রী মায়ের এই সন্তানগণের পরিচয় পাওয়া বা জীবনগাথা শোনা হল অত্যন্ত দূরূহ কাজ। এঁরা কবে মার কাছে এলেন এবং কিরূপে আজ এই আয়ুর সীমা পার করেছেন — হয়তো তাঁরা নিজেরাই বলতে পারবেন না। "আপনি কবে মার কাছে এসেছিলেন?" এই প্রশ্নের উত্তরে হয়তো তাঁরা কিছু ভেবে বলবেন, "১৫-১৬ বৎসর বয়সে" অথবা কেউ বলবেন "১৯-২০ বৎসর বয়সে।" "কেমন করে মার কাছে এলেন?" এই প্রশ্নের উত্তরে অনেকেই বলবেন — "মা বাবা শুনেছিলেন এক মাতাজীর কথা। তাঁরা দর্শনে এলেন। সঙ্গে আমাদেরও নিয়ে এলেন।" তারপর প্রশ্ন হবে "আপনি কেমন করে থেকে গেলেন?" এর উত্তর একটিই "ঘরে গিয়ে ভাল লাগত না। কখন মার কাছে আসব - শুধু মনে প্রাণে জেগে থাকত। একই চিন্তা।" মায়ের দুর্নিবার আকর্ষণে কত কিশোর কিশোরী যে ঘর ছাড়া হয়েছেন তাঁদের ইতিহাস কে রাখে? এইভাবে নির্মিত হয়েছে শ্রীশ্রী মায়ের বিরাট দরবার।

তিরিশের দশকের উত্তরার্দ্ধে শ্রদ্ধেয় ভাইজী ও বাবা ভোলানাথের ইহলীলা সমাপনের পর মহিলাশ্রম নামে শ্রীশ্রী মা আনন্দময়ী কন্যাপীঠ এবং সমকালের বিদ্যাপীঠেরও সূচনা হয়। সমস্ত কার্য্যভার ন্যস্ত ছিল গুরুপ্রিয়া দিদির উপর। এর কিছু পূর্বে মায়ের গঙ্গোত্রী যাত্রার সময় স্বামী পরমানন্দজী মাতৃচরণ প্রান্তে এসে উপনীত হন। স্বামীজী পূর্ববঙ্গের ছিলেন। স্বামীজীর গ্রামে "ব্রহ্মজ্ঞ মা" নামে এক সাধিকা বিশেষ খ্যাতি লাভ করেন। তাঁর চরণে বহু নবযুবক এসে মিলিত হন। পূজনীয় স্বামীজীর আত্মীয় পরিজন ও পরিচিত জনও ব্রহ্মজ্ঞ মায়ের শিষ্য পরম্পরার অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। রামকৃষ্ণ মিশনের সঙ্গেও তাঁদের সম্বন্ধ ছিল। পূজনীয় স্বামী পরমানন্দজীর আগমনের পর ব্রহ্মজ্ঞ মায়ের শিষ্য এবং দেওঘর বিদ্যাপীঠে অধ্যাপনায় রত স্বামী শাশ্বতানন্দজীও মায়ের চরণ প্রান্তে এসে উপনীত হন। কন্যাপীঠ ও বিদ্যাপীঠের জন্য সুযোগ্য অভিভাবকের প্রয়োজন ছিল। তাই গুরুপ্রিয়াদিদি আনন্দিত হলেন শাশ্বতানন্দজীর আগমনে। তিনি স্বামীজীকে বললেন, "দেখুন দেখি এই পরিবেশের অনুকূল ছোট ছেলে মেয়ে পাওয়া যায় কিনা?" স্বামীজী বললেন, "দেখছি।" স্বামী শাশ্বতানন্দজী পূর্ববঙ্গের কুমিল্লা জেলার স্বীয় গ্রাম 'বিতারা'তে এলেন। শৈশব হতে সাধু মহাত্মাদের সৎসঙ্গ লাভের ফলে 'চক্রবর্ত্তি' এই ব্রাহ্মণ পরিবারের বালক বালিকারা পূর্ব হতেই এই ভাবে ভাবান্বিত ছিলেন। তাদের কাছে কন্যাপীঠ ও বিদ্যাপীঠের কথা বলায় তারা মহানন্দে মায়ের কাছে আসার জন্য প্রস্তুত হল। তাদের কারুর শাশ্বতানন্দজী মামা হতেন কারুর বা কাকা। এইরূপে স্বামীজীর কার্য্য সিদ্ধ হল। অনায়াসেই কন্যাপীঠ ও বিদ্যাপীঠের জন্য বালক বালিকা লাভ হল। এই প্রকারে শাশ্বতানন্দজীর জ্যেষ্ঠ ভগিনীর পুত্র কন্যা বিভুদা ও বিন্দুদি এবং ভাই এর পুত্র কন্যা সদানন্দদা ও গঙ্গাদি এবং তাঁর ভগিনীদ্বয় (কিছু পরে) বিদ্যাপীঠ ও কন্যাপীঠে এলেন।

আমাদের শ্রদ্ধাঞ্জলির মুখ্য পাত্রী হলেন বিন্দুদি - সন্ন্যাসিনী প্রব্রাজিকা শান্তানন্দজী। মাতা আনন্দময়ী হাসপাতালে বিজয়া দশমীর পুণ্যতিথিতে গত ৮ই অক্টোবর যিনি মাতৃচরণে লীন হয়েছেন।

১৪-১৫ বছরের কিশোরী বিন্দুদি মাতৃ সান্নিধ্যে আসেন। শ্রীশ্রীমায়ের সেবা ও আশ্রমের ভোগ রন্ধন আদি কাজে তিনি পূর্ণরূপে আত্মনিয়োগ করেন। কন্যাপীঠ কাশীতে আসার পর বিন্দুদিও কন্যাপীঠে স্থায়ীভাবে থেকে কন্যাপীঠের সেবা করেছেন। সাবিত্রী যজ্ঞের সময় তিনি অক্লান্ত পরিশ্রম করেন।

এরপর শরীর অসুস্থ হওয়ায় তিনি দমদমে নিজের মাতাপিতার কাছে কিছু কালের জন্য চলে যান। বিন্দুদি ব্রহ্মচারিনীর বেশেই ছিলেন।

বিন্দুদি অতি বিনয়ী, শান্ত প্রকৃতির ও সেবাপরায়ণা ছিলেন। সেবাই তাঁর ধর্ম ছিল। অসুবিধার সময় সকলেই তাঁকে কাছে পেতেন। তাঁর মামা শাশ্বতানন্দজীর অসুস্থতায় মাতৃনির্দেশে তিনি কাশী আশ্রমে থেকে প্রায় ৭ বছর স্বামীজীর সেবা করেন। স্বামীজীর ব্রহ্মলীনের পর তিনি স্থায়ীভাবে কনখলে বাস করেন। বিন্দুদি অত্যন্ত সৎসঙ্গ প্রেমী ছিলেন। কিন্তু উৎসবের ধূমধামের মধ্যেও তাঁকে কখনো নীরবে রান্নাঘরে সেবার কাজ করতে দেখা যেত।

শ্রীশ্রী মায়ের অব্যক্ত ধামে গমনের পর তিনি নির্ব্বাণী আখাড়ার মহন্তজীর কাছ হতে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন ও অতি শান্তিপ্রিয় বিন্দুদির নাম 'শান্তানন্দ' হয়। কনখলে তিনি প্রতিদিন আনন্দ জ্যোতি পীঠমে মায়ের সমাধিতে অতি প্রত্যুষে গিয়ে ফুল দিয়ে মন্দিরের বেদী সাজাতেন।

কিছুদিন ধরে তিনি বিশেষ অসুস্থ হয়ে পড়েন। বৃন্দাবন আশ্রমে তিনি কিছু মাস ছিলেন। তারপর তিনি কনখল হয়ে গুরুপূর্ণিমাতে কাশী আসেন। এখানে তিনি গুরুতরভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েন। ১০ই সেপ্টেম্বর তাঁকে হাসপাতালে ভর্ত্তি করা হয়। মাতৃকৃপায় দূরারোগ্য ব্যাধির অসহ্য বেদনার বোধ তাঁর ছিল না। তিনি সর্বদা শান্তভাবেই শুয়ে থাকতেন। মুখে হাসি লেগেই থাকত। মায়ের কথা বলতেন ও মায়ের মধুর স্মৃতিচারণ করতেন মনে মনে।

বিজয়া দশমীর দিন প্রতিমা বিসর্জনের সময় গোধূলি লগ্নে প্রব্রাজিকা শান্তানন্দজীর মহাপ্রয়াণ হয়। সাবিত্রী যজ্ঞের ভস্ম ও মালায় বিভূষিত তাঁর দেহ পরদিন গঙ্গা প্রবাহে প্রবাহিত করা হয়।

চিরশান্তিপ্রিয় শান্তানন্দজী শান্তিময় পরিবেশে চির শান্তি লাভ করলেন। বিন্দুর ক্ষণভঙ্গুর জীবনবিন্দু শ্রীশ্রীমায়ের অহৈতুকী কৃপাসিন্ধুতে চিরতরে লীন হল।

তাঁর মহাপ্রয়াণে আশ্রমবাসিনীদের মধ্যে যে স্থান রিক্ত হল তা কখনো পূরণ হবার নয়। তাঁর অমর আত্মার চিরশান্তি কামনা করে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করছি।



শোক সংবাদ

শ্রী বিষ্ণুরাম পাণ্ড্যা — গত ১লা এপ্রিল, ২০০০ শ্রীশ্রীমায়ের অতি পুরাতন ভক্ত শ্রী বিষ্ণু পাণ্ড্যা এলাহাবাদে স্বীয় বাসভবনে সজ্ঞানে মাতৃচরণে লীন হয়েছেন।

১৯৪৪ সন হতে তিনি মায়ের সঙ্গে নানা জায়গায় ঘুরেছেন। মাতৃনির্দেশে তিনি কাশীতে মায়ের হাসপাতালে বহুবছর সেবা করেন। বিকালে তাঁর দৈনন্দিন কাজ ছিল আশ্রমে অন্নপূর্ণা মন্দিরের সামনে বসে সুদীর্ঘ সময় জপ করা। মা অন্নপূর্ণার প্রসাদী মালা কণ্ঠে ধারণ করে তিনি অত্যন্ত আনন্দিত হতেন।

তাই তাঁর অন্তিমকালে আকস্মিক ভাবেই কন্যাপীঠের ব্রহ্মচারিণীরা মা অন্নপূর্ণার প্রসাদী মালা সহ এলাহাবাদে পৌঁছে যায়। বহুক্ষণ মেয়েরা কীর্তন করে। আমরা তাঁর আত্মার শান্তি ও পরিবারবর্গের সান্ত্বনা কামনা করি শ্রীশ্রী মায়ের চরণে।

যথা সময়ে বিষ্ণু পাণ্ড্যার পরলোক গমনের সংবাদ পত্রিকায় প্রকাশ করা হয় নাই সেজন্য আমরা বিশেষ দুঃখিত।

শ্রী সুপ্রভাতচন্দ্র লাহিড়ী — মাতৃ আশ্রিত মমতাদির স্বামী শ্রী সুপ্রভাতচন্দ্র লাহিড়ী কলকাতার উপকণ্ঠে রাজপুরস্থ বাসভবনে গত ১ লা সেপ্টেম্বর, ২০০০ সনে ৭৩ বৎসর বয়সে ইহধাম ত্যাগ করেন। তিনি বালিগঞ্জের মাতৃভক্ত শ্রী তরুণ গোস্বামীর ভগ্নীপতি। আমরা তাঁর স্বর্গত আত্মার শান্তি ও ঊর্দ্ধ গতি প্রার্থনা করি। শোকসন্তপ্ত সহধর্মিণী ও পুত্র কন্যাদের ও স্বজনদের সমবেদনা জানাই। শ্রীশ্রী মা তাঁদের শান্তি দিন এই প্রার্থনা।

শ্রীবলরাম রায় (ভাগ্যকূল) — শ্রীশ্রী মায়ের আশ্রিত সন্তান শ্রীমতী পদ্মা কুণ্ডুর পিতৃদেব এবং ঢাকা ভাগ্যকূল নিবাসী স্বনামধন্য দেশহিতৈষী দানবীর ধার্মিক পুরুষ ৺কুমার প্রমথ নাথ রায়ের সুযোগ্য পুত্র শ্রী বলরাম রায় ৮৮ বৎসর বয়সে সজ্ঞানে তাঁর গোলপার্কস্থ বাসভবনে গত ২রা সেপ্টেম্বর শ্রীশ্রী লক্ষ্মীনারায়ণ ঠাকুরের শ্রীচরণে ব্রহ্মলীন হয়েছেন।

তাঁর অগ্রজ এবং শ্রীশ্রী মায়ের একনিষ্ঠ ভক্ত শ্রী জগন্নাথ রায় বহু বৎসর পূর্বেই ইহধাম ত্যাগ করেন। ভারতের অনেক জনহিতকর প্রতিষ্ঠান ও ধর্মীয় সংস্থা এঁদের অকুণ্ঠ দানে ও নানারূপ সহায়তায় বিশেষভাবে উপকৃত। আমরা শ্রীশ্রী মায়ের চরণে তাঁর পুণ্য আত্মার যথাযোগ্য স্থিতি ও শান্তি প্রার্থনা করি। শোক সন্তপ্ত সহধর্মিণী, কন্যা ও স্বজনগণকে সমবেদনা জানাই। মাতৃ শ্রীচরণে প্রার্থনা করি তাঁদের শান্তি ও কল্যাণ।

শ্রীমতী কমলা ভট্টাচার্য্য — শ্রীশ্রী মায়ের আশ্রিতা শ্রীমতী কমলা ভট্টাচার্য্য শ্রী দিলীপ ভট্টাচার্য্যের সহধর্মিণী, বর্তমানে কলকাতাবাসী, গত ২ রা সেপ্টেম্বর সজ্ঞানে ৬৬ বৎসর বয়সে মাতৃচরণে লীন হন। কমলাদি ১৯৭৮ সানে পুণাতে শ্রীশ্রী মায়ের আশ্রয় লাভ করেন। কমলাদি ধর্মপ্রাণা ও সৎসঙ্গপ্রেমী ছিলেন। মাতৃচরণে তাঁর স্বর্গত আত্মার শান্তি ও ঊর্দ্ধ গতি কামনা করি। সমবেদনা জানাই শোক সন্তপ্ত স্বামী, পুত্র, কন্যা ও স্বজনদের।

শ্রীশ্রীমা তাঁদের শান্তি দিন এই প্রার্থনা।

শ্রী মানসবিহারী মুখোপাধ্যায় — এলাহাবাদের শ্রীশ্রী মায়ের অতি পুরাতন ভক্ত স্বনামধন্য ডিস্ট্রিক্ট জজ্ নীরজ নাথ মুখোপাধ্যায়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমানসবিহারী মুখোপাধ্যায় গত ১৫ই অক্টোবর সজ্ঞানে ৮২ বৎসর বয়সে মাতৃচরণে লীন হয়েছেন।

তাঁর দুই কনিষ্ঠা ভগিনী - শ্রীমতী রেণুকা মুখোপাধ্যায় ও ডঃ বীথিকা মুখোপাধ্যায় মাতৃ পরিবারে সুপরিচিতা ও দুজনেই মায়ের বিশেষ কৃপাপাত্রী কন্যারূপে ভক্ত সমাজে সমাদৃতা। এই পরিবারের সমস্ত সদস্যগণই মায়ের বিশেষ কৃপা পাত্র।

শ্রী মানসবিহারী মুখোপাধ্যায় অতিশয় গম্ভীর প্রকৃতির রাশভারী ব্যক্তি স্বীয় পিতার মতই স্বল্পভাষী ছিলেন। তিনি পুলিশ বিভাগের উচ্চপদস্থ কর্মচারী ছিলেন। তাঁর নিজ কর্মক্ষেত্রে অতি সুনাম ছিল। তাঁকে উত্তরপ্রদেশের পুলিশ বিভাগের শিরোমণি বলা হত। এতকাল অবসর গ্রহণের পরেও তাঁর অন্তিম কালে পুলিশের উচ্চপদস্থ কর্মচারীরা তাঁকে রাজকীয় সম্মানের সঙ্গে স্যালুট জানিয়ে নিজেরাই কাঁধ দিয়ে অন্তিম ক্রিয়া সম্পন্ন করেন।

মায়ের চরণে তাঁর অগাধ ভক্তি ও বিশ্বাসের কোনো বহিঃপ্রকাশ ছিল না। তিনি সযতনে স্বীয় অন্তরেই তা সুরক্ষিত রাখতেন।

তাঁর সহধর্মিণী শ্রীমতী প্রতিমা মুখোপাধ্যায় এবং একমাত্র কন্যাও মায়ের বিশেষ কৃপাপাত্রী।

আমরা তাঁর বিদেহী আত্মার শান্তি ও উর্দ্ধগতি কামনা করি ও শোকসন্তপ্ত পরিবারকে শ্রীশ্রী মা চির শান্তি প্রদান করুন মায়ের চরণে জানাই এই প্রার্থনা।

শ্রী অনিলকুমার চট্টোপাধ্যায় — কলিকাতাবাসী শ্রীশ্রী মায়ের পুরাতনভক্ত শ্রী অনিলকুমার চট্টোপাধ্যায় গত ১৪ ই নভেম্বর সজ্ঞানে অমৃতলোকে যাত্রা করেছেন। তাঁরা স্বামী স্ত্রী দুজনেই মায়ের আশ্রিত এবং শ্রী শ্রী মায়ের বহু আশ্রম ও তীর্থভ্রমণ করে মাতৃসঙ্গলাভে ধন্য হয়েছেন। বারাণসী আশ্রমেও তাঁরা বহু উৎসবে এসে যোগদান করেছেন। তাঁদের নিউ আলিপুরস্থ বাসভবনে শ্রীশ্রীমায়ের পদার্পণও হয়েছিল বেশ কয়েকবার। শ্রী অনিল চট্টোপাধ্যায় শ্রীশ্রী আনন্দময়ী সংঘের আজীবন সদস্য ছিলেন।

আমরা তাঁর স্বর্গত আত্মার চির শান্তি ও উর্দ্ধগতি কামনা করি এবং তাঁর সহধর্মিণী ও পরিবারজনকে জানাই সমবেদনা। শ্রীশ্রী মা তাঁদের চিরশান্তি প্রদান করুন এই মাতৃচরণে প্রার্থনা।



বিশেষ সূচনা

সকল গ্রাহকদের বিশেষভাবে জানানো হচ্ছে যাঁরা এখন পর্য্যন্ত বর্ত্তমান ২০০১ সনের চাঁদা পাঠাননি তাঁরা অবিলম্বে বার্ষিক চাঁদা ৬০ টাকা মণিঅর্ডার বা ব্যাঙ্ক ড্রাফ্ট যোগে নিম্নলিখিত নামে পাঠাবার ব্যবস্থা করবেন —

Shree Shree Anandamayee Sangha
– Publication A/c.
Bhadaini, Varanasi - 221 001

কার্য্যকরী সম্পাদক
মা আনন্দময়ী অমৃতবার্তা

প্রকাশন সূচী

শ্রীশ্রী আনন্দময়ী সঙ্ঘ দ্বারা প্রকাশিত শ্রীশ্রী মায়ের সম্পর্কে নিম্নলিখিত গ্রন্থ সমূহ শ্রীশ্রী মায়ের বিভিন্ন আশ্রমে উপলব্ধ ঃ—

* **Pictorial Biography of MA** — মায়ের সমগ্র জীবন লেখা ও রেখায় উপস্থাপিত এক অনন্যসাধারণ গ্রন্থ। অতি উচ্চমানের কাগজে অসংখ্য চিত্র - সহ মুদ্রিত। রেক্সিন বাঁধাই। বাংলা সংস্করণ মূল্য ৩৫০/- ইংরাজি সংস্করণ ৪৫০/-

* মাতৃদর্শন — শ্রী জ্যোতিষ চন্দ্র রায় (ভাইজী) রচিত মূল বাংলা ভাষায় এক অতুলনীয় গ্রন্থ। মূল্য ৩০/-

* বিশ্বজননী শ্রীশ্রী মা — মায়ের সংক্ষিপ্ত জীবনী সহ শত উপদেশ। সুললিত বাংলায় লেখা হাতে রাখার মত ছোট একখানি বই। ডঃ গীতা ব্যানার্জী প্রণীত। মূল্য ১৫/-

* আনন্দ জ্যোতি (শতবার্ষিকী স্মারক) — এক গৌরবগরিম সংকলন। মায়ের দিব্য জীবনের ঘটনা পঞ্জী (১৮৯৬ - ১৯৮২), মায়ের বাণীর সুনির্বাচিত শত উদ্ধৃতি, মাতৃ-আশ্রমগুলি ও মাতৃ-প্রতিষ্ঠিত সংস্থাগুলির অসংখ্য চিত্র-সম্বলিত বিবৃতিমূলক ইতিহাস, বহু বিশিষ্ট লেখকের লেখনী-নিঃসৃত স্মৃতিচারণা, প্রখ্যাত মহাত্মাবৃন্দ ও বিশেষ গৌরবান্বিত ব্যক্তিবর্গের বিশেষ সন্দেশ ও সম্মাননা, সর্বোপরি মায়ের বিরল আলোকচিত্রের বহু-সংখ্যক সমাবেশ। অতি উচ্চমানের কাগজে মুদ্রিত। মূল্য ১০০/-

* **In your heart is my abode** – ডক্টর বীথিকা মুখার্জী রচিত ইংরাজিতে মায়ের জীবনের সংক্ষিপ্ত সার এবং শ্রীশ্রী মায়ের শত উপদেশ। মূল্য ২৫/-

* **Matri Vani** – মায়ের অমূল্য উক্তিগুলির ইংরাজিতে সংকলন। হাতে রাখার মত আকার। মূল্য ২০/-

* **Words of SriAnandamayee Ma** – মায়ের অতিমূল্যবান কথোপকথন আত্মানন্দ (কুমারী ব্ল্যাংকা শ্লাম) কর্তৃক সংকলিত ও ইংরাজিতে অনুদিত। মূল্য ৩০/-

* **Mother as seen by her devotees** – বিশিষ্ট বিদ্বৎমণ্ডলী ও শ্রীশ্রী মায়ের প্রধান ভক্তদের ইংরাজিতে লেখা মাতৃ সম্পর্কে প্রবন্ধাবলীর সংকলন। মূল্য ৩০/-



"হে ভগবান, হে প্রভু, হে মা।
আমি তোমার, তুমি আমার।
আমি তোমার, তুমি আমার।
আমি তোমার, তুমি আমার।"

— শ্রী শ্রী মায়ের বাণী ঃ জন্মোৎসব, উত্তরকাশী।

শ্রী জয়ন্ত পাঠকের কণ্ঠে গীত শুভ নাম যজ্ঞের ক্যাসেট এবং শ্রী শ্রী মায়ের দিব্য চরণে নিবেদিত ক্যাসেট "আনন্দ সংগীত" নিম্নলিখিত স্থানে উপলব্ধ।—

- ☐ শ্রী শ্রী মা আনন্দময়ী আশ্রম, কনখল
- ☐ শ্রী শ্রী মা আনন্দময়ী আশ্রম, আগরপাড়া
- ☐ মাতৃমন্দির, যোধপুর পার্ক, কলিকাতা

❄ Branch Ashrams ❄

15. NEW DELHI : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram,
Kalkaji, New Delhi-110019 (Tel : 011-6826813)
16. PUNE : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram,
Ganesh Khind Road, Pune-411007, (Tel : 020-5537835)
17. PURI : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram,
Swargadwar, Puri-752001, Orissa.
18. RAJGIR : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram,
P.O. Rajgir, Nalanda-803116, Bihar (Tel : 06112-55362)
19. RANCHI : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, Main Road,
P.O. Ranchi-834001, Bihar (Tel : 0651-312082)
20. TARAPEETH : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram,
P.O. Chandipur-Tarapeeth, Birbhum-731233, W.B.
21. UTTARKASHI : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram,
Kali Mandir, P.O. Uttarkashi-249193,
22. VARANASI : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram,
Bhadaini, Varanasi-221001, U.P.
(Tel : 0542-310054+311794)
23. VINDHYACHAL : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, Ashtabhuja Hill,
P.O. Vindhyachal, Mirzapur-231307, (Tel : 05442-42343)
24. VRINDAVAN : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram,
P.O. Vrindavan, Mathura-281121 U.P. (Tel: 0565-442024)

IN BANGLADESH :

1. DHAKA : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram,
14, Siddheshwari Lane, Dhaka-17 (Tel : 405266)
2. KHEORA : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram,
P.O. Kheora, Via-Kasba, Brahmanbaria.



REGISTERED WITH THE REGISTRAR OF NEWSPAPERS
FOR INDIA AS NO. 65438/97



মা আনন্দময়ী

অমৃত বার্তা



VOL.-5 APRIL, 2001 NO.2

SHREE SHREE ANANDAMAYEE SANGHA

❄ Branch Ashrams ❄

1. AGARPARA : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, P. O. Kamarhati, Calcutta-700058 (Tel : 033-5531208)
2. AGARTALA : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, Palace Compound, P.O. Agartala-799001. West Tripura (Tel : 0381-208618)
3. ALMORA : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, Patal Devi, P.O. Almora-263602, (Tel : 05962-33120)
4. ALMORA : Shree Shree Ma Anaudamayee Ashram, P.O. Dhaul-China, Almora-263881, (Tel : 05962-62013)
5. BHIMPURA : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, Bhimpura, P.O. Chandod, Baroda-391105, (Tel : 02663-833208
6. BHOPAL : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, P. O. Bairagarh, Bhopal-462030, M.P. (Tel : 0755-521227)
7. DEHRADUN : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, Kishenpur, P.O. Rajpur, Dehradun-248009 (Phone : 0135-734271)
8. DEHRADUN : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, Kalyanvan, 176, Rajpur Road, P.O. Rajpur, Dehradun-248009, (Phone : 0135-734471)
9. DEHRADUN : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram. P.O. Raipur Ordnance Factory, Dehradun-248010
10. DEHRADUN : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, 47/A Jakhan, P.O. Rajpur, Dehradun,
11. JAMSHEDPUR : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, Near Bhatia Park, Kadma, Jamshedpur-831005, Bihar
12. KANKHAL : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, P.O. Kankhal, Hardwar-249408, (Tel : 0133-416575)
13. KEDARNATH : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, Near Himlok, P.O. Kedarnath, Chamoli-246445,
14. NAIMISHARANYA : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, Puran Mandir, P.O. Naimisharanya, Sitapur-261402, U.P.

মা আনন্দময়ী — অমৃতবার্তা

শ্রীশ্রী মা আনন্দময়ীর দিব্য জীবন
ও
অমূল্যবাণী সম্বলিত ত্রৈমাসিক পত্রিকা

বর্ষ - ৫	এপ্রিল, ২০০১	সংখ্যা — ২

❋

❋

বার্ষিক চাঁদা (ডাক ব্যয়সহ)
ভারতে - ৬০/- টাকা
বিদেশে - ১২ ডলার অথবা ৪৫০/- টাকা
প্রতি সংখ্যা - ২০/- টাকা

মুখ্য নিয়মাবলী

❋ ত্রৈমাসিক পত্রিকা বাংলা, হিন্দী, গুজরাতী ও ইংরাজী এই চার ভাষায় পৃথক পৃথকভাবে বৎসরে চারবার জানুয়ারী, এপ্রিল, জুলাই এবং অক্টোবর মাসে প্রকাশিত হইয়া থাকে। পত্রিকার বর্ষ জানুয়ারী সংখ্যা হইতে আরম্ভ হয়।

❋ প্রধানতঃ শ্রী শ্রী মায়ের দিব্য জীবন ও অমূল্যবাণী বিষয়ক প্রবন্ধাদি প্রকাশনই এই পত্রিকার মুখ্য উদ্দেশ্য অবশ্য দেশ-কাল-ধর্ম্ম ও সম্প্রদায় নির্বিশেষে যে কোন আধ্যাত্মিক বা দার্শনিক হৃদয়গ্রাহী প্রবন্ধ এবং বিশিষ্ট মহাপুরুষদের জীবনী ও উপদেশ সম্বলিত লেখা সাদরে গৃহীত হইবে। নিতান্ত ব্যক্তিগত অনুভব ব্যতীত শ্রী শ্রী মায়ের দিব্যলীলা বিষয়ক লেখাও শ্রী শ্রীমায়ের অগণিত ভক্তবৃন্দের নিকট হইতে আশা করা যাইবে।

❋ প্রতিটি লেখা সাদা কাগজের এক পৃষ্ঠায় সুস্পষ্ঠ অক্ষরে লিখিত থাকা বিশেষ আবশ্যক। কোনও কারণবশতঃ লেখা পত্রিকায় প্রকাশিত না হইলে লেখকের নিকট ফেরৎ পাঠান অসুবিধাজনক।

❋ অগ্রিম বার্ষিক চাঁদা কেবলমাত্র **মনি অর্ডার বা ডিমান্ড ড্রাফ্ট দ্বারা "Shree Shree Anandamayee Sangha - Publication A/C"** এই নামে পাঠাইবার নিয়ম।

❋ পত্রিকা সম্পর্কিত যোগাযোগ নিম্নলিখিত ঠিকানায় করিতে হইবে —

Managing Editor,
Ma Anandamayee - Amrit Varta
Mata Anandamayee Ashram
Bhadaini, Varanasi - 221 001

❖ ❖ ❖ ❖ ❖

পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিবার নিয়ম ঃ-
সম্পূর্ণ পৃষ্ঠা — ২০০০/- বাৎসরিক
অর্দ্ধেক পৃষ্ঠা — ১০০০/- "
১/৪ পৃষ্ঠা — ৫০০/- "

বিজ্ঞাপনের বিষয়বস্তু সহ অগ্রিম টাকা উপরোক্ত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

শ্রীশ্রী আনন্দময়ী সংঘের পক্ষে মুদ্রক ও প্রকাশক শ্রী পানু ব্রহ্মচারী দ্বারা শ্রী শ্রী আনন্দময়ী সংঘ ভাদাইনী, বারাণসী - ২২১ ০০১ উঃপ্রদেশ হইতে প্রকাশিত এবং রত্না প্রিন্টিং ওয়ার্কস, বি ২১/৪২ কামাচ্ছা, বারাণসী - ১০ হইতে মুদ্রিত। সম্পাদক — শ্রী পানু ব্রহ্মচারী।

সূচীপত্র



নবীন প্রকাশন

ভক্তবৃন্দের বিশেষ আগ্রহে শ্রীশ্রী আনন্দময়ী সংঘ দ্বারা নিম্নলিখিত অমূল্য কয়েকটি বাংলা পুস্তক পুনর্মুদ্রিত হয়ে শ্রীশ্রী মায়ের বিভিন্ন আশ্রমে উপলব্ধ আছে।

১. *শ্রীশ্রী মা আনন্দময়ী — প্রথম ভাগ।* শ্রদ্ধেয়া গুরুপ্রিয়া দেবী দ্বারা লিখিত শ্রীশ্রী মায়ের অপূর্ব লীলাকথা ও ভ্রমণ কাহিনীর অনবদ্য বিবরণ। পণ্ডিত প্রবর পদ্মবিভূষণ ডঃ গোপীনাথ কবিরাজ কর্তৃক লিখিত বিশেষ ভূমিকা সহ। মূল্য ৩০্ টাকা।

২. *মাতৃবাণী* — শ্রীশ্রী মায়ের অমূল্য বাণীর সংকলন। পকেট সাইজ। মূল্য ৫্ টাকা।

৩. *শ্রীশ্রী মা আনন্দময়ী প্রসঙ্গ — প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ* — শ্রীশ্রী মায়ের অতি পুরাতন ভক্ত শ্রী অমূল্যকুমার দত্তগুপ্ত কর্ত্তৃক শ্রীশ্রী মায়ের লীলা কাহিনী ও কথোপকথনের সুললিত ভাষায় লিখিত অপূর্ব গ্রন্থ। প্রতি ভাগের মূল্য ৩০্ টাকা।

* * *

শ্রীগুরু ও দীক্ষা — মাতৃভক্ত শ্রীতাপস কুমার সোম কর্ত্তৃক সংকলিত শ্রীশ্রী মায়ের মুখনিঃসৃত গুরু এবং দীক্ষা সম্বন্ধে নানা প্রসঙ্গ। মূল্য ২৫্ টাকা। নূতন প্রকাশ।

*



—Courtesy : GOYAL STUDIO, DEHRADU



মাতৃ-বাণী

(সঙ্কলন - কুমারী চিত্রা ঘোষ)

নিজ লক্ষ্য প্রাপ্তির জন্য মানুষেরই মহাযাত্রা হওয়া। নিত্য নব নব ভগবৎ অনুভূতি স্থিতি লাভের দিকে ব্রতী থাকা।

*   *   *

সর্ব্বক্ষণ ঠাকুর সেবায় মন রাখা। জপে ধ্যানে সদ্‌গ্রন্থ পাঠে ডুবে থাকার চেষ্টা। মন শরীর সুস্থ রাখার চেষ্টা — সত্যানুসন্ধানে মন প্রফুল্ল, আনন্দে রাখা, ভগবৎ ক্রিয়ার অনুকূল নিয়া থাকা।

*   *   *

এ উত্তাল তরঙ্গ লবণ জলের মধ্যে সমুদ্র-স্নান করতে হবে। সমুদ্র স্নানে তৃপ্ত হতে হবে।

*   *   *

দুইটি জিনিষ এক জায়গায় থাকলে একটু আওয়াজ নড়া চড়া স্বাভাবিক নয় কি? জীব স্বভাব, জগতের কর্ম্মের পরিবেশে জন-সঙ্গে নিজেদের মত-মতান্তর আলোচনা ইত্যাদি কর্মজগতে হওয়া স্বাভাবিক নয় কি? কেবল সত্যলাভ। পরমপথের এ সব বাধক ত নিশ্চয়ই।

*   *   *

ইচ্ছাময়ের ইচ্ছা পূর্ণ। তিনি যখন যেরূপে - সবই ত তাহারই রূপ তিনিই। এই শরীর - যে ঢঙ্গে যে রূপ বাজায়, সেই সেই রূপেইত বাজে। তুমিই সর্ব্বরূপে - আনন্দ- আনন্দ - আনন্দ।

*   *   *

অমূল্য সময় চলে যাচ্ছে। এদিক ওদিক ভাববার সময় দেওয়া কেন? নিজের যাত্রা সফল - চেষ্টা প্রয়োজন। সত্য অনুসন্ধান বিনা মানুষের বিঘ্ন বিনাশের রাস্তা নাই। কেবল নিজেকে পাওয়ার নিজের অনুসন্ধানই করণীয় নয় কি?

*   *   *

ভগবৎবুদ্ধি তে সর্বজীব সেবা — সকলের জন্যই মায়ের এই কথা। যিনি একমাত্র ভগবানকে নিয়ে রাতদিন ২৪ ঘন্টা স্থির হইতে পারিতেছে সে তো সর্ব্বজীবের মহাসেবায় ব্রতী — তাহার সর্ব্বক্রিয়া জীবমাত্রেরই আদর্শ।

*   *   *

সৎ পরিবেশে সৎ আলোচনায় সর্ব্বক্ষণ মন রাখা প্রয়োজন। ফাঁক পাইলেই পাঁকে টানিয়া লইবার দিক্ হয়। এইটী মনে রাখা সর্ব্বক্ষণ মানুষেরই।

*   *   *

গ্রন্থি ভেদ হলে কোনো কর্মই হয় না। গ্রন্থি ভেদ হওয়ার লক্ষ্যে যাত্রীর যাত্রায় ক্রিয়া করণীয় আছে। তাহাকে চিত্তশুদ্ধি বলে। গ্রন্থি মুক্ত অবস্থায় স্বরূপ স্থিতির দিক যেখানে, ঠিক ঠিক ঐ স্থিতি - সেখানে কিন্তু

বুঝতে হবে কোন গ্রন্থি জনিত কর্মই নাই। কিন্তু কর্ম নাই যেখানে কথা - সেখানে তো আর গ্রন্থি জনিত প্রশ্ন আসে

* * *

নিষ্কাম শব্দটা কেন ? প্রথম ধরতে হবে - কামনা বাসনা মুক্তির যাত্রীর দিক। সেখানেই যে চিত্ত শুদ্ধ জনি নিষ্কাম কর্মের দিক। আর কর্ত্তব্য বোধের যা প্রশ্ন করা হয়েছে সেখানকার কথা হলো - মনো রাজ্যেই নিষ্কামক লক্ষ্যে যাত্রীর ইহা হতে পারে।

* * *

নেতি নেতি হলো নিজকে জানবার পাওয়ার লক্ষ্যে বিচার ধারা। আর 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম' হলো স্ব তত্ত্ব। এই হলো অবিরোধ তত্ত্ব।

* * *

যথাশক্তি ভগবানকে পাওয়ার জন্য মনে প্রাণে ডাকা। যাঁকে পাইলে সব পাওয়া। যে স্থানে গেলে আ যাওয়ার প্রশ্ন নাই। সাময়িক সুখ ও শোক, দুঃখের স্থান নাই। সেই যে নিজ ঘর, প্রাণের প্রাণ আত্মা। স্বয়ং ভগ তাঁহারই আশ্রয়ের জন্য অনুকূল রাস্তায় যে চলে তাহার সর্ব্ব ব্যথা বেদনা তিনি স্বয়ংই মুছাইয়া দেন। তাঁ চরণই সর্ব্বক্ষণ স্মরণীয়।

* * *

মনুষ্য জন্ম দুর্লভ। মানুষেরই ভগবান লাভ। ঐ যে জিজ্ঞাসা মূল উৎপত্তি স্থান স্থিতির সেই নিগূঢ়তত্ত্বে প্রকাশ যদি, তাহলে সব কিছুই জানা ভগবৎরাজ্যের সম্ভব। তাঁর রাজ্যে সম্ভব অসম্ভব - সম্ভব।

* * *

আলো সেই জ্যোতি - যে জ্যোতি দ্বারা এই জগৎ দেখতে পাচ্ছ। ইহা তাঁহারই আভাস, নিজের ম ভগবানকে দেখবার ইচ্ছা - ভালকথা।

* * *

কল্পনামাত্র বিশ্বজগৎ সৃষ্ট করেন। দেখা যায় তো কল্পনা বিনা কেউ কোনো কাজ করতে পারে না। গীতা বলেছেন - হাতের যন্ত্র। কানে হাত দাও মেশিন চলছে। এখন বুঝে নাও সৃষ্টি স্থিতি লয় কোথা হতে হয়। তি ইহাও দিয়েছেন - ভগবৎ প্রাপ্তির যাত্রী হলে, সে ভগবানকে পাওয়া। নিজের আবরণ লাগানো হটানোর ক্রি নিজেরই করতে হয়। সেই শক্তির দিক্ ও তিনি দিয়ে রেখেছেন। তিনি কিন্তু এই নিজ ক্রিয়ায় প্রকাশ হবেন দরজা খোলবার চাবি দিয়ে দ্যান। আপনি আপনি স্বয়ং প্রকাশ যে তিনি আছেন - দরজা খুল্লে দেখা যায়। তি নিজেকে নিয়ে নিজ লীলা খেলা করবার জন্য ঐ সৃষ্টি। আর যদি বাসনা কামনা পূর্ণ করবার জন্য সেই রাস্তায় চ বিষয় ভোগের দিক নিয়া তাহলে চক্কর খাওয়ার দিক মনে রাখা। মনুষ্য সৃষ্টির সঙ্গে ঐ দুটা দিক্ ও তাহাকে দি থাকেন। এখন বুঝে নাও মানুষের কর্ত্তব্য কি? যে যা চায়, সে তাই পায়। কেউ নিজেকে পাওয়ার দিক চায় কে চক্কর খাওয়ার দিক চায়।

*

শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী প্রসঙ্গ
(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

— শ্রী অমূল্যকুমার দত্তগুপ্ত

শ্রীশ্রী মা

যখন আমরা কৈলাসে যাইতেছিলাম তখন ঐখানকার দুর্গম পথ দেখিয়া স্বামী অখণ্ডানন্দ বলিয়াছিল, "মা, কি ভীষণ পথ! একবার যদি অন্যমনস্কভাবে চলিতে গিয়া বা অন্য কোনও কারণে কাহারও পা পিছলাইয়া যায় তবে তাহার আর নিস্তার নাই।" ইহা শুনিয়া জ্যোতিষ বলিয়াছিল, "ইহাতে ভয় পাইবার কি আছে? কৈলাসের পথে যদি মায়ের সম্মুখে দেহত্যাগ হয় তবে উহার চেয়ে আনন্দের বিষয় আর কি আছে? ঐরূপ মৃত্যুত আমি কামনা করি।" উহা শুনিয়া আমি তখনই তাহাকে কথা ফিরাইয়া নিতে বলিলাম। কিন্তু সে আমার কথা শুনিয়া শুধু হাসিতে লাগিল। পরে আমার পীড়াপীড়িতে সে কথা ফিরাইয়া নিল। আমি আরও বলিলাম, "তুই বল না তুই আলমোড়ায় মঙ্গলমত ফিরিয়া যাবি।" সে তাহাই বলিল। দেখ, তাহাকে আলমোড়া পর্য্যন্ত ভালভাবে ফিরিয়া যাইতে বলা হইল। উহার বেশী নয় এবং আলমোড়াতেই তাহার দেহত্যাগ হইয়াছিল।

জ্যোতিষ কি সঙ্কল্প লইয়া ভাত ছাড়িয়াছিল তাহা তোমাদিগকে বলিয়াছি। কিছুদিন পর সে নিজেই ভুলিয়া গিয়াছিল যে তাহার ভাত না খাওয়ার কারণ কি। কৈলাস হইতে ফিরিবার সময় এ দেহের খেয়াল হইল যে জ্যোতিষকে ভাত খাওয়াইতে হইবে। কারণ যাহার সন্ন্যাস হইয়া গিয়াছে তাহার কোন বৈষয়িক সঙ্কল্প থাকাত ঠিক নয়। তাই দিদিকে দিয়া ভাত ও তরকারী রান্না করাইয়া জ্যোতিষকে খাওয়াইয়াছিলাম। এই গল্প যখন সোলনে করিতেছিলাম তখন ইহা শুনিয়া কৃষ্ণানন্দ অবধূতজী বলিয়াছিল, "মা'ত ইহা করিবেনই, পাছে ভাইজীর জড়ভরতের মত অবস্থা হয়।"

প্রথম সংযম সপ্তাহ — কাশী আশ্রম

২৩ শে শ্রাবণ শুক্রবার (৮/৮/৫২)। ২১ শে শ্রাবণ হইতে সংযম সপ্তাহ আরম্ভ হইয়াছে। এই সংযম সপ্তাহের প্রেরণা সোলনের রাজাসাহেব হইতে প্রথম আসিয়াছে এবং যাহাতে আনন্দময়ী সঙ্ঘের সমস্ত সভ্য ইহাতে যোগ দেন ইহাই রাজা সাহেবের ইচ্ছা। অবশ্য অন্যান্য লোকেরও ইহাতে যোগদান করিতে কোন বাধা নাই। ভিন্ন ভিন্ন তীর্থস্থানে অন্ততঃ ৬ মাস পর পর শ্রীশ্রীমায়ের সান্নিধ্যে এই সংযম সপ্তাহ পালিত হয় ইহাই রাজাসাহেব ইচ্ছা করেন। । সোলনে এই প্রস্তাব যখন রাজাসাহেব প্রথম করেন তখন অবধূতজী প্রভৃতি ইহা সানন্দে গ্রহণ করিয়াছিলেন। অবধূতজীর প্রস্তাব মতই যাঁহারা এই সংযমব্রতে ব্রতী হইয়াছেন তাঁহাদিগকে তিনশ্রেণীতে ভাগ করা হইয়াছে। যাঁহারা প্রথম শ্রেণীতে আসিতে ইচ্ছা করিয়াছেন তাঁহাদিগকে এই সাতদিনের মধ্যে দুইদিন শুধু গঙ্গাজল পান, একদিন চরু, একদিন খিচুড়ী, একদিন কেবল সবজী এইভাবে মাত্র একবেলা লঘু

পথ্য গ্রহণ করিয়া থাকিতে হইবে। দ্বিতীয় শ্রেণীর ব্রতীরা একবেলা একপদ দিয়া আহার করিবেন, রাত্রিবেলা শুধু দুধ খাইয়া থাকিবেন। তৃতীয় শ্রেণীর ব্রতীরা ভাতের সঙ্গে ডাল, তরকারী পাইবেন এবং রাত্রিবেলা দুধ লইবেন। দ্বিতীয় এবং তৃতীয় শ্রেণীর ব্রতীরা দুপুরবেলা দধিও লইতে পারিবেন।

আহারের এই সংযম ব্যতীত ব্রতীদিগকে নিম্নলিখিত নিয়মগুলি পালন করিয়া চলিতে হইবে। সকালবেলা নিত্যকৃত্যের পর বেলা ৮টা হইতে ৯ টা পর্যন্ত তাঁহারা শ্রীশ্রীমায়ের সম্মুখে ধ্যান করিবেন। ইহার পর গীতাপাঠ, কীর্ত্তন এবং সদালোচনায় বেলা ১২টা পর্য্যন্ত যাইবে। দুপুরে আহার এবং বিশ্রামের পর বিকালবেলা ৩টা হইতে ৪ টা পর্য্যন্ত শ্রীশ্রী মায়ের সম্মুখে ধ্যান। ইহা ব্যতীত ব্রতীদিগকে প্রত্যহ ৫ ঘন্টা করিয়া জপ করিতে হইবে। যাহাতে মিথ্যাকথা বলা না হয় সেজন্য বাক্‌সংযম করিতে হইবে। যাঁহারা এই ব্রতে ব্রতী হইয়াছেন, তাঁহারা খুব উৎসাহের সহিত এই তিনদিন যাবৎ জপধ্যান ইত্যাদি করিয়া যাইতেছেন।

শ্রী শ্রী মায়ের অলৌকিক দর্শন ও শ্রবণ

আজ বিকালে ধ্যানের পর শ্রীমান বিভু যখন "হে ভগবান্, হে ভগবান্" বলিয়া গাহিতেছিল, মা হঠাৎ শয্যা হইতে উঠিয়া কেমন একটা তন্ময়ভাবে গাহিতে লাগিলেন — "হে পিতঃ হে হিতঃ হে ব্রহ্মতত্ত্বং"। এই পদের শেষ অংশটা খুব অস্পষ্ট ছিল;কখনও মনে হইতেছিল যে মা বুঝি "ব্রহ্মভূতং" এই জাতীয় কিছু বলিতেছেন। মা কিছুক্ষণ গাহিয়া বলিলেন, "তোমরা যখন ধ্যান করিতেছিলে তখন দেখিতে পাইলাম যে একটি ৫/৬ বৎসরের বালক, মাথায় ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া কাঁধ পর্য্যন্ত চুল, তন্ময়ভাবে ঐ পদটি গাহিতেছিল। তাহার মুখের কথাও যেন ভাল করিয়া ফুটিতেছিল না। ঐ গান শুনিয়া তোমাদের নিকট উহা রাখিয়া দিবার খেয়াল হইয়া ছিল, তাই নিজেই উহা গাহিলাম। এইরূপ কতই ত দেখা এবং শুনা হয়, সব সময়ত বলা হয় না। আজ খেয়াল হইল তাই উহা গাহিয়া তোমাদের নিকট রাখিয়া দিলাম।

"আর একবার বৃন্দাবনের দিকেও এইরূপ হইয়াছিল। আমরা বৃন্দাবন হইতে মথুরায় গিয়াছি বিশ্রামঘাটের নিকট এক জায়গায় আছি, রাত্রি তখন ১২টা, শুনা গেল যে কে যেন একটি গান গাহিতে গাহিতে চলিয়াছে। যোগেশ, অভয়, ব্ল্যাঙ্কা প্রভৃতি সঙ্গে ছিল। উহারাও ঐ গান শুনিতে পাইয়াছিল। পাখী গান করিয়া উড়িয়া গেলে যেমন ধীরে ধীরে ঐ গান অস্পষ্ট হইয়া থামিয়া যায় এখানেও সেইরূপ হইয়াছিল। মনে হইয়াছিল কেহ যেন আঁকাবাঁকা পথে গান করিয়া যাইতেছে। কখনও ঐ গান খুব স্পষ্ট, কখনও অস্পষ্ট হইতে হইতে উহা যেন শূন্যে মিলিয়া গেল। ঐ গানের স্বর যেমনি মধুর ছিল আবার তেমনি স্পষ্ট ছিল। আজ যে বালককে দেখিলাম উহারও কণ্ঠস্বর খুব মধুর, কিন্তু এমনি তন্ময়ভাবে সে গাহিতেছিল যে ইহার কথাগুলি যেন ভাল করিয়া ফুটিয়া উঠিতেছিল না। শিশুদের কথা যেমন অস্পষ্ট হয় ইহারও সেইরূপ ছিল। তাহা ছাড়া তোমাদের ধ্যানের সময় ইহার প্রকাশ হইয়াছিল কি না, তাই উহার ঐরূপ গম্ভীর এবং তন্ময়ভাব।"

ডাঃ পান্নালাল এবং কমলাকান্ত ব্রহ্মচারী মাকে ছেলেটির সম্বন্ধে বার বার প্রশ্ন করিয়াও বিশেষ কিছু

উদ্ধার করিতে পারিলেন না। কেবল এই মাত্র জানা গেল যে ছেলেটির গায়ের রং খুব কালোও নয়, খুব ফর্সাও নয়। তাহার পরিধানে যে কাপড় ছিল তাহাও সাধারণ। মা বলিলেন, "ইহার (অর্থাৎ ছেলেটির) আর পরিচয় কি? একমাত্র তিনিই ত। মথুরায় তিনি নিজেকে শব্দরূপে প্রকাশ করিয়াছিলেন, আজ এখানে বালকরূপে প্রকাশ করিলেন। রাম বল, কালী বল, কৃষ্ণ বল, একমাত্র তিনিই তো, ভিন্ন ভিন্ন রূপে নিজেকে প্রকাশ করেন।"

আজ রাত্রিতেও ঐ গানের কথা উঠিল। মা বলিলেন, "গানের পদটি ছিল, "হে পিতঃ, হে হিতঃ, হে ব্রহ্মতত্ত্বং, হে পিতঃ; হে হিতঃ, হে ব্রহ্মভূতং।" গাহিবার সময় আমিই "তত্ত্ব"র স্থলে "তত্ত্বং" বলিয়াছিলাম। ছেলেটি কিন্তু অনুস্বারের উচ্চারণ খুব অস্পষ্টভাবে করিতেছিল। গাহিবার সময় মায়ের কথাও যে খুব অস্পষ্ট ছিল সে কথা বলা হইলে, মা বলিলেন, "ঐ সময় ছেলেটির সুরের দিকেই আমার লক্ষ্য ছিল, কাজেই তখন পদগুলি ঐরূপ অস্পষ্ট হইয়াছিল।

মা যে নূতন পদ বলিয়া দিলেন উহা পূর্ব্বের সুরে গাওয়া হইবে কি না এরূপ সন্দেহ প্রকাশ করা হইলে মা শ্রীমান বিভুকে লইয়া ঘরের মধ্যে গেলেন।

সংযম সপ্তাহে প্রত্যহ রাত্রি ১১-৪৫ হইতে ১২-১৫ পর্য্যন্ত মাকে লইয়া ধ্যান করা হইতেছে। ঐ সময় মা আসিয়া চত্বরের উপর বসেন। আজ ১১টার সময়ই মা বিভুকে সঙ্গে করিয়া আসিয়া চত্বরের উপর চৌকিতে বসিলেন। গানের সুরটি মা বিভুকে যেভাবে দেখাইয়া দিয়াছেন সেই সুরে বিভু কিছুক্ষণ গাহিল। ইহার পর মা তাহাকে আরও একটি গান গাহিতে বলিলেন। এই গানটি সম্বন্ধে আমি যাহা শুনিয়াছি তাহা এই; গত গ্রীষ্মের সময় মা যখন সিমলাতে ছিলেন তখন একদিন সকালবেলা মা তন্ময় হইয়া এই পদটি গাহিতেছিলেন — "আয়ো মেরে সলোনা ছলিয়া রে, বনোয়ারী রে, আও মেরে সলোনা ছলিয়ারে।" এই একটি পদ মা খুব করুণ সুরে বার বার গাহিতেছিলেন। মা বলিয়াছিলেন, "আমি শুনিতেছি কেহ যেন তন্ময় হইয়া এই পদটি গাহিতেছে।" শ্রীমান বিভু সেই সময় সিমলাতে ছিল বলিয়া মা বিভুকে ঐ পদটি গাহিতে শিখাইয়াছিলেন। আজ আবার বিভুকে ঐ পদটি গাহিতে বলিলেন। সে গাহিতে লাগিল। একটু পরেই তাহার স্বরটি করুণ হইয়া উঠিলে মা বলিলেন, "এখন কিছুটা হইতেছে।" বিভু বলিল, "গানের করুণ স্বরটি যখন ঠিক ভালো আসে তখনই চোখে জল আসে, উহা সামলাইয়া রাখা যায় না।" উহা শুনিয়া মা বলিলেন, "তুই গা।" বিভু পুনরায় গাহিতে চেষ্টা করিল, একটু গাহিয়াই ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল। তাহার অবস্থা দেখিয়া আমার মনে হইল যে শ্রীশ্রী মায়ের কৃপার জন্যই বিভুর এই অবস্থা। বিভু প্রায় ১০ মিনিট কাঁদিয়া শান্ত হইলে মা বলিলেন, "হৃদয়টা গলিয়া না গেলে এই গান ঠিক ভাল আসে না। যখন আমি এই গান শুনিয়াছিলাম তখন মনে হইয়াছিল রাধা যেন তাঁহার প্রিয়তমের জন্য এমনি আকুলি বিকুলিভাবে ডাকিতেছে। কখনও কখনও তন্ময়তার জন্য তাহার স্বর বন্ধ হইয়া আসিতেছে। আজ যেমন বালকটির চেহারা দেখিলাম এবং গান শুনিলাম, সে দিন কোনও মূর্ত্তি দেখিয়াছিলাম না। কিন্তু গানের সুরটা হইতেই গায়কের ভাব ও মূর্ত্তি যেন ধরা পড়িতেছিল। অমূল্য, বুঝিলে?"

আমি। হাঁ, মা।

২৪ শে শ্রাবণ, শনিবার (ইং ৯/৮/৫২) রাত্রি ৯।। টার সময় মা চত্বরে আসিয়া বসিলেন। নানা কথার মধ্যে মা আমাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আজ ধ্যানের সময় তোমরা কোন শব্দ শুনিয়াছ কি?" উপস্থিত সকলেই বলিল, "না, মা, আমরাত কিছু শুনি নাই।" মা বলিলেন, "সকালবেলা তোমরা যখন ধ্যানে বসিয়াছিলে তখন "আপনে আপ" এই কথাটি শুনিতে পাইলাম। কণ্ঠস্বর কতকটা কান্তিভাইয়ের মত। আরও দেখিলাম একটি লোক একটা ব্যাগ আনিয়া এ দেহের কাছে খুলিয়া ধরিল। ব্যাগের মধ্যে দেখিতে পাইলাম কতকগুলি নানা রংয়ের কাপড়। তখন খেয়াল হইল যাহারা বসিয়া ধ্যান করিতেছে এ কাপড়গুলি তাহাদেরই আবরণের প্রতীক। কাহার কতখানি আবরণ কাটিয়াছে তাহাই এ দেহকে দেখাইতে ছিল। সকলের আবরণত একরূপ নয় তাই কাপড়গুলি নানা রংয়ের। কাহার কতখানি আবরণ কাটিয়াছে তাহা দেখা হইয়া গেল। যে আবরণ কাটিলে তাঁহার প্রকাশ হয়, সে আবরণ অবশ্য কাহারও কাটে নাই।"

এক ভদ্রলোক — মা, কাহার কতখানি আবরণ কাটিয়াছে?

মা — উহা এ দেহ প্রকাশ করিবে না।

কুসুম ব্রহ্মচারী — আমরা যখন ধ্যানে বসি তখন আমাদের যে কিছু হইয়াছে বা হইতেছে তাহা একেবারেই বুঝিতে পারি না।

আমি — মা, কাল কৃপা করিয়া বিভুকে যেমন একটু পরশ দিয়াছিলে, সেই রূপ ধ্যানের সময় সকলকেই একটু পরশ দিলে পার।

আমার কথা শুনিয়া মা হাসিতে লাগিলেন। আমি আবার বলিলাম, "কাল বিভু গান করিতে করিতে রাধার মহাভাবের যে একটু পরশ পাইয়াছিল উহা কখনই তাহার চেষ্টা সাপেক্ষ নয়। জাগতিক কোন দুঃখ কষ্ট স্মরণ বা চিন্তা করিয়া রাধার ঐ ভাব আনা সম্ভব নয়। আমার মনে হয় কাহারও ভিতর জীবভাব থাকিতে সে রাধাভাবের কোন অনুভূতিই পাইবে না। তবে তুমি কৃপা করিলে বা শক্তি দিলে সব কিছুই সম্ভব।

মা — (হাসিয়া) তোমাদিগকে ত বলিয়াছি যে ঐ গানের সুরটা বিভুর কাছে রাখা হইয়াছে। সে ইচ্ছা করিলেই যে, যে কোন সময় ঐ সুরটি আনিতে পারিবে তাহা নয়। যখন উহা আসিবার তখন উহা আপনা হইতেই আসিবে। সেই জন্য বলা হইয়াছে যে ঐ গানের সুরটি সাধারণ নয়। উহা বলিয়া দেখাইয়া দিলেই যে লোকে উহা ধরিতে পারিবে তাহাও নয়। প্রকৃত বিরহের ভাব ভিতরে না জাগিলে ঐ সুর বাহির হইবে না।

আমি — কথা ত একই হইল। তুমি বিভুকে তোমার শক্তি দিয়াছ বলিয়াই বিভু কাল গানটি গাহিতে গিয়া অভিভূত হইয়া পড়িল। গতকাল তুমি যখন বিভুকে গানটি করিতে বলিলে তখনই বুঝিয়াছিলাম যে ঐরূপ একটা কিছু হইল।

মা আমার কথা শুনিয়া হাসিতে লাগিলেন।

২৫ শে শ্রাবণ, রবিবার (ইং ১০/৮/৫২) আজ বেলা ১০।। টার সময় সংযুক্ত প্রদেশের গভর্নর শ্রীযুক্ত কে এম মুন্সী সস্ত্রীক শ্রীশ্রীমায়ের সহিত দেখা করিতে আসিলেন। তাঁহার উপস্থিতিতে অবধূতজী নিষ্কাম কর্ম সম্বন্ধে একটা ক্ষুদ্র ভাষণ দিলেন। ইহার পরই শ্রীযুক্ত মুন্সী মায়ের সঙ্গে গোপনে কিছু বলিবেন বলিয়া মাকে হলঘর হইতে উঠাইয়া লওয়া হইল।

২৯ শে শ্রাবণ বৃহস্পতিবার (ইং ১৪/৮/৫২)। আজ মৌনের পর মা নিজ হস্তে প্রসাদ বিতরণ করিলেন। ঐ প্রসাদ খাইতে অতি সুস্বাদু। শুনিলাম এই প্রসাদের নাম রাখা হইয়াছে "অমৃত"। রাত্রি ৯।টার পর মা চত্বরে বেড়াইতে বেড়াইতে আমাকে বলিলেন, "একদিন দেখিতেছি কি যে তোমাদিগকে যে খাবারটা আজ দেওয়া হইল উহা তৈয়ার করা হইতেছে। অবধূতজী প্রভৃতি খাইতে বসিয়াছে। তাহাকে এই খাবারটি দেওয়ার পূর্বে সে তাহার পাতা গুটাইয়া উঠিবার উপক্রম করিতেছে। ইহা দেখিয়া এ দেহ দিদিকে বলিল, "অবধূতজীকেত এই খাবার দেওয়া হইল না।" দিদি বলিল, "তাহাকে ইহা লইতে বলিব নাকি?" আমি বলিলাম, "না, থাক।" কিন্তু দিদি আমার কথা শুনিতে পাইল না। সে অবধূতজীকে ঐ প্রসাদ খাইতে বলিল, কিন্তু সে দিদির কথা গ্রাহ্য না করিয়াই উঠিয়া পড়িল। তাহার বসিবার রকমটা কতকটা মহাবীরের মত দেখিয়াছিলাম।

১লা ভাদ্র রবিবার (ইং ১৭/৮/৫২) ঝুলন, জন্মাষ্টমী উপলক্ষ্য করিয়া যাঁহারা এখানে আসিয়াছিলেন তাঁহাদের অনেকেই চলিয়া গিয়াছেন। আজও কিছু লোক নানাস্থানে রওনা হইয়া গেলেন। সকালবেলা গীতা পাঠান্তে কিছুক্ষণ কীর্ত্তন হইল। মা নিজেই কিছুক্ষণ গান করিলেন। ইহার পর কথাবার্তা আরম্ভ হইল। প্রশ্ন করিতেছিলেন কমলাকান্ত ব্রহ্মচারী। কমলাকান্তের প্রশ্ন এবং মায়ের উত্তর শুনিয়া সকলেই খুব হাসিতে লাগিলেন।

বিকালবেলা প্রফেসর যাজ্ঞিক তুলসীদাসের রামায়ণ পাঠ করিলেন। পূর্ব্বে শ্রীযুক্ত যাজ্ঞিক শ্রীশ্রীমায়ের কাছে যাতায়াত করিতেন। কিন্তু পরে ছোটমার বিশ্বউদ্ধারের প্রচেষ্টার সহিত সংযুক্ত থাকার দরুণ তিনি আর এযাবৎকাল মায়ের কাছে আসেন নাই। আমি আজই তাঁহাকে আশ্রমে আসিয়া প্রথম পাঠ করিতে দেখিলাম। বিদায়ের পূর্ব্বে শ্রীশ্রীমাও তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, "কয়েক সাল পর পিতাজীকে দেখা গেল।"

সূক্ষ্মদেহে গোপীবাবুর শ্রীশ্রীমায়ের কাছে আগমন

বিকালে পাঠান্তে আমরা যখন চত্বরের উপর আসিয়া দাঁড়াইলাম তখন মা ঐখানে কিছুক্ষণ পায়চারী করিয়া পরে নিজের ঘরে চলিয়া গেলেন। একটু পরেই মায়ের কাছে যাইবার জন্য আমার ডাক পড়িল। মায়ের কাছে খুকুনী দিদি এবং কমলব্রহ্মচারী ছিলেন। যে ব্যাপারের জন্য আমাকে ডাকা হইয়াছিল ঐ ব্যাপার নিয়াই গত শুক্রবার রাত্রি ১০টা হইতে ১২টা পর্য্যন্ত মায়ের সঙ্গে কথাবার্তা হইয়াছে। ব্যাপারটি ছিল এই — জন্মাষ্টমীর ২/১ দিন পূর্বে মা গোপীবাবুকে সূক্ষ্মে দর্শন করিয়াছিলেন। ঐ সময় তাঁহার সঙ্গে অখণ্ড মহাযোগ সম্বন্ধে আলোচনা হয়। ঐ কথা মা গোপীবাবুকে বলিয়াছেন এবং সূক্ষ্মে তাঁহার সহিত যে সকল আলোচনা হইয়াছে তাহা তাঁহাকে

লিখিয়া জানাইবেন বলিয়া বলিয়াছেন। শ্রীশ্রী মা খুকুনীদিদিকে দিয়া ঐ সকল আলোচনার বিষয় কিছু কিছু লেখাইয়াছেন। উহা শুনিবার জন্যই মা আমাকে ঐ রাত্রিতে ডাকিয়াছিলেন। সেই সময় ঐ লেখার কিছু কিছু পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন করা হইয়াছিল। পরিবর্ত্তিত আকারে লেখাটি যেরূপ দাঁড়াইয়াছে উহা শুনিবার জন্যই মা আজ আমাকে পুনরায় ডাকিয়াছিলেন।

মা যাহা যাহা লেখাইয়াছেন উহার পুনরাবৃত্তি করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। বিষয়টি অতি জটিল এবং মায়ের প্রকাশভঙ্গিও অনন্যসাধারণ। তবে উহা শুনিয়া আমার যে ধারণা হইয়াছে উহাই এখানে স্মরণার্থ কিঞ্চিৎ লিখিয়া রাখিতেছি।

গোপীবাবু সূক্ষ্মদেহে আসিয়া যে স্থানে বসিয়া মায়ের সঙ্গে কথাবার্তা বলিয়াছিলেন ঐ স্থানটি কিছু কিছু জঙ্গলা — ঘাস, লতা, পাতা ইত্যাদি ছিল এবং উহার আশেপাশে অন্যান্য লোকজনও ছিল। কিন্তু গোপীবাবুর সেদিকে লক্ষ্য নাই। তিনি নিজের ভাবে খুব তন্ময়। শ্রীশ্রীমায়ের প্রতি তাঁহার ভাবটিও যেন পরম আত্মীয়ের ভাব এবং উহা গভীর শ্রদ্ধাযুক্ত। ছোটমার সংস্পর্শে আসার পর হইতে গোপীবাবু কখনও মাকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করেন না;শুধু হাতজোড় করিয়া প্রণাম করিয়া থাকেন। কিন্তু ঐদিন সূক্ষ্মদেহে আসিয়া মাকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন। মা বলিলেন, "সূক্ষ্মে যাহা হয় যদিও স্থূলদেহে উহার প্রকাশ নাই, তথাপি উহার কিছুটা ফল স্থূলেও থাকিয়া যায়।" আশ্চর্য্যের ব্যাপার এই যে মায়ের ঐ দর্শনের পর যেদিন গোপীবাবু মায়ের সহিত দেখা করিতে আসিয়াছিলেন সেই দিন কিন্তু তিনি মাকে দুইবার ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিয়াছিলেন।

মা সূক্ষ্মদেহে গোপীবাবুকে অখণ্ডযোগ সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন তাহা কতকটা এইরূপ — লোক কোন এক ধারা ধরিয়া সাধন করিতে করিতে অনেক সময় এমন একটি স্থিতি পাইয়া যায় যাহা অতিক্রম করিয়া তাহার পক্ষে অগ্রসর হওয়া কঠিন হইয়া পড়ে। অবশ্য এই স্থিতি সাধক গুরুর ইচ্ছায়ই পাইয়া থাকে এবং গুরু কৃপা করিয়া তাহাকে এই অবস্থা হইতে উদ্ধার না করিলে তাহার পক্ষে মুক্ত হওয়া সুকঠিন। সাধকের মধ্যে ব্যক্তিগত প্রশংসার ভাব সূক্ষ্মভাবে ক্রিয়া করিতে থাকে বলিয়াই সে এই স্থিতিতে আবদ্ধ হইয়া যায়। সে নিজে ইহা বুঝিতে পারে না, কারণ তাহার মধ্যে সমষ্টি কল্যাণের ভাবটাই প্রধান বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে। সাধক সাধন পথে যে সকল ক্রিয়া করিয়া অগ্রসর হয় অনেক সময় ঐ ক্রিয়ার ফলও তাহার নিকট প্রত্যক্ষ হইতে থাকে। এই অবস্থায় যদি সমষ্টি কল্যাণের দিকে তাহার লক্ষ্য পড়িয়া যায় তবে উহা তাহার কর্ম্ম এবং কর্ম্মফলের সহিত যুক্ত হওয়ার কারুণ সে পরমানন্দ লাভ করে। আনন্দের আতিশয্য হেতু সে অনেক সময় ঐ ভাবটি প্রকাশ করিয়া ফেলে। জগতে যে সমষ্টিমুক্তির কথা উঠিয়াছে তাহা এইভাবেই হইয়াছে। এই অবস্থায় সাধকের ভবিষ্যতের দিকে লক্ষ্য পড়ে না। যদি পড়িত তবে সে আর সমষ্টি মুক্তির আনন্দে মস্‌গুল হইয়া একস্থানে দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিত না। স্বভাব হইতেও এই সমষ্টি মুক্তির প্রতিবিম্ব আসিয়া সাধকের উপর পড়িতে পারে, কারণ স্বভাবের মধ্যে সমষ্টি মুক্তি, ব্যষ্টিমুক্তি, সব কিছুইত আছে। কিন্তু স্বভাবের পরশ লাগিয়া যদি সমষ্টি মুক্তি ভাব সাধকের মধ্যে জাগিয়া

ওঠে, তবে সঙ্গে সঙ্গে তাহার দৃষ্টি ভবিষ্যতের দিকেও পড়িয়া যায়। যাহার ফলে সে লক্ষ্য ভ্রষ্ট না হইয়া সাধন পথে চলিতে থাকে এবং সময়ে এই সমষ্টিমুক্তির যথার্থ মর্ম বুঝিতে পারে।

এই মর্মে মা অনেক কথাই লেখাইয়াছেন। আজও মায়ের কাছে প্রায় একঘন্টা থাকিয়া বাসায় চলিয়া আসিলাম।

(ক্রমশঃ)



মাতৃনামের জয়গান

—অতসী রায়

আকাশে বাতাসে তব জয়গান,
মাতৃনামেতে বাজিছে বিষাণ,
জাগিয়া যখন উঠেছে পরাণ
গাওরে মধুর মায়ের নাম।

স্বর্গে, মর্ত্তে, অন্তরে, বাহিরে
সাগরে, ভূধরে, সর্ব চরাচরে,
হৃদয় বীণার তারে ঝংকারে
শোনরে মধুর মায়ের নাম।

সকল কথায়, সকল ব্যথায়,
কে মোরে হাসায়, কে মোরে কাঁদায়,
কাছে টেনে স্নেহ পরশ বুলায়
ভজরে মধুর মায়ের নাম।

আর কি মা পারি ভুলিতে তোরে,
বাঁধা যে পড়েছি তব কৃপা ডোরে,
করুণাধারা শিরে পড়িছে ঝরে
জপরে মধুর মায়ের নাম।।



মাতৃ-স্বরূপামৃত

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

— শ্রী প্রিয়ব্রত ভট্টাচার্য্য

মা গুরুপ্রিয়াদিদি ও অভয়ের সঙ্গে জামসেদপুর যাচ্ছিলেন। গাড়ীতে অভয় মাকে বলেছিল যে "মা আপনি যে নিজেকে ছিন্নমস্তার মূর্তিতে দেখিয়াছিলেন, দুইটা যোগিনী দুইধারে দেখিয়াছিলেন, তাহা কি আপনার শরীর হইতে ভিন্ন দেখিয়াছিলেন?" মা অভয়ের কথার সম্মতি জানিয়েছিলেন (শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী, সপ্তম ভাগ, পূর্বার্ধ)। গুরুপ্রিয়াদিদি আর একটু নির্দ্বন্দ হতে মাকে জিজ্ঞাসা করলেন যে প্রমথবাবু কি সেদিনই মার মধ্যে ছিন্নমস্তা দর্শন করেছিলেন। মা তাঁর আপন খেয়ালে ব্যক্ত করলেন যে গুরুপ্রিয়াদিদি যা বলেছেন তা'ই ঠিক। তারপর মার কাছ থেকে গুরুপ্রিয়াদিদি জানতে পারলেন যে প্রমথবাবুর চাপরাশি দশমূর্তি দেখেছিল। শুধু তাই নয়, অভয়ও তখন মার শ্রীমুখ থেকে জানতে পারল যে চাপরাশিটার সংস্কার ভাল ছিল।

একবার শশাঙ্ক মোহন মুখোপাধ্যায় মাকে নিয়ে ঢাকার ন্যাশনাল মেডিকেল স্কুলে গিয়েছিলেন। সেখানে কাঙালী ভোজন হচ্ছিল এবং কীর্ত্তন চলছিল। এই পরিবেশে মার মহাভাব প্রকাশিত হল। মার মধ্যে শশাঙ্কবাবু শ্যাম ও শ্যামা উভয়কে প্রত্যক্ষ করলেন। মহাকালী রূপে ক্ষণিকের জন্য দর্শন হল — কৃষ্ণবর্ণ রঙটাও মাতৃদেহে প্রত্যক্ষ হল। শশাঙ্ক মোহন মুখোপাধ্যায় কেঁদে কেঁদে আকুল হলেন। (স্বক্রিয় স্বরসামৃত, পঞ্চমভাগ) অখণ্ডানন্দ স্বামী বিশেষ এক স্থিতিতে প্রথমে শ্যাম ও শ্যামার ভাবরূপ মাতৃদেহে দেখেছেন। মায়ের এই যে মহাপ্রকাশ তা তাঁর খেয়ালেই ঘটেছিল। স্বামীজীর ভেতরের ইষ্টভাবের যে বহিঃপ্রকাশ মায়ের মহাভাব অবস্থায় প্রত্যক্ষ হ'ল তা মাতৃলীলার এক অপরূপ রূপায়ণ। একই ক্ষণে শ্যাম ও শ্যামার যে রূপ প্রত্যক্ষ করলেন অখণ্ডানন্দ স্বামী তার নানা সমর্থন শাস্ত্রে রয়েছে। মুণ্ডমালা তন্ত্র বলেছেন, "কৃষ্ণস্তু কালিকা সাক্ষাৎ" অর্থাৎ 'কৃষ্ণ সাক্ষাৎ কালী'। তাছাড়া তোড়ল তন্ত্র বলছেন, "স্বয়ং ভগবতী কালী কৃষ্ণমূর্ত্তি সমুদ্ভবা" অর্থাৎ "স্বয়ং ভগবতী কালীই কৃষ্ণমূর্তি'। মায়ের শরীরের মধ্যে অখণ্ডানন্দ স্বামীর মহাকালী ভাবটাও পূর্ণ প্রকাশ হয়ে যায় তখন।

মার্কণ্ডেয় পুরাণে মহাকালী দশভূজা, ত্রিনয়না ও দশাননা। তাঁর দশটি পদ। তিনি 'নীলাশ্মদ্যুতিম' অর্থাৎ তাঁর বর্ণ নীল পাথরের মত। অখণ্ডানন্দ স্বামী মহাকালীর কৃষ্ণরূপ দর্শন করেন মায়ের শরীরে। তাহলে প্রশ্ন ওঠে মহাকালী কৃষ্ণ বর্ণা হবেন কি করে? আসলে মহাকালী হলেন আদ্যাশক্তি, তিনি তামসী — ঋক্‌বেদ স্বরূপা! মহাকাল সংহিতায় মহাকালী স্তোত্রে বলা হয়েছে, "যদা নৈব ধাতা ন বিষ্ণুর্ন রুদ্রো ন কালো ন বা পঞ্চভূতা নি চাসন্। তদা কারণীভূতসত্বৈকমূর্তিঃ ত্বমেকা পরব্রহ্মরূপেণ সিদ্ধা।" (কর্পূরাদি স্তোত্রের ৯ শ্লোকের বিমলানন্দ স্বামীকৃত ব্যাখ্যা)। ব্রহ্মা বিষ্ণু রুদ্র যখন ছিলেন না, পঞ্চভূত কিছুই ছিল না, তখন পরব্রহ্মরূপিনী একমাত্র তুমিই সকলের কারণরূপে বিরাজমান ছিলে। মহাভারতে বর্ণনা করা হয়েছে সতীর ক্রোধ থেকে মহাভীমা মহাকালী আবির্ভূতা হন। বীরভদ্রের সঙ্গে তিনি দক্ষযজ্ঞ ধ্বংস করবার জন্য গমন করেন। তাঁকে আবার ভদ্রকালী বলা হয়েছে। "ভদ্রকালীতি বিখ্যাতা দেব্যাঃ কোপাদ্বিনিঃসৃতা" (মহাভারত, ১৪.২৮৩.৫৪)। কালিকাপুরাণ মহাকালীকে

বলেছেন, "ওঁ কালী কালী মহাকালী কালীকে পাপহারিণী। ধর্মার্থমোক্ষদে দেবী নারায়ণিনমোহস্তুতে"। — এখানে বলা হয়েছে যে কালীই মহাকালী, তিনিই দুর্গা, নারায়ণী। তিনি ধর্ম, অর্থ ও মোক্ষ প্রদান করেন। কৃষ্ণবর্ণা মহাকালী দক্ষিণাকালীর বা শ্যামা কালীর রূপভেদ বা একাত্মক। কালী বা মহাকালীর বর্ণ বিষয়ে মার্কণ্ডেয় পুরাণের মত কর্পূরাদিস্তোত্রের প্রথম শ্লোকে দেবীকে বলা হয়েছে, "ধ্বান্তধারাধররুচিরুচিরা' অর্থাৎ 'নীলমেঘের মত মনোজ্ঞা'। বিমলানন্দ স্বামী এর ব্যাখ্যায় লিখেছেন যে দেবী শুদ্ধ সত্ত্বগুণাত্মক ঘনীভূত তেজোময়ী এবং চিদাকাশ। তারজন্য দেবীর নীলবর্ণ ধ্যান করতে হয়। তবে এই নীলবর্ণ আসলে অসিত বা কৃষ্ণবর্ণ। বিমলানন্দ স্বামী তাঁর বক্তব্য সমর্থনে যোগবাশিষ্ঠ থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন যে কালী ও শিবের ব্যোমরূপ বলে তাঁদের দেহ অসিত। তাই যে ভাবে ভাবান্বিত হয়ে অখণ্ডানন্দ স্বামী মাতৃশরীরে মহাকালীর অসিতবর্ণ দর্শন করলেন তা শাস্ত্রসম্মত।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করতে হয় যে শশাঙ্কবাবু (অখণ্ডানন্দ স্বামী) মাকে মুণ্ডমালা গড়িয়ে দিয়েছেন। সোনার এই মুণ্ডমালা কণ্ঠে ধারণ করে মা মুণ্ডমালিনী হয়ে ছিলেন। মুণ্ডমালা সাধারণতঃ কালী এবং ছিন্নমস্তার গলায় শোভা পায়। কালীতন্ত্রে বলা হয়েছে "সর্বদেবময়ী সাক্ষাচ্ছব্দব্রহ্মস্বরূপিনী" — 'কালী সর্বদেবময়ী সাক্ষাৎ শব্দব্রহ্মস্বরূপিনী'। মুণ্ডমালা মাতৃকাবর্ণের প্রতীক। প্রতিটি বর্ণনই বীজমন্ত্র বা কোনো না কোনও দেবতার সূক্ষ্মরূপ। কালী থেকে সব দেবতা উদ্ভূত — এই তত্ত্বটি মার মুণ্ডমালিনী রূপে প্রকাশিত হয়। গুরুপ্রিয়া দিদির পিতা শশাঙ্কবাবু পরে অখণ্ডানন্দ স্বামী রূপে পরিচিত হন। তাঁর জীবনে মার নানা লীলা দেখবার এবং লীলারসে মগ্ন হবার সুযোগ ঘটেছে। মায়ের গলায় সোনার মুণ্ডমালা তিনি অন্তরের ভাবের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে পরিয়ে ছিলেন।

নারায়ণানন্দ তীর্থ মহারাজ মাকে একবার হাওয়া করছিলেন। এই সময় মায়ের 'ললাটে সিন্দুরের বড় ফোঁটার নীচে খুব উজ্জ্বল একটি অর্ধচন্দ্রাকৃতি সুন্দর রেখা' দেখতে পান। রেখাটি শুক্লপক্ষের পঞ্চমীর চন্দ্রের মত ছিল, প্রায় দুই তিন মিনিট পর্যন্ত ঐ উজ্জ্বল রেখাটি স্থির থেকে ক্রমশঃ মিলিয়ে যায়। তখন মার শ্রীমুখকমলখানি 'ভাস্বর' এবং 'দীপ্তিশালী' হয়ে উঠেছিল বলে স্বামী নারায়ণানন্দ তীর্থ মহারাজ বর্ণনা করেছেন। পরে সুযোগ পেয়ে তিনি মাকে এই অপরূপ দর্শনের কথা নিবেদন করেন। মা তাঁকে বলেছিলেন, — "যাহা দেখিয়াছ তাহা কাহারও কাছে বলিও না।" (সন্তান বৎসলা শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী, পৃঃ ১৫১)। স্বামী নারায়ণানন্দের দর্শনের স্বীকৃতি মা স্বয়ং প্রদান করেছেন। বৃহৎতন্ত্রসারে বলা হয়েছে কালীর "চন্দ্রার্দ্ধকৃতশেখরাম্" অর্থাৎ অর্ধচন্দ্র তাঁর শিরোভূষণ। নিত্যা শিবস্বরূপা অব্যয়া কালীর ললাটে অমৃতত্ব হেতু চন্দ্রকলা অঙ্কিত বলে মহানির্ব্বাণ তন্ত্র উল্লেখ করেছেন। দুর্গা ও ভদ্রকালী শশিভালী বা শশিশেখরা। ষোড়শীই শ্রীবিদ্যা, তিনিই কালী। শ্রীবিদ্যা হলেন কালীর সর্বোত্তমা পরব্রহ্মামূর্ত্তি — শুদ্ধসত্ত্বঘনীভূতমূর্ত্তি একমাত্র তাঁরই। শ্রীবিদ্যার ললাটে "কিঞ্চিদর্দ্ধেন্দুকুটিলললাটেমৃদুপট্টিকাম" অর্থাৎ তাঁর ললাটে শোভা পাচ্ছে ঈষদবঙ্কিমভাবে অর্ধেন্দু।' (বৃহৎতন্ত্রসার)। শশিশেখরা বলে বগলা ও মাতঙ্গীকেও তান্ত্রিক শ্রুতি প্রকাশ করেছেন। নারায়ণনন্দ স্বামীর ভাবেই মায়ের ভাবরূপ, তাঁর শশিভালী রূপ। কিন্তু শশিশেখরাকে প্রত্যক্ষ করেও স্বামীজীর যেন ভ্রম গেল না, তিনি নিজেই নিজেকে প্রশ্ন করলেন, "মা যে কে তাহা এইভাবে তাঁহার পরিচয় দিলেন কি?" (সন্তান বৎসলা শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী)। তিনি অবশ্য কনখলের নিবণীমঠের মোহন্ত শ্রীগিরিধর নারায়ণজীর শাকম্ভরীরূপে মাকে দর্শনের কথা প্রকাশ করেছেন। প্রমথনাথ বসুর

চাপরাশির ছিন্নমস্তারূপে মাকে প্রত্যক্ষ করার বিষয়ও উল্লেখ করেছেন। শ্রীদুর্গা রূপে বা শ্রীদুর্গার বিভিন্ন রূপে মাকে যাঁরা দর্শন করেছেন, সেকথাও বলেছেন। তাছাড়া মাকে লোলজিহ্বা দিগম্বরীরূপে শাহবাগে কেহ কেহ দর্শন করেছিলেন তারও কথা শশিভালী প্রসঙ্গে বর্ণনা করেছেন। নারায়ণানন্দস্বামী মায়ের মধ্যে যে শশিশেখরার দর্শন করেন তা শক্তিতন্ত্রের মতে রূপদর্শন। এ মার স্বরূপদর্শন নয়। তান্ত্রিক শ্রুতি বলেন যে শক্তিভালীর ললাটে চন্দ্রকলা থেকে অমৃত ক্ষরিত হয় এবং চন্দ্রকলা থেকে নিঃসৃত অমৃত সাধককে অমৃতত্ব বা মোক্ষপ্রদান করে।

মায়ের ভাবদেহ কখনও কখনও ভাবাবেশ প্রকাশ করত। কেন ভাবাবেশ প্রকাশ হত? তার উত্তরে একদিন মা ভাইজীকে বলেছিলেন — "তোরা ভাবাবেশের লক্ষণ দেখতে চাস্, তাই এ শরীরে কখনো কখনো তার প্রকাশ হইয়া পড়ে।" (মাতৃদর্শন)। ১৯২৯ ইংরেজীর ৩রা মে ভাবাবেশে তাঁর দিব্য দেহ থেকে একটি সূক্ত প্রকাশিত হয়। ভক্তদের মা এটি লিখে রাখবার অনুমতিপ্রদান করেন। মায়ের স্বতোদ্‌গত দেবভাষার সূক্তটিতে মা নিজেকে 'মহামায়া' বলে তাঁর স্বরূপ ব্যক্ত করেছেন। "ময়াহি সর্বং ময়াহি সর্বশরণং হে ... প্রণবশ্রুতকারণং মহামায় মহাভাবময়ময়হে।" মাতৃদর্শনে এর মর্মানুবাদ এভাবে করা হয়েছে ঃ আমাদ্বারাই সকল, আমাতেই সকল ভূতগণের প্রতিষ্ঠাভূমি। আমিই সেই প্রণবোপদিষ্ট কারণ, আমিই একাধারে মহামায়া এবং মহাভাবময়।

প্রাণতোষিণী তন্ত্রে বলা হয়েছে "ওঁ ধ্যায়েৎকালী মহামায়া" অর্থাৎ কালীকে মহামায়া রূপে ধ্যান করবে। দেবীভাগবতে মহামায়াকে বলেছেন, "মায়েশ্বরীং ভগবতীং সচ্চিদানন্দরূপিণীম্" অর্থাৎ মহামায়া মায়েশ্বরী, তিনি সচ্চিদানন্দরূপিণী। "চিতিরূপা মহামায়া পরং ব্রহ্মস্বরূপিণী। সেবকানুগ্রহার্থায় নানা রূপং দধরি সা" (দেব্যাগম তন্ত্রতত্ত্ব) — অর্থাৎ চিৎস্বরূপা, সেবকদের অনুগ্রহ করবার জন্য নানা রূপ ধারণ করেন। মহামায়া কাত্যায়নী, তিনি "মহাযোগিন্যধীশ্বরি" (শ্রীমদ্ভাগবতম্) অর্থাৎ 'অঘটন ঘটন পটীয়সী সর্বেশ্বরী।' দুর্গা সপ্তশতীতে তিনি মহালক্ষ্মী, মহাসরস্বতী এবং মহাকালী রূপে প্রকাশিতা। তান্ত্রিক শ্রুতি বলেন যে কালীমন্ত্র সাধনায় যখন চরম অবস্থা, তখন অরূপা মহামায়ার উপলব্ধি হয়। মাতৃসূক্তে মহামায়া রূপে যে ভাবের প্রকাশ ভক্তগণ শুনতে পেয়েছেন, তা আসলে মহামায়া ভক্তদেরই ভাব — বিশেষ কোনভাবে তো মা নেই — ভাবের সীমায় তাঁকে আটকানো যায় না। তাঁর মন ও অভাব নেই। অলৌকিকভাবে কাউকে তিনি কালীরূপে দর্শন দেননি। তবে ভক্তগণ তাঁর যে কালীরূপ দেখেছেন তাতে সন্দেহ নেই। তাহলে কিভাবে দর্শন হল? এই প্রসঙ্গে ভাবাদি ভক্তদের ভাবের কথাই মার শ্রীমুখ থেকে প্রকাশিত হয়েছিল — "তোমরা যে ভাবটা নিকটে আনিয়া উপস্থিত কর তখন এই শরীরটা তদ্‌ভাবাপন্নই দেখায় ও বলে। সেই সেই ভাবের পূর্ণ প্রকাশ যেন শরীরের মধ্যে হইয়া যায়।" (আনন্দবার্তা, ১ম সংখ্যা, ১৯৮৭)।

(ক্রমশঃ)



সমকালীন দৃষ্টিতে মা আনন্দময়ী

(চার)

— ড. নিরঞ্জন চক্রবর্ত্তী

বিংশ শতাব্দীর ভারতীয় ধর্ম-সাধনার ইতি-চিন্তনে পরমহংস শ্রীশ্রী যোগানন্দজী একটি পুণ্য নাম। ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দের ৫ ই জানুয়ারী। ১৯৫২ সালের ৭ ই মার্চ তারিখে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়া প্রদেশস্থ লস্ এঞ্জেলস্ সহরে ভারতীয় রাষ্ট্রদূত শ্রীবিনয় রঞ্জন সেন মহাশয়ের সম্বর্দ্ধনায় আহূত এক ভোজসভায় বক্তৃতা দেবার পর মহাসমাধিতে লীন হন।' এই অল্প জীবনকালের মধ্যেই ভারতীয় সাধনার গুহ্য ধারার সম্প্রসারণে তাঁর সাধনা বিশ্বকে সানন্দ বিস্ময়ে অভিভূত করেছে। এযুগে যদি কোন একটি মাত্র ধর্মগ্রন্থ সারাবিশ্বে স্বতোৎসারিত অভিনন্দন লাভ করে থাকে তবে তা শ্রীশ্রী যোগানন্দের Autobiography of a Yogi গ্রন্থটি। চল্লিশটির বেশী ভাষায় অনূদিত হয়েছে মহাযোগীর এই আত্মজীবনী। এই আত্মজীবনীর আধারে পরিবেশিত হয়েছে যুগ যুগ বাহিত আত্মচেতনার এক অখণ্ড উপলব্ধি। এই ধারারই সম্প্রসারণে বহু যোগী তাঁদের সাধনা লোক-কল্যাণে নিয়োজিত করেছেন। বিশুদ্ধানন্দ পরমহংস, গোস্বামী বিজয় কৃষ্ণ, রামঠাকুর প্রভৃতি আরও অনেক মহাত্মাগণের পুণ্য নাম এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। ভারতীয় ধর্মজগতের দুর্বিরীক্ষ নিয়ন্ত্রক রূপ বাবাজী মহারাজ চিরপূজ্য। তাঁরই প্রদর্শিত পথে যোগী শ্যামাচরণ লাহিড়ী, স্বামী যুক্তেশ্বরানন্দ গিরিজী এবং পরমহংস যোগানন্দ এই সাধনার ধারাকে গতিযুক্ত করেছেন। যোগানন্দ স্থাপন করেছেন 'যোগদা সৎসঙ্গ সোসাইটি অব ইণ্ডিয়া'। "১৯১৬ সালে পরমহংস যোগানন্দজী যখন বিশ্বশক্তি উৎস হতে মানব শরীরে শক্তি সঞ্চারিত করবার প্রণালী আবিষ্কার করলেন, তখন "যোগদা" কথাটির সৃষ্টি। (যোগ + দা = যা যোগ প্রদান করে। সৎসঙ্গ — সৎ + অনুশীলন)।" যোগানন্দের মুখ্য কর্মভূমি ছিল আমেরিকা। স্বামী বিবেকানন্দ এবং স্বামী অভেদানন্দের পর পরমহংস যোগানন্দ জয় করেছেন আমেরিকা তথা সমগ্র বিশ্ব তাঁর আত্মজীবনী রচনার মাধ্যমে এবং তাঁর প্রদত্ত অপূর্ব ভাষণাবলীতে। বিদেশের বিদ্বৎ-সমাজ এই গ্রন্থকে বরণ করেছে হৃদয়ের অর্ঘ্যে। "There has been nothing before, written in English or any other European language, like this presentation of yoga." প্রখ্যাত প্রাচ্যবিদ্যাবিদ্ W. Y. Evans-Wentz উচ্ছ্বসিত হয়েছেন এই মহান গ্রন্থ সম্পর্কে। "Autobiography of a Yogi is, indeed, a book for the ages."

আমেরিকা থেকে দ্বিতীয়বার ভারতবর্ষে এসেছেন যোগানন্দজী ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দের ২২ শে আগষ্ট। প্রথম এলেন বোম্বাইতে। তারপর অবশেষে তাঁর পুণ্য তীর্থ কলকাতায় যেখানে তখনও তাঁর বৃদ্ধ পিতা অবস্থান করছিলেন এবং শ্রীরামপুর যেখানে তাঁর গুরুদেব শ্রীযুক্ত যুক্তেশ্বরানন্দ গিরিজী তখন মর্ত্যলীলায় ছেদ টানেন নি। পরমপ্রিয় শিষ্যের সঙ্গে পুনর্মিলনের জন্যই যেন তিনি অপেক্ষারত ছিলেন। ভারতীয় জীবন মঞ্চের কাজ প্রায় সেরে নিচ্ছেন। তখনই এই পুণ্যভূমিতে যাঁর দর্শন তখনও তাঁর হয়নি, সেই করুণারূপিনী জগজ্জননী মা আনন্দময়ীর

পুণ্যকথা। তিনি এলেন মাতৃ-সন্নিধানে। তাঁর অমৃত কথনের মাধ্যমেই এই প্রসঙ্গের স্বরূপ অনুভবগম্য।

"আমার ভাইঝি অমিয়া বসু একদিন আমায় বলল, "নির্মলা দেবীকে না দেখে আপনি ভারতবর্ষ ত্যাগ করে যাবেন না। তাঁর ভগবদ্ভক্তি অতীব গভীর আর 'আনন্দময়ী মা' বলেই তিনি সকলের কাছে পরিচিতা।" চোখে মুখে ফুটে উঠল তার গভীর আকূতি।

বললুম, "নিশ্চয়ই, দেখে যাব বই কি। তাঁর ঈশ্বরভাবের উচ্চাবস্থার কথা সব আমি পড়েছি। আমারও তাঁকে দেখতে বড়ই ইচ্ছে আছে। বছর কতক আগে ইষ্ট-ওয়েষ্ট পত্রিকায় তাঁর বিষয়ে একটি ছোট প্রবন্ধও বেরিয়েছিল।"

অমিয়া বলতে লাগল, "আমি তাঁকে দর্শন করেছি। আমরা যেখানে থাকি, সেই জামসেদপুর সহরে সম্প্রতি তিনি এসেছিলেন। একবার এক ভক্তর অনুরোধে আনন্দময়ী মা একটি মরণাপন্ন লোকের বাড়ীতে যান। তার মৃত্যুশয্যার পাশে দাঁড়িয়ে লোকটির কপালে হাত বুলিয়ে দিতেই তার মৃত্যু যন্ত্রণা সব থেমে গেল। রোগও সঙ্গে সঙ্গে অন্তর্হিত হল; আনন্দে, বিস্ময়ে লোকটি দেখলে যে সে একেবারে নিরাময় হয়ে গেছে।"

দিনকতক বাদে শুনতে পেলাম, আনন্দময়ী মা কলকাতার ভবানীপুর অঞ্চলে তাঁর এক ভক্তর বাড়ীতে অবস্থান করছেন। রাইট সাহেব আর আমি, দুজনে মিলে আমাদের কলকাতার বাড়ী থেকে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়লুম। ভবানীপুরের সেই বাড়ীটির কাছে আমাদের ফোর্ড গাড়ী পৌঁছতে রাইট সাহেব আর আমি রাস্তার উপর একটা অদ্ভুত দৃশ্য প্রত্যক্ষ করলাম।

আনন্দময়ী মা একটা হুডখোলা মোটর গাড়ীতে দাঁড়িয়ে, প্রায় শতখানেক ভক্ত তাঁকে ঘিরে রয়েছে — দেখে বোধ হল কোথাও যাবার জন্যে হয়ত বেরোচ্ছেন। রাইট সাহেব ফোর্ড গাড়ীটাকে কিছু দূরে রেখে আমার সঙ্গে সঙ্গে হেঁটে সেই নীরব জনতার দিকে এগিয়ে চলল। আনন্দময়ী মা আমাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করামাত্রই গাড়ী থেকে নেমে আমাদের দিকে এগিয়ে এলেন।

"বাবা, এসেছ!" আবেগভরে এই কথাটি বলে এক হাত দিয়ে তিনি আমার কাঁধের ওপর তাঁর মাথাটি রাখলেন। রাইট সাহেবকে একটু আগেই বলেছি — আমি এঁকে বিশেষ চিনি না — কাজেই এই রকম অসাধারণ অভ্যর্থনার দৃশ্য দেখে সে বেচারা অবাক হয়েই তাকিয়ে রইল। আর সেই শতখানেক ভক্ত — তারাও অবাক বিস্ময়ে এই স্নেহসিক্ত দৃশ্যাবলী স্থির হয়ে দেখতে লাগল।

সঙ্গে সঙ্গে আমি টের পেলুম যে তখন তিনি সমাধির খুব উচ্চাবস্থায় রয়েছেন। বাইরে নারীর ছদ্মবেশে সম্পূর্ণ বিস্মৃত হয়ে তিনি নিজেকে জানতে পেরেছিলেন যে তিনি শাশ্বত আত্মা; সেই স্তর থেকে তিনি আর একজন ঈশ্বরভক্তকে সানন্দে অভ্যর্থনাজ্ঞাপন করছেন। হাত ধরে তিনি তাঁর গাড়ীর কাছে আমায় নিয়ে গেলেন।

আমি একটু প্রতিবাদের সুরে বললুম, "আমি আপনার বেরোন তো দেরী করিয়ে দিচ্ছি।"

তিনি বললেন, "বাবা আজ এই প্রথম দেখছি — যুগযুগান্তর পরে। এখুনি আর চলে যাবে না।"

গাড়ীর পিছন দিকের আসনে আমরা দুজনে বসলুম। সঙ্গে সঙ্গে আনন্দময়ী মা যেন সমাধিতে মগ্ন হয়ে পড়লেন, — শরীর স্থির, নিশ্চল, স্থাণুবৎ। সুন্দর দুটি চক্ষু তাঁর আকাশের দিকে অর্ধোন্মীলিত, দৃষ্টি স্থির হয়ে এসে নিবদ্ধ হল নিকট-সুদূর অন্তরের স্বর্গরাজ্যে। ভক্তবর্গ শান্ত ও মৃদুস্বরে বলে উঠল — "আনন্দময়ী মাঈ কি জয়।"

ভারতবর্ষে আমি বহু মহাপুরুষদের সাক্ষাৎ পেয়েছি, কিন্তু এরূপ উচ্চাবস্থার সাধিকার দর্শনলাভ আমার আগে কখনও ঘটে নি। তাঁর শান্ত, স্নিগ্ধ মুখশ্রী আনন্দে উজ্জ্বল, তাতে করেই তাঁর নাম হয়েছে "আনন্দময়ী মা"। সুদীর্ঘ ঘন কৃষ্ণকেশপাশ অবগুণ্ঠনহীন মস্তকের পিছনে লুটিয়ে পড়েছে, কপালে রক্তচন্দনের ফোঁটা — তৃতীয় নেত্রের প্রতীক, তার আধ্যাত্মিক দৃষ্টি অন্তরে তাঁর সদা জাগ্রত। ছোট্ট মুখখানি, ছোট্ট দুটি হাত আর ছোট্ট দুটি পা — তাঁর আধ্যাত্মিক বিরাটত্বের সঙ্গে কি অদ্ভুত বৈসাদৃশ্য।

আনন্দময়ী মা ঐ অবস্থায় থাকাকালীন আমি নিকটস্থ একটি ভক্তকে কতকগুলি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলুম।

তিনি বললেন, "আনন্দময়ী মা ভারতের বহুস্থানেই ভ্রমণ করেন; নানা জায়গায় তাঁর শতশত ভক্ত আছে। তাঁদের প্রচেষ্টার ফলে নানা প্রয়োজনীয় সামাজিক উন্নতি সাধিত হয়েছে। ওনার সুখস্বাচ্ছন্দ্য দেখবার জন্যে আমাদের একটি দল সর্বদাই ওঁর সঙ্গে সঙ্গে ভ্রমণ করে। মায়ের মত যত্ন নিয়ে ওঁকে আমাদের সর্বদা দেখাশোনা করতে হয়, কারণ উনি দেহের দিকে মোটেই ভ্রূক্ষেপ করেন না। কেউ যদি না ওঁকে খেতে দেয় তো খানই না, বা তার কোন খোঁজও করেন না। খাবার সামনে ধরে দিলেও, তা পর্যন্ত উনি ছোঁন না। এই রকম না খেয়ে খেয়ে শেষ পর্যন্ত উনি যদি দেহত্যাগই করে বসেন, সেই ভয়ে আমরা, ওঁর ভক্তরা, ওনাকে নিজের হাতে খাইয়ে দেই। দিনের পর দিন ধরে উনি সমাধি অবস্থায় থাকেন, নিশ্বাস পড়ে কি না সন্দেহ, দৃষ্টি তখন থাকে একেবারে নিষ্পলক, স্থির। ওঁর প্রধান ভক্তদের মধ্যে একজন হচ্ছেন ওঁর স্বামী। বহুবছর আগে ওঁদের বিবাহ হবার অল্পকাল পরেই তিনি মৌনব্রত অবলম্বন করেন।"

একটি ভদ্রলোককে তিনি দেখিয়ে দিলেন; বেশ চওড়া কাঁধ, আকৃতিও বেশ সুন্দর, লম্বা চুল আর শাদা দাড়ি। ভদ্রলোকটি নীরবে জনতার মধ্যে দাঁড়িয়ে ছিলেন করজোড়ে — শিষ্যের ভক্তিনত ভাবে।

ব্রহ্মানন্দসাগরে অবগাহন করে আনন্দময়ী মা এখন যেন জড়জগতে ফিরে এলেন।

"বাবা, বল এখন কোথায় থাক?" তাঁর স্বর অতি পরিষ্কার, যেন সঙ্গীতের মধুর ঝঙ্কার।

"বর্ত[illegible] কলকাতা কিম্বা রাঁচি, কিন্তু শীগগিরই অ্যামেরিকায় ফিরে যাচ্ছি।"

"অ্যামেরিকা?"

"হ্যাঁ; সেখানকার ধর্মপিপাসু লোকেরা আপনার মত ভারতীয় সাধিকাকে দেখলে নিশ্চয়ই আন্তরিকভাবে শ্রদ্ধা করবে — যাবেন আপনি?"

"বাবা নিয়ে গেলেই যাব।"

উত্তর শুনে তো সেখানকার সব সভয়ে চমকে উঠলেন।

একজন তার মধ্যে এগিয়ে এসে আমাকে দৃঢ়স্বরে বললেন, "শুনুন, আমাদের মধ্যে এই জনকুড়ি কি তারও বেশী আমরা আনন্দময়ী মায়ের সঙ্গে সঙ্গে সর্বদাই ভ্রমণ করি। ওঁকে ছেড়ে আমরা কোথাও থাকতে পারব না। উনি যেখানে যাবেন আমরাও সেখানে যাব, বুঝলেন?"

নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও মতলবটি ছাড়তে হল, — দেখলুম যে এ একেবারে অসম্ভব, কারণ শুধু শুধু দল বেজায় ভারি হয়ে যায়।

বিদায় নিয়ে বললুম, "অন্ততঃ রাঁচিতে তো আসুন, আপনার ভক্তদের নিয়ে। আমার রাঁচি বিদ্যালয়ের শিশুদের দেখেও ভারি আনন্দ পাবেন।"

"বাবা আমায় যখনই নিয়ে যাবে, তখনই যাব।"

অল্প কিছুদিন পরেই আনন্দময়ী মা'র রাঁচি বিদ্যালয়ে প্রতিশ্রুত আগমনের কথা শোনা গেল। ছেলেরা তাঁর আগমন উপলক্ষ্যে বিদ্যালয়বাটি ও প্রাঙ্গণ উৎসবের বেশে সুসজ্জিত করে তুলল। তাদের আনন্দ তখন দেখে কে! কত কি হবে। তারা তো যে কোন উপলক্ষ্যে একটা উৎসবের দিন চায়, পড়াশোনার হাঙ্গামা নেই, গান, সর্বোপরি ভুরিভোজন, — স্ফূর্তির চূড়ান্ত।

যে দিন তিনি এসে পৌঁছলেন, গেটের কাছে ছেলেরা চিৎকার করে অভ্যর্থনা জানালে, — "জয়! আনন্দময়ী মাই কি জয়!" করতাল, শঙ্খধ্বনি আর মৃদঙ্গবাদ্যের সঙ্গে সঙ্গে গাঁদাফুলের বৃষ্টি! আনন্দময়ী মা রৌদ্রকরোজ্জ্বল বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে হাস্যমুখে চতুর্দিক পরিভ্রমণ করে বেড়াতে লাগলেন — যেন স্বর্গের একটি সচল দেবী প্রতিমা।

প্রধানগৃহ যেটি সেখানে আমি তাঁকে নিয়ে যেতে আনন্দময়ী মা সানন্দে বলে উঠলেন, "এ জায়গাটি যে ভারি সুন্দর।" শিশুসুলভ সরল হাসি হেসে তিনি আমার পাশেই বসে পড়লেন। তাঁকে পেয়ে লোকের মনে হয় যেন তিনি আপনা হতেও আপন, অথচ একটা দূরত্বের আভাস যেন সর্বদা তাঁকে ঘিরে রয়েছে — সর্বব্যাপিত্বের একি রহস্যময় স্বাতন্ত্র্য!

বললুম, "আপনার জীবন সম্বন্ধে কিছু বলুন।"

"বাবা তো সবই জানে, তবে আবার বলা কেন?" হয়ত তিনি মনে করেছিলেন যে একটা জন্মের ঘটনার ক্ষুদ্র ইতিহাস সে আর ধর্তব্যের মধ্যেই নয়, তা আবার বলবে কি!

একটু হেসে সবিনয়ে আমি আবার একবার অনুরোধ করলুম। কি আর করেন সুন্দর সুঠাম হস্ত প্রসারিত করে বললেন, "বাবা, বলবার আর কি আছে, কিছুই নেই। এই পৃথিবীতে আসবার আগে, বাবা, 'আমি * সেই একই ছিলুম'। ছোট্ট একটি মেয়ে যখন ছিলুম তখনও 'আমি সেই', নারীত্বে পৌঁছে তখনও 'আমি সেই'। যে পরিবারের মধ্যে জন্মেছিলুম — তাঁরা যখন এই দেহটার বিবাহ দিতে চাইল তখনও 'আমি সেই'। আর বাবা এখন তোমার সামনেও 'আমি সেই একই আছি'। আর এই অনন্তের কোলে সৃষ্টির লীলা যতই চলুক, নিত্যকালের জন্যে 'আমি সেই একই থাকব'।"

তারপর আনন্দময়ী মা যেন গভীর ধ্যানের মধ্যে ডুবে গেলেন। দেহ তাঁর মর্মর প্রতিমার মত নিথর, নিস্পন্দ। মন যেন কার ডাকে কোন সুদূরে উধাও হয়ে ছুটে চলেছে; গভীর কালো চোখদুটি যেন কাঁচের মত প্রাণহীন, নিষ্প্রভ। সাধুসন্তরা যখন জড়দেহ হতে তাঁদের চৈতন্য অপসারিত করেন, তখন প্রায়ই তাঁদের এই রকম ভাব দেখা যায়। সে সময় বোধ হয় দেহটা যেন একটা নিষ্প্রাণ মাটির পুতুলের মত। ঘন্টাখানেক ধরে দুজনেই আমরা তখন ধ্যানানন্দে মগ্ন হয়ে রইলুম। সে যে কী আনন্দ! ছোট্ট একটি উচ্ছ্বসিত হাসিতে টের পেলুম — আনন্দময়ী মার সম্বিৎ ফিরে এসেছে।

বললুম, "আনন্দময়ী মা, দয়া করে আমার সঙ্গে বাগানে আসুন। রাইট সাহেব গোটাকতক ছবি নেবেন।"

"আচ্ছা বেশ বাবা, তোমার ইচ্ছাই আমার ইচ্ছা।" অনেকগুলো ছবি তোলা হল — ভক্তির দীপ্তিতে উদ্ভাসিত তাঁর নয়নযুগলে তখনও সেই দিব্যজ্যোতিঃ অপরিবর্তিত।

তারপর এল ভোজের পালা। আনন্দময়ী মা কম্বলাসনে বসলেন। একজন ভক্ত মেয়ে পাশে বসে তাঁকে খাওয়াতে লাগলেন। আনন্দময়ী মার মুখে খাবার তুলে দিতে ঠিক ছোট্ট শিশুটিরই মত শান্তভাবে খেতে লাগলেন। খেতে খেতে দেখা গেল যে খেয়েই যাচ্ছেন — তরকারী আর মিষ্টিতে যে স্বাদের কোন পার্থক্য আছে আনন্দময়ী মার কাছে তার কোন প্রকার বোধ কিছু মাত্র নেই!

সন্ধ্যা হয়ে এল — আনন্দময়ী মা তাঁর ভক্তদের সঙ্গে নিয়ে আশ্রম থেকে বিদায় গ্রহণ করলেন; যাবার সময় আর একদফা তাঁদের উপর সেই রকম গোলাপ ফুলের পাপড়িবৃষ্টি; তিনিও ছেলেদের হাত তুলে আশীর্বাদ করতে লাগলেন। স্বতঃউৎসারিত ভক্তির উচ্ছ্বাসে ছেলেদের মুখ উজ্জ্বল। তাদের সে এক কী আনন্দের দিন!

* আনন্দময়ী মা নিজের বিষয়ে "আমি" বলে উল্লেখ করেন না। তিনি পরোক্ষ উক্তি করেন, যেমন, — "এই দেহটা", "এই ছোট্ট মেয়েটি", "আপনার কন্যা" ইত্যাদি। কাকেও তাঁর "শিষ্য" বলেও উল্লেখ করেন না। নৈর্ব্যক্তিকভাবে তিনি সকল ব্যক্তিরই উপর জগজ্জননীর প্রেম বিতরণ করেন।

যীশুখ্রীষ্ট ঘোষণা করেছেন, "তুমি তোমার প্রভু ঈশ্বরকে ভালবাসবে তোমার সকল অন্তঃকরণ, সকল আত্মা, সকল মন আর সকল শক্তি দিয়ে; এই হচ্ছে আমার প্রথম আজ্ঞা।"১.

আনন্দময়ী মা আপনভোলা শিশুর মত মানব জীবনের একমাত্র সমস্যার সমাধান করেছেন — সেটা হচ্ছে ভগবানের সঙ্গে একত্ব। লক্ষকোটি সাংসারিক তুচ্ছ ব্যাপারে মানুষ আজ এই একমাত্র সহজ সরল সত্যটা একেবারে ভুলে গেছে; এক ও অদ্বিতীয় ভগবানের প্রতি প্রেম অস্বীকার করে জাতিসকল বাহ্যিক মানবহিতৈষণার প্রতি উৎকট নিষ্ঠা প্রদর্শন করে তাদের নাস্তিকতা লুকোবার চেষ্টা করে। অবশ্য এইসব মানবকল্যাণকর প্রচেষ্টাগুলি সৎ, — কারণ তারা মানুষের মন সাময়িকভাবে তাদের নিজেদের কাছ থেকে সরিয়ে দেয়, কিন্তু যীশুখ্রীষ্ট তাঁর "প্রথম আজ্ঞা"য় যা বলেছেন, জীবনের সেই একমাত্র দায়িত্ব থেকে তা আর মানুষকে মুক্ত করে না। ঈশ্বরকে ভালবাসার যে উন্নতিসাধক কর্তব্য, তা তার একমাত্র দাতার ২. মুক্তহস্তের দান — প্রথম শ্বাসগ্রহণের সঙ্গে সঙ্গেই এসে পড়ে।

রাঁচিতে যাওয়ার পর আর একবার আনন্দময়ী মায়ের সঙ্গে দেখা হয়েছিল; শ্রীরামপুর স্টেশনে গাড়ির জন্যে তখন তিনি অপেক্ষা করছিলেন।

তিনি বললেন, "বাবা, আমি পাহাড়ে যাচ্ছি; কয়েক জন মিলে দেরাদুনে একটি আশ্রম তৈরী করে দিয়েছে।"

গাড়ীতে চড়লেন ... দেখে অবাক হয়ে গেলুম যে, কি ভিড়ের মধ্যে, কি ট্রেনে, কি ভোজনে, কি নীরবে ধ্যানে বসে — কোন উপলক্ষ্যেই তাঁর দৃষ্টি ঈশ্বর থেকে কখনও লক্ষ্যচ্যুত নয়। অন্তরের মধ্যে এখনও সেই অপরিসীম মধুমাখা বাণীর প্রতিধ্বনি শুনি —

"এখন আর সর্বদাই সেই একের সঙ্গে এক হয়ে 'আমি চিরকাল সেই একই আছি।'।"

পরমহংস যোগানন্দের ঈশ্বর-চেতনায় মূর্ত হয়েছে মায়ের অমূর্ত বক্তব্য রূপের। স্বামী যোগানন্দের যোগদা সৎসঙ্গের সঙ্গে মায়ের স্নেহ-মধুর সম্পর্ক অচ্ছেদ্য। তাঁর প্রিয় শিষ্যা শ্রীদয়ামাতা তাঁর গুরুর দীপশিখাটি আজও প্রোজ্জ্বল করে রেখেছেন। যোগানন্দের 'যোগিকথামৃত' ব্যতীত আরও দুটি গ্রন্থের নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য 'Man's Eternal Quest' এবং 'The Divine Romance' নামধেয় গ্রন্থদ্বয় চয়ন এবং প্রকাশকের জন্য বিশ্বের ধর্মপিপাসু ব্যক্তিদের ঋণী করেছেন শ্রীমতী দয়ামাতা। এই দুটি গ্রন্থই পরমহংসজীর প্রদত্ত ভাষণাবলী।

১. মার্ক ১২ ঃ ৩০ (বাইবেল)

২. "অনেকেই একটি নূতন এবং উন্নততর জগৎ সৃষ্টি করার জন্য মনে মনে উন্মুখ হয়ে ওঠে। কিন্তু এরূপ চিন্তার জগৎ রচনা করার পরিবর্তে তোমরা তাঁরই ধ্যানে নিয়োজিত হও যাঁর কাছ থেকে পরিপূর্ণ শান্তিলাভের প্রত্যাশা করা যায়। মানুষের প্রধান কর্তব্য হচ্ছে ঈশ্বরের বা সত্যের সন্ধানে রত হওয়া।" — আনন্দময়ী মা।

শ্রীদয়ামাতা কীভাবে পরমহংসজীর ভাবধারায় অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন তার মধুর-উজ্জ্বল প্রকাশ চিত্তগ্রাহী।

'The first time I beheld Sri Sri Paramahansa Yogananda, he was speaking before a vast, enraptured audience in Salt Lake City. The year was 1931. As I stood at the back of the crowded auditorium, I became transfixed, unaware of anything around one, except the speaker and his words. My whole being was absorbed in the wisdom and divine love that were pouring into my soul and flooding my heart and mind. I could only think, This man loves God as I have always longed to love Him. He knows God. Him I shall follow. And from that moment, I did" (Preface xi, The Divine Romance, 8th impression, 1997).

গুরুচরণে নিবেদিতপ্রাণা শ্রীমতী দয়ামাতা আজও গুরু নির্দেশিত পথে অগণিত ধর্মপিপাসুকে সঙ্ঘমাতারূপে পথ প্রদর্শনের কাজে চিরজাগ্রত রয়েছেন। যখনই সুযোগ পেয়েছেন তখনই মা আনন্দময়ীর কাছে ছুটে এসেছেন প্রণতির অর্ঘ্যে। হৃষীকেশে রামনগরে গঙ্গার তটে অগণিত সাধুগণের উপস্থিতিতে বিশেষ সংযম সপ্তাহ পালিত হয় ১৫ ই থেকে ২২ শে এপ্রিল ১৯৫৯ খৃষ্টাব্দে। শ্রীদয়ামাতা এই অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছিলেন। ১৯৬১ খৃষ্টাব্দের ১৫ ই থেকে ২০ শে অক্টোবর জয়পুরিয়াজীর আমন্ত্রণে কানপুরে মাতৃ-সকাশে শ্রীশ্রী দুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীদয়ামাতা এই অনুষ্ঠানেও নিজেকে যুক্ত করেছিলেন। মায়ের সঙ্গে এই সাধিকার স্নেহমধুর সম্পর্কের প্রকাশ চির-উজ্জ্বল।



শ্রীমুখে শ্রীশ্রী মায়ের শ্রীজীবন

— শ্রী অরুণ সেনগু

শ্রীশ্রী আনন্দময়ী মা বলছেন, "এই শরীর আবির্ভাব হওয়ার পূর্বেই বাবা গৃহত্যাগ করিয়াছিল। কয়েকদি গেরুয়া বসনও নাকি পরিয়াছিল। হরিসংকীর্তনে সময় কাটাইত। তার এই বৈরাগ্য ভাবের সময়েই এই শরীরে আবির্ভাব হয়।" (মায়ের কথায় মা ঃ সমর্পিতা — পৃঃ৫)

শ্রীশ্রী মা নিজের ছেলেবেলার কথা বলছেন, "প্রায় আড়াই বছর বয়সে এই শরীর একবার মামা বাড়ী যায় পাশের বাড়ীতে রাত্রে কীর্ত্তন হয়। এ শরীরকে কোলে করিয়া মা সেখানে যায় এবং এক জায়গায় বসাইয়া বলে কীর্তন দেখ, শোন। মা বাবা যখন যে কথাটি বলিত ঠিক তাহাই করিতাম। সেদিন মার কথামত কীর্তনের দিকে চাহিয়া আছি। শুনিতেছি বটে। কিন্তু মাঝে মাঝে শরীর ঢলিয়া পড়িতেছে। মা কীর্তন শুনিতে বলিতেছে, কি বাস্তবিক শুনিলে যেমন ভাব হয় তেমনি হইয়া যাইতে ছিল। মা ভাবিল, বুঝি ঝিমাইতেছি। তাই বারে বারে ধাক্কাইয়া বসাইয়া দেয় আর বলে সকল ছেলে মেয়েরা বসিয়া আছে। আর ওর কেবল ঘুম। এত চিৎকার, এ খোল-করতালের আওয়াজ। এটার ঘুমই ভাঙ্গো দেখি। এদিকে এ শরীর তো অবশ। কীর্তনের সঙ্গে যেন মিশি রহিয়াছে। কীর্তন শেষ হইয়া গেলে ঘরে আসিয়া মা শোয়াইয়া রাখিল। পরদিন সকালে যখন ডাকিয়া উঠাইল তখনও এই শরীরের ঢুলুঢুলু ভাব। মা ভাবিল রাত্রি জাগরণে বা কিসে এইরূপ হইয়াছে।" (ঐ পৃঃ৭)

শ্রীশ্রী মা ভক্তদের বলছেন, "একটা সময় গিয়াছে, এ জাতীয়টাও ছিল না। তবে জানিয়ো ঐটা যেমন, এ ঠিক তেমনই এ শরীরের কাছে। তবে ঐ ভাবাদি কিন্তু অজ্ঞানের জীবত্বের মধ্যে আবেশ ভাবাদি নয়। ভাবে প্রকাশ অপ্রকাশ দুইটিই জানিয়ো, ঐ খেলায় যখন যা হইয়া যায়। বাবা তুমিই তো আমি, আবার আমিও তুমিও আবার দেখ, আমি তুমির প্রশ্ন নাই, যে যা বল তাই, কোন গোলমাল নাই। কর্মেরও বাধ্য নাই, অকর্মেরও বাঁধ নাই। নিষ্কাম কর্ম, কর্ম ত্যাগ- এর কোন বাঁধন যেখানে নাই। নাইটাও নাই কিন্তু। তোমাদের এলোমেলো মেয়ে আর কি !" (স্বক্রিয় স্বরসামৃত, ৫ম ভাগ, পৃ — ৭৮)

শ্রীশ্রীমা কোন বই পড়তেন না। তবু একবার একখানা বই পড়তে গিয়ে তাঁর কি অভিজ্ঞতা হয়েছিল তা জানিয়েছেন। একদিন মা ঊষাদির বাড়ীতে গেছেন। সে একখানা বই পড়ছিল। মা ইশারায় জিজ্ঞাসা করিলেন "কি বই?" সে বলিল, "মহাভারত, তুমি পড়বে?" একখণ্ড মার হাতে দিল। তাহা লইয়া মা চলিয়া আসিলেন মার পুস্তকাদি পড়ার অভ্যাসও ছিল না। সে দিকে খেয়ালও যাইত না। একবার ভোলানাথ একখানি বই দিয়াছিলেন মার ভোলানাথের বাড়ী যাওয়ার পরে। থামিয়া থামিয়া মা উহার কয়েক পাতা পড়িয়াছিলেন। এই কারণে এবং সরল ভাষাও বোধগম্য প্রকাশ নয় দেখিয়া ভোলানাথ আর পুস্তক বিশেষ কিনিয়াও দেন নাই। মাকে পড়ার কথাও বলেন নাই। সেদিন ঊষা দিদির নিকট হইতে মহাভারতখানি খুলিয়া পড়িতে বসিয়া মা দেখেন, অক্ষরে দৃষ্টি পড়িলে কণ্ঠের বীজমন্ত্রটি বন্ধ হইয়া যায়। আর যখন বীজমন্ত্রটির দিকে খেয়াল যায়, তখন অক্ষর দেখিলেও ঐ গুলি কি বা পড়াও যায় না। অক্ষরে আবার চোখ পড়িলেই শ্বাসও বন্ধ হইয়া আসিত। পরে দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া হাঁপাইতেন। পরে আবার অক্ষরের উপর দৃষ্টি পড়িলে মা দেখিতেন, অক্ষরের চারিদিকে একটি জ্যোতি। তারপর দেখিতেন অক্ষরের পাশে আর একটি হালকা জ্যোতির্ময় অক্ষর। পরে অক্ষরটিও সুন্দর শুভ্রজ্যোতি। মূর্তি দেখিলেও

কখনও এইরূপ হইত - জ্যোতির্ময় প্রকাশ। এমনও হইত, এক অক্ষরে দৃষ্টি পড়িলে অপর অক্ষর বেখেয়াল হইয়া গায়েব হইয়া যাইত। কাজেই মার লাইন ধরিয়া আর পড়িয়া উঠিতে পারা হইত না এবং বীজমন্ত্রটি আবার আপনি চলিতে থাকিত। তাই মা পুস্তকখানি ফেরৎ দিলেন। (ঐ পৃঃ ১২)

ভোলানাথ ও তাঁর মামাত ভাই নিশিবাবু একদিন শ্রীশ্রীমাকে প্রশ্ন করেন, "আপনি কে?" ধীরে ধীরে মার মুখ হইতে বাহির হইল - "পূর্ণব্রহ্ম নারায়ণ।" এই সময় ভোলানাথ অগ্রসর হইয়া আসিয়া আবার জিজ্ঞাসা করিলেন - "তুমি যদি পূর্ণ ব্রহ্মনারায়ণ, তবে আমি কে?" — "মহাদেব", মা উত্তর করিলেন। ভোলানাথ আবার বলিলেন, "আমি যদি মহাদেব, তবে তুমি?" "ঐ-ই-মহাদেব, মহাদেবীও", মার উত্তর হইল। ভোলানাথ জিজ্ঞাসা করিলেন - "তুমি যদি পূর্ণব্রহ্মনারায়ণ এবং সবই হও, তবে এখন একটা অস্বাভাবিকভাবে কেন কথা বলিতেছ?" উত্তর হইল - "উপস্থিত তোমাদের দৃষ্টিতে মানবরূপে পাইতেছ তোমাদের কাছে। সেই মত স্বাভাবিক অস্বাভাবিক ব্যবহারটাও তোমাদের মধ্যেই।"

এইরূপ কথাবার্তার একটু পরেই ভোলানাথ স্বীয় দীক্ষার তারিখ ও নক্ষত্রের বিষয় মাকে জিজ্ঞাসা করায় মা ১৫ ই তারিখের উল্লেখ করেন। রোহিনী নক্ষত্রের কথা বলেন। ভোলানাথের সব নক্ষত্রের নাম জানা ছিল না। তাই মা তাঁহাকে জানকীবাবুর নিকট থেকে জেনে নিতে বলেন এবং কে দীক্ষা দেবে এ প্রশ্নের উত্তরে মার মুখ থেকে বের হল "আমি।" জানকীবাবু এসে বল্লেন যে মা ঠিক নক্ষত্রই বলেছেন।

জানকীবাবু এসে মাকে জিজ্ঞাসা করেন — "আপনি কে?" শান্তভাবে আস্তে আস্তে মার মুখ হইতে বাহির হইল - "পূর্ণব্রহ্ম নারায়ণ।" "তাহার প্রমাণ কি?" মা বলিলেন - "দেখিতে চাও?" ইহা বলিতে বলিতেই মার কেমন আরও সুন্দর একভাব দেখা গেল। নিশিবাবু ও জানকীবাবু একটু দূরে আলোচনা করিতেছিলেন। মা ভোলানাথকে নিকটে বসিতে বলিলেন এবং নিজে উঠিয়া যাইয়া নাকি ভিতরে ভিতরে একটি মন্ত্রের সহিত ভোলানাথের ব্রহ্মতালু হস্তের দ্বারা স্পর্শ করিলেন। ভোলানাথের ওঁ শব্দ করিতে করিতে আপনা হইতে কলের পুতুলের মত স্থিরভাবে মাটিতে আসন করিয়া বসা হইয়া গেল। এইরূপ আসনে ভোলানাথকে এইভাবে বসিতে পূর্বে আর কেহ কোনদিন দেখে নাই। প্রস্তর মূর্তির মত অর্ধোন্মীলিত উর্ধ্বনেত্র হইয়া বাহ্যজ্ঞান হারাইয়া এত অচল ও শান্ত হইয়া বসিয়া গিয়াছিল।

মা বেশ স্থিরভাবে বসিয়া মুখে হাসি হাসি তামাশা দেখার ন্যায় দেখিতেছেন। হঠাৎ জানকীবাবু কেমনই বিশেষ এক ভাব সহকারে একটু ব্যস্ত হইয়া মাকে বলিলেন, "রমনীবাবুর (ভোলানাথ) এখন স্বাভাবিক অবস্থা হয়, এই আমাদের প্রার্থনা।" বেশ কিছুক্ষণ পরে মা আবার ভোলানাথের ব্রহ্মতালু স্পর্শ করিলেন। তিনি ক্রমে ক্রমে তাহারা যেরূপ চাহিয়াছিল প্রায় সেই অবস্থায় ফিরিয়া আসিলেন। ভোলানাথ বলিয়াছিলেন - "আমি এই সময় কিরূপ, আনন্দ বলিলেও বলা হয় না, অবর্ণনীয়। জড়বৎ নয়, আচ্ছন্নও নয়। বুঝান যায় না। এই সময়ও ভোলানাথের এক প্রসন্ন মূর্তিভাব, সর্বাঙ্গে।" (আনন্দময়ী মা ঃ কালীপ্রসাদ রায়চৌধুরী, পৃঃ ১৬৭)

(ক্রমশঃ)



স্মৃতিচারণ

(তিন)

— শ্রীমতী রেণুকা মুখার্জী

আমি গুরুপ্রিয়া দিদির অনুকরণে ডায়েরী লিখতে আরম্ভ করি। বহু বৎসর আমি দিদির সঙ্গে সঙ্গে রান্নাঘরে সেবা করি। শ্রীশ্রী মায়ের ভোগ হলে পর ভক্তদের পরিবেশনের পালা। বাড়ী থেকে যখন গেছি তখন এইসব কিছুই জানতাম না। সবই শ্রীশ্রী মায়ের ও দিদির কাছে শিখি। বিরাট করে যে মায়ের ভোগ হত, মা তার প্রায় কিছুই খেতেন না। এক এক সময় দিদি আঙ্গুল দিয়ে সব বাটি স্পর্শ করে সেই আঙ্গুল মায়ের মুখে ঠেকিয়ে নিতেন। ভক্তদের জন্য প্রসাদের ব্যবস্থা আর কি।

এখানে পটলদার কথা মনে পড়ে। পটলদা মা যতদিন বেনারসে থাকতেন, প্রসাদ ছাড়া কিছু খেতেন না। এক এক সময় এমন হত যে মা নীমবড়ি খেয়েই সারা দিন কাটিয়ে দিতেন। পটলদা অতি নিষ্ঠার সহিত নীম বড়ি প্রসাদই গ্রহণ করতেন। আঙ্গুলে ছোঁওয়া অন্নভোগের প্রসাদ নিতেন না। মা অভুক্ত থাকলে পটলদাও উপোষ করতেন।

দিদির খাবার সময় আর হয়ে উঠত না। আমিই দিদির খাবার নিয়ে অপেক্ষা করে থাকতাম। যখন শ্রীশ্রী মায়ের ঘর থেকে দিদির অবসর হবে তখন খেতে আসবেন। খাবার নিয়ে বসে থাকবার সময় ডায়েরী লিখতাম- সময় কাটাবার জন্য।

মা একবার (জানুয়ারী, ১৯৪৬) বুনিদি, ক্ষমাদি ও আমাকে কাশীর নতুন আশ্রমে রেখে গেলেন — আশ্রমবাসের অভ্যাস করতে। কন্যাপীঠের দিকের buildings অর্থাৎ গুহা ও বারান্দার কোলের ঘরগুলি মাত্র হয়েছে। আমাদের দিয়েই আশ্রমের গোড়া পত্তন। মা আমাদের সারাদিনের নিয়মাবলী বলে দিয়ে গেলেন। জপ, ধ্যান, মৌন, কীর্ত্তনে সময় কেটে যেত। সুশীলা মাসীমা আমাদের guardian হিসাবে ছিলেন।

কয়েকদিন পরেই আমাদের অবাক করে দিয়ে মা হঠাৎ এসে দাঁড়ালেন। আমাদের কি আনন্দ। মা দেখলেন যে আমাদের খাওয়ার ব্যবস্থা ভাল নয়। তখনি stove, অল্প কিছু বাসন ইত্যাদির ব্যবস্থা করে দিলেন যাতে আমরা নিজেদের ইচ্ছামত কিছু রান্না করে নিতে পারি। মায়ের এই রকমটা আরও দেখেছি। কঠিন নিয়মাবলীর মধ্যে একটু ঢিলও থাকত। এবং যেখানে যাকে সাধন ভজন করতে বসিয়েছেন, তাদের নিজ সন্নিধি থেকে বেশি সময় বঞ্চিত করেননি। ঘুরে ফিরে এসে দেখে যেতেন। এখন মনে হয় যে আমরা কেউ কিন্তু মায়ের সঙ্গ ছাড়া হয়ে সাধন ভজনে কালাতিপাত করবার পক্ষপাতী ছিলাম না। মাতৃসান্নিধ্যই আমাদের চরম সিদ্ধি ছিল।

৩/১/৪৬ — দেরাদুন থেকে বুনিদিদির কাছে মার চিঠি এসেছে। মা লিখিয়েছেন, "সাধনায় ব্রতী হয়ে যত সাধনা করা যায়, অনুভূতিতে সুমীমাংসা হয়ে যায়, কাজেই তোমাদের ভিতরের প্রকাশটা প্রয়োজন। এই পথে আসতে হলে সর্ব্বচিন্তা হতে ঈশ্বর চিন্তাই একমাত্র বড়। তাই তৎমুখী হয়ে থাকাই কর্ত্তব্য। ভগবৎ কথাই কথা আর সব বৃথা ব্যথা। সর্ব্বকর্মের ভিতর ভগবৎ চিন্তা রাখা কর্ত্তব্য।"

১৭/১/৪৬ — কি আশ্চর্য্য! দেখবার বুঝবার আগেই সময় বেরিয়ে যাচ্ছে। প্রত্যেক দিন বয়স বাড়ছে — দিন ফুরিয়ে আসছে। কিন্তু লক্ষ্য ত কল্পনা রাজ্যেই আছে, কি উপায়। ফতেপুর থেকে আমার মার চিঠি এসেছে, তার মধ্যে একটি কবিতা মা আমায় লিখেছেন ঃ —

"মায়ের শরণ যে নিয়েছে
তার ত' ভয় কেটে গেছে।
জন্ম মৃত্যু কি ভয় তারে
দেখাবে আর ঘুরে ফিরে।।
জয় জয় মা জয় মা বলে
ঝাঁপ দাও ঐ অভয় কোলে।
'ভয় নাই, মোর চরণ রেণু'
বলে মাত দাঁড়িয়ে আছে।"

আমাদের মার শ্রীশ্রী মায়ের প্রতি অচলা ভক্তি ছিল। তাঁর ঐকান্তিক শ্রদ্ধা বিশ্বাসই আমাদের সকলকে সদা সর্ব্বদা এক রসে মজিয়ে রেখেছিল এখন বুঝতে পারি। শ্রীশ্রী মা কিন্তু নিজ জনকে চিনে নিয়েছিলেন। বেরেলীতে প্রথম দর্শনেই অতি পরিচিতের মত শ্রীশ্রীমা কুশলবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করেছিলেন। আমাদের মা দুপুরবেলা ধর্ম্মশালায় (যেখানে শ্রীশ্রীমা কিছুদিন ছিলেন) যেতেন এবং বিকেলে ফিরে আসতেন। বাবাকে কাছারী রওনা করে এবং আমরা স্কুলে গেলে মার সময় হ'ত এবং বাবা ও আমরা বাড়ী ফিরবার আগেই মা চলে আসতেন। একদিন মাকে অবাক ও অপ্রস্তুত করে দিয়ে শ্রীশ্রী মা বললেন, 'তোমার চোখ যেমন বারেবারে ঘড়ির দিকে চলে যায়, যতই কথা বার্ত্তা হ'ক। এটি বিস্মরণ হয় না, সেই রকম মনটাকে ভগবানের পায়ে ফেলে রাখতে হয়।"

মা এই বাণী সারা জীবন অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছেন বলে আমাদের বিশ্বাস। ভাইজী বেরেলীতে আমার বাবা মার সঙ্গে অনেক কথা বলতেন। আমরা বহুদিন পর্য্যন্ত ভাবতাম যে ভাইজী ওঁদের দীক্ষা দিয়েছেন। তা কিন্তু নয়। ভাইজী নিজে শ্রীশ্রী মাকে কিভাবে বুঝেছেন, সেই কিছু কিছু বলতেন। স্বরচিত একটি কবিতা কাগজে লিখে আমার মাকে দিয়ে যান (কৈলাস যাবার পথে)

গানটি ঃ—

আত্মসমর্পনে করি মৃত্যুপণ
দেহতরীখানি দাও ভাসাইয়া
যদি ওঠে পথে বাদল বাতাস
না করিও ভয় না পাইও ত্রাস
রুদ্ধ করি ভীষণ প্রাণের ক্রন্দন
জড়ের মত থাকিও বসিয়া ...
হালপাল সকলি ছাড়িয়া।

আমার মা এইভাবেই জীবনটি কাটিয়ে গেছেন। গানটি একটি ছবির মত frame এ বাঁধিয়ে তাঁর চিঠি লেখার টেবিলের সামনে ঝোলানো থাকত।

সংসারের উত্থান পতন, ওলটপালট সবই নীরবে সহ্য করেছেন ও আমাদেরও কোনও সময় ভয় পেতে কি নিরাশ হতে দেননি। নৌকার কর্ণধার যে সঙ্গে আছে, সে বিশ্বাস সর্ব্বদা অটুট ছিল।

আমাদের মায়ের খুব অদ্ভুতভাবে দীক্ষা হয়েছিল, আমরা শেষের দিনে জানতে পারি। শেষ জীবনে মা দৃষ্টি শক্তি হারিয়ে ফেলেছিলেন। তাঁর চিঠি আমরা অনেক সময়ে লিখে দিতাম — অনেক সময় কাগজের উপর কলম একটু guide করে দিলে মা নিজেও লিখতেন। মায়ের প্রত্যেকটি চিঠি রেখে দেবার মত। স্বরচিত গানও ঐভাবে ঐ সময়ে অনেক লেখা হয়েছে। একদিন মা হঠাৎ বীথুকে বললেন যে ভাইজীর বইতে যে মায়ের মুখনিঃসৃত সংস্কৃত স্তব ছাপা আছে, সেটি পুরোটা পড়ে শুনিয়ে দাও। বীথু জোরে জোরে ঐ স্তবটি পড়বার পর মা বললেন, "আমি ভেবেছিলাম হয়ত একটু ভুল হয়ে গেছে, অনেকদিন ত পড়ি না, কিন্তু ভুল হয়নি ঠিকই আছে।"

বৃদ্ধ বয়সে চোখে না দেখার জন্য মায়ের চলাফেরা কমে গিয়েছিল আমরা মায়ের কাছাকাছি বসে থাকতাম তাই অনেক সময়। একটি সংস্কৃত মন্ত্র অস্ফুটভাবে উচ্চারণ করছেন শুনতে পেতাম কিন্তু মন্ত্রটি চেনা লাগত না। এখন বুঝতে পারলাম যে মা এক সময়ে ঐ স্তবের দুটি লাইন জপ করেন। বোধ হয় কিছু সংখ্যা ছিল। কৌতুহলী হয়ে বীথু মাকে জিজ্ঞাসা করাতে মা বললেন, "হ্যাঁ, অনেক দিনের কথা। ভাইজীর দেহত্যাগের পর আমরা দেরাদুনে যাই মনে আছে ত? আমি তখন মন্ত্র দীক্ষা ইত্যাদি কিছুই জানি না। শ্রীশ্রী মা বেশীর ভাগ সময়ে নিজের ঘরে শুয়েই থাকতেন। বাবা ভোলানাথের আদেশে আমি শ্রীশ্রী মায়ের কাছাকাছি থেকে যৎসামান্য সেবাটুকু করে দিতাম। একদিন শ্রীশ্রীমার ঘরে গেছি, মা আমার হাতে একটি কাগজ দিয়ে, তাতে যা লেখা আছে পড়ে মন্ত্রের মত জপ করতে বললেন। বোধ হয় পিতাজীকে দিয়ে লেখানো।

একটু সড়গড় হলে মা বারান্দার নীচে গুহাতে গিয়ে বসে জপ করতে নির্দেশ দিলেন। এই প্রথম এইভাবে একাসনে বসা ও জপ করা সংখ্যা রেখে। অপূর্ব্ব আনন্দে সময় কেটে গেল। সময় যে চলে যাচ্ছে তার কোনও বোধ ছিল না।"

কিছুক্ষণ পর দেখি পিতাজী এসে একটি তাম্রের হোমকুণ্ডে অগ্নি জ্বালালেন এবং ঐ অগ্নিতে কিছু কিছু আহুতি দিলেন। একটু পরে শ্রীশ্রী মা ও নেমে এলেন। পিতাজী ও মাতাজী দুজনেই আমার মাথায় হাত দিয়ে আশীর্ব্বাদ করলেন।

বীথু ও আমি অবাক বিস্ময়ে আমাদের মার এই মন্ত্র পাওয়ার সৌভাগ্যের কথা শুনলাম। মায়ের সন্ন্যাস এবং মৃত্যুও অদ্ভুতভাবেই হয়েছিল।

১৯৯০ সালের গরমের সময়। মা একদিন বীথুকে বললেন, "আমার সন্ন্যাসের মন্ত্র মনে পড়ছে না।" বীথু বলল, "মা, তোমার ত সন্ন্যাস হয়নি।" মা বললেন, "হ্যাঁ হয়েছে, তবে মন্ত্রটা ঠিক ঠাহর করতে পারছি না।" ঠিক

এই সময়ে "জয় মা" বলে ডাক দিয়ে নির্ম্মলা (হাণ্ডু) ও শান্তা (পূর্ণানন্দ) হরিদ্বার থেকে আমাদের বাড়ী এল দেখা করতে। আমরা এই সব কথা তাদের বলতে শান্তা বলল যে মহন্তজীর কাছে চিঠি দিতে, তিনি নিশ্চয়ই এলাহাবাদে এসে মাকে সন্ন্যাস মন্ত্রে দীক্ষিতা করবেন। শান্তার কথায় সাহস পেয়ে বীথু মহন্তজীর কাছে চিঠি দিল, তিনি যদি কৃপা করে এলাহাবাদ আসেন।

মহন্তজীর অক্ষয় তৃতীয়ায় কাশী আশ্রমের উৎসবে আসার programme ছিল। তার দুদিন আগে তিনি কাশী এলে তাঁকে আমাদের দিক থেকে station এ receive করে সোজা এলাহাবাদে taxi করে নিয়ে আসা হয়। তাঁর অনুমতি অনুসারে এই ব্যবস্থা করা হয়।

এলাহাবাদে যথোচিত সম্মান সহকারে তাঁর আতিথ্যাদি করা হল। শ্রীশ্রী মায়ের training এ মহাত্মাদের অভ্যর্থনা করার অভ্যাস ত আমাদের ছিলই। মহন্তজীর বিশ্রাম ও ভোগের পর তিনি মায়ের সঙ্গে দেখা করলেন। মা অতি excited হয়েছিলেন, কি যেন হতে যাচ্ছে. আমাদের বলে রেখেছিলেন যে গুরুজী আসলে তাকে যেন আমরা দাঁড়িয়ে উঠতে সাহায্য করি। মহন্তজী অতিশয় প্রসন্ন হয়ে মার সঙ্গে কিছুক্ষণ কথাবার্ত্তা বললেন। পরে আমাদের বললেন, "আমি ত' মাতাজীকে রুগী ও কাতর অবস্থায় পাব ভেবেছিলাম। দেখছি ইনি খুবই বুদ্ধিমতী ও ভক্তিমতী। কাল ভোরে দীক্ষা হবে শ্রীশ্রীমায়ের মন্দিরে।" মহন্তজী গেরুয়া বস্ত্র ও রুদ্রাক্ষের মালা সঙ্গে এনেছিলেন। অতি ভোরে মাকে ঐ গেরুয়া বস্ত্রে সাজিয়ে আমরা চেয়ারে বসিয়ে শ্রীশ্রীমায়ের মন্দিরে নিয়ে গেলাম। মহন্তজী আরেকটি চেয়ারে বসলেন। মহন্তজী কিছু কিছু ক্রিয়া কর্ম্ম করলেন। আমরা ঘরের বাইরে দাঁড়িয়ে ছিলাম — শুধু বীথু মায়ের কাছে দাঁড়িয়েছিল মহন্তজীর আদেশে। তিনি ভস্ম মায়ের কপালে দিলেন ও রুদ্রাক্ষ গলায় দিলেন।

তারপর সন্ন্যাস মন্ত্র উচ্চারণ করলেন। বীথুকে বললেন, "তুমি শুনেছ বটে, কিন্তু মুখে বলবে না। শুধু প্রয়োজন হলে মাকে মনে করিয়ে দেবে।" বীথু বলল যে ঐ মন্ত্র একটু অসাধারণ ছিল, যেগুলি আমাদের শোনা ও জানা আছে তার মধ্যেকার কোনটি নয়। মহন্তজী মাকে বললেন, "আপনার আগ্রহ ও যোগ্যতা দেখে আপনাকে এই মন্ত্র দিলাম। যদি বিস্মৃতি হয় তাহলে পবিত্র পঞ্চাক্ষর মন্ত্র জপ করতে পারেন। তা না হলে শুধু "মা" নাম করলেও হবে। আজ থেকে আপনি সন্ন্যাসিনী — কারও সঙ্গে আর সম্পর্ক নেই, কাউকে প্রণাম করতে হবে না। কেউ প্রণাম করলে তাকে 'নমো নারায়ণায়' বলে অভিবাদন করতে পারেন।" সর্ব্বস্ব ত্যাগের বিষয়ে আরও কিছু কিছু বললেন।

আমরা ফুলের মালার জোগাড় রেখেছিলাম। গেরুয়া বস্ত্রে সজ্জিতা, ফুলের মালা গলায়। সেদিন মায়ের যা রূপ দেখলুম, অভাবনীয়। অগ্নি বস্ত্রের রং ও গায়ের রং যেন মিলে গেছে। বার্দ্ধক্যের কি অসুস্থতার চিহ্ন মাত্র নেই। শ্রীশ্রীমায়ের কৃপায় মহন্তজীর সৌজন্যে সব কাজ সুন্দরভাবে হয়ে গেল।

মহন্তজী যাবার সময় আমাকে অতি সস্নেহে ও সুন্দর করে মায়ের অন্তিম সময়ের নিয়মাবলী বলে দিয়ে গেলেন। মহন্তজী সর্ব্বদা খবর দিতে বলে আবার taxi করে কাশী রওনা হয়ে গেলেন।

১৯৪৬ এ শ্রীশ্রী মায়ের নির্দেশে আমার মা দিদিমার কাছে তান্ত্রিক মতে দীক্ষিতা হয়েছিলেন। আমাদের

মাই বোধ হয় দিদিমার প্রথম সংসারী শিষ্যা। এই কারণে দয়ানন্দজী মাকে বড়দি বলে ডাকতেন। মায়ের সন্ন্যাসের পর প্রায় দুই বছর মা আমাদের মধ্যে ছিলেন। আমাদের মনে হল যে মার যেন ইচ্ছামৃত্যু হল। মায়ের সেবায় আমাদের ছাড়া একটি রমা বলে মেয়ে ছিল. অদ্ভুত তার সেবাপরায়ণতা। মা চোখে দেখতে পান না বলে একজন সর্ব্বদাই কাছে থাকতাম। মাকে কখনও কাতর বা নিরুৎসাহিত দেখিনি। হয়ত এক আধবার নীরবে অশ্রু ফেলছেন। আমি গায়ে হাত দিয়ে বলতে গেছি, "মা, কাঁদছ কেন? আমরা ত' রয়েছি।" মা অমনি উত্তর দিলেন, "তোমরা ব্যস্ত হোয়োনা ত'। আমি ভগবানের জন্য কাঁদছি। তোমাদের ভাল না লাগলে তোমরা অন্য ঘরে গিয়ে বস।"

রমার সরকারী চাকরীর জন্য আবেদন করা ছিল। তার ডাক এল। সে মায়ের অনুমতি নিয়ে কাশী চলে যেতে চাইল। মায়ের যেন চমক ভাঙ্গল — "রমা চলে যাবে।" মা কিছুদিন থেকে একটু চুপচাপ হয়েই গিয়েছিলেন। খাবারে কোনও রুচি ছিল না। মা এবার যেন নিজেকে আলগা করে নিলেন। কাছে কাছে যারা ছিল সবাইকে প্রাণ ভরে আশীর্ব্বাদ করলেন — তাতেই বোঝা গেল যে মা এবার আমাদের ছেড়ে যাচ্ছেন। শেষ নিঃশ্বাস (পরে বুঝেছিলাম) ফেলার এক মিনিট আগে পর্য্যন্ত মা জপই করছিলেন — একটু জোরে বলে উঠলেন "জয় গুরু, জয় মা।" এই শেষ কথা।

মা সর্ব্বদা আমাদের দুই বোনের উপর যাতে চাপ না পড়ে তার জন্য সচেতন থাকতেন কেন না আমরা কেউই খুব সুস্থ নয়। রমার ৩০ শে সেপ্টেম্বর যাবার কথা ছিল। মা ২৯ শে ভোরের আগেই দেহ রাখলেন।

আমি মহন্তজীর দিয়ে যাওয়া নির্দেশানুসারে মায়ের শরীর তুলে পা মুড়ে বসিয়ে দিলাম। পিঠের দিকে support ছিল। তারপর ভোর হতেই মহন্তজীর আখাড়ায় গেলাম। সেখানে যিনি থাকেন তিনি বললেন, "আমরা ত এসব ব্যাপারে অভিজ্ঞ নই তবে আপনাদের ভাগ্য খুব ভাল। একজন সন্ন্যাসী যিনি এই সব বিষয়ে জানেন কালই হরিদ্বার থেকে এসেছেন মাত্র একদিনের জন্য, তাঁকে বলুন।"

ঐ সন্ন্যাসী স্বামীজী রাজি হলেন এবং তাঁকে ও তাঁর শিষ্যকে আমরা বাড়ী নিয়ে এলাম। তিনি নিজেদের নিয়মানুসারে নতুন কাপড় আনিয়ে গেরুয়া রং করালেন এবং আরও ব্যবস্থা বলে দিলেন। বাবু বেচারা Bombay থেকে plane এ এল — সেই জন্য কিছু অপেক্ষা করতে হল। এদিকে আমাদের অতি স্নেহভাজন সমু তখন এলাহাবাদে Chief Engineer জল কল বিভাগের। সে গঙ্গাতটের সব ব্যবস্থা অতি সুচারুরূপে করিয়ে দিল।

আমাদের মাকে নতুন গেরুয়া বস্ত্রে সাজানো হল। কপালে ভস্ম, গলায় রুদ্রাক্ষের ও ফুলের মালা। অতি অপূর্ব্ব। ডাক্তার বলল, "আমি আমার সারা জীবনে এরকম মৃতদেহ দেখিনি। মৃত্যুর যেন কোন চিহ্ন নেই।" স্বামীজী অতি সন্তর্পনে নৌকায় বসিয়ে সঙ্গমে নিয়ে গেলেন। সবাই গঙ্গায় নেমে দাঁড়িয়ে — চৌকীর ওপর বসানো মায়ের শরীরকে আস্তে আস্তে সঙ্গমে নিমজ্জিত করে দিলেন — যেন মা অবগাহন স্নানের পর আর উঠলেন না। গঙ্গার পবিত্র প্রবাহের দিকে আমরা তাকিয়ে রইলাম। মহন্তজী কোনও সময় শ্রীশ্রী মায়ের দেওয়া নামই আমার মাকে দিয়েছিলেন — তাঁর সন্ন্যাস নাম ছিল স্বামী সত্যানন্দ গিরি।

(ক্রমশঃ)



সংযম সপ্তাহ মহাব্রত প্রসঙ্গে

(ছয়)

—ব্রহ্মচারিণী গীতা ব্যানার্জী

শ্রী জগন্নাথ কুণ্ডুর আহ্বানে ষোড়শতম সংযম সপ্তাহ মহাব্রত হাজারীবাগে সুরিয়া গ্রামে অনুষ্ঠিত হয়। ১লা নভেম্বর হতে ৭ ই নভেম্বর, ১৯৬৫ এখানে সংযম সপ্তাহ অনুষ্ঠিত হয়।

প্রতি বছরই সংযম সপ্তাহে কিছু না কিছু নবীনত্ব ও বিশেষতা অনুভূত হয়, যদিও সংযমের নিয়ম ও দৈনিক ধারা প্রতিসংযমে একই থাকে কিন্তু তবু যেন সকলেরই নবপ্রেরণা ও নবীন আনন্দের উপলব্ধি হয় বারে বারে নবীন সংযমে। এবারেও সংযম সপ্তাহ এক অভিনব উৎসাহ-উদ্দীপনার বার্তা নিয়ে সমাগত হল।

অধিকাংশ সংযম মহাব্রত তীর্থস্থানে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। যেখানে অপূর্ব পরিবেশে সংযম সপ্তাহ আপনা হতেই জমে ওঠে। যদিও সুরিয়া কোনও তীর্থস্থান নয়, তবু সংযম সপ্তাহের মত অনুষ্ঠানের জন্য এখানে খুবই অনুকূল পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছিল। এরূপ কিংবদন্তী আছে যে চৈতন্য মহাপ্রভু এইস্থানে জঙ্গলের ভিতর দিয়ে হরিনাম সংকীর্তন করতে করতে গিয়েছিলেন। সেই কারণে এখানে একটি অপূর্ব ভাবধারা প্রবাহিত হচ্ছে। এই জায়গার অপূর্ব সৌন্দর্য্য এবং গভীর শান্তিময় বৃহৎ উন্মুক্ত স্থানটিতে একটা নিজস্ব গম্ভীরভাব অনুভূত হয়। চতুর্দিকে দূরে ছবির মত পর্বত মালা। ভূমি হতে উপরের দিকে উঠে গিয়েছে। সম্পূর্ণভাবে শহরের আধুনিক জীবনের কোলাহল হতে দূরে এমনকি এখানে একটি দোকান বা বাড়ী ও নেই। এই অপূর্ব পরিবেশে সংযম খুব জমে উঠেছিল।

মার ভাবও খুব সুন্দর ছিল। মনে হচ্ছিল মা নিজের বাড়ীতে আছেন। মা, দিদিমা ও সঙ্গের মেয়েদের জন্যই এই বাড়ী নির্মিত হয়েছিল। মার বাড়ীর চারদিকে সুন্দর :ফুলের সাজানো বাগান। ব্রতীর সংখ্যা অন্যবার হতে এবার কম হয়েছে। গতবার বৃন্দাবনে ৩৫০ জন ব্রতী ছিল, এবার মাত্র ১৫০ জন ব্রতী ছিল। এতে সকলের লাভই হল।

পরস্পরের মধ্যে একটি অন্তরঙ্গতা অনুভূত হল। ধ্যানের সময় সকলেরই একাগ্রতা দেখা গেল। সম্ভবত ইতিপূর্বে আর এমনটি দেখা যায়নি। আবহাওয়া অতি মনোরম। খুব গরম নয়, শীতও অধিক ছিল না। সকলেরই স্বাস্থ্য ভাল ছিল। ধ্যানের সময় এবার একটি কাশির আওয়াজও শোনা যায়নি। সংযমের একটি নিয়ম হল সৎসঙ্গের সময় বা ধ্যানের সময় কেউ মঞ্চের কাছে গিয়ে মাকে ফুল দিতে পারবে না। এই প্রথম এই নিয়মটি পালিত হল।

প্রসিদ্ধ মহাত্মারা সকলেই এসেছেন। যেমন স্বামী মহেশ্বরানন্দজী, স্বামী চিদানন্দজী, (দিব্যজীবন সংঘের প্রেসিডেন্ট স্বামী চিদানন্দজী এই প্রথম সংযমে আসেন), স্বামী সদানন্দজী, স্বামী চেতনগিরিজী, স্বামী শরণানন্দজী। সকলেই সংযমের উপর ও গীতা, ভাগবত এবং উপনিষদের উপর খুব সুন্দর ভাষণ দিতেন।

মা একদিন সংযমের সময় বললেন, "তোমরা সংযমের অভ্যাস কর। তা হলে সংযম স্বরূপ প্রকাশিত হবেন। সংযম স্বরূপ অর্থাৎ অনিয়ন্ত্রিত ব্যবহার, কথা ও চিন্তা তখন দূরীভূত হবে। ক্রিয়ায়, কথায় ও চিন্তায় তখন

স্বভাবত নিয়ন্ত্রণ আসবে। অপ্রয়োজনীয় কথা বলা না। অপ্রয়োজনীয় চিন্তা করা না। সংযম স্বরূপ প্রকাশিত হলে সর্বদা তখন সৎ চিন্তা, সৎ কথা ও সৎ চরিত্র তোমার আপনা হতেই হবে। তখন আর কিছুই করতে হবে না। শরীর ও মনের সমস্ত অপ্রয়োজনীয় ক্রিয়া তখন বন্ধ হবে। যদি কেউ সংযম স্বরূপকে প্রাপ্ত হয়, তখনই সংযম অভ্যাসের ফল তার কাছে প্রকট হবে।"

সুরিয়া গ্রামে মাতৃ-দর্শনের জন্য অপার জনসমুদ্র দেখা গেল।

অন্তিমদিনে মহানিশার ধ্যানের সময় মার কাছে একটি নারায়ণ শিলা রাখা হয়েছে দেখা গেল। ধ্যানের পর মা বললেন, "যখনই এই নারায়ণ শিলাটি কাছে থাকবেন, তোমরা এই নারায়ণ শিলার সামনে বসে সংযমব্রত পালন করবে।"

এই নারায়ণ শিলা হল একটি বিশেষ ধরণের কালো কষ্টি পাথরের। এই বিশেষ নারায়ণ শিলাটির একটি নিজস্ব ইতিহাস আছে। গত ১৪ই আগস্ট, ১৯৬৫ মা যখন দেরাদুন হতে যোধপুর যাবার পথে একদিনের জন্য বৃন্দাবনে নামেন তখন একজন লোক, আশ্রমের পরিচিত, মাকে এসে বলল যে কিছুদিন আগে বৃন্দাবনের সমস্ত মন্দির দর্শনের সময় রাস্তায় সে একটি নারায়ণ শিলা পেয়েছে। যদিও সে ব্রাহ্মণ নয়, তবু সে এই নারায়ণ শিলা উঠিয়ে নিজের সঙ্গে নিয়ে গেল। পরে তার মনে হল যে কাছেই মার আশ্রম। মার ঘরের কাছে ১২ জন সন্ন্যাসী ১২টি তুলসী গাছ রোপণ করেছিলেন, ঐ স্থানই নারায়ণের জন্য সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। তাই সে নারায়ণ শিলা এনে ঐ তুলসীগাছের তলায় পুঁতে রাখল। মা এই কথা শুনে তৎক্ষণাৎ ঐ নারায়ণ শিলা মার কাছে নিয়ে আসতে বললেন। মার কাছে যাঁরা ছিলেন, তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ বললেন যে এটি নারায়ণ শিলা নয়, এ একটি সাধারণ পাথর। কিন্তু মার প্রথম হতেই খেয়াল হচ্ছিল যে এ একটি নারায়ণ শিলা। মা নিজের হাতে নারায়ণ শিলাটিকে ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করলেন। তখন দেখা গেল যে ঐ নারায়ণ শিলাতে তিনটি চক্র আছে। মা তখন ঐ নারায়ণ শিলা উদাসজীকে দিলেন এবং রোজ পূজা করতে বললেন ও নিয়মিত ভোগ দেওয়ার নির্দেশ দিলেন।

একবার প্রভুদত্তজী এই নারায়ণ শিলা দেখে বলেন, "যে নারায়ণ শিলাতে তিনটি চক্র থাকে, সেই নারায়ণ শিলা দুর্ভাগ্যের সূচক হয় এবং পূজককে শুধু দুঃখ ও যন্ত্রণাই দেয়। তাই এই কথা ভেবেই ঐ নারায়ণ শিলাটিকে কেউ রাস্তায় ফেলে দিয়েছিল।" মা তখন আবার ঐ শিলাটিকে পরিষ্কার করতে আরম্ভ করলেন এবং আরো দুইটি চক্র ঐ শিলাতে দেখা গেল। শ্রী অগ্নিষ্বাত্ত শাস্ত্রীকে (বাটুদাকে) দেখানোর পর বাটুদা বললেন, "এইটি নরসিংহ লক্ষ্মী শিলা এবং অতিশয় সৌভাগ্য সূচক। এর পূজক যা করবে তাতেই সফলতা লাভ করবে। নরসিংহ লক্ষ্মী শিলা আদি গুরু শংকরাচার্য্যের সাক্ষাৎ শিষ্য পদ্মপাদাচার্য্যের ইষ্টদেবতা ছিলেন। ঐ নারায়ণ শিলাটি মা এখানে সমস্ত মহাত্মাদের দেখালেন এবং নারায়ণ শিলার অদ্ভুত কাহিনীও শোনালেন।

এখানে সংযমের পর মা নিজের খেয়ালে সুরিয়া গ্রামবাসীদের কাছে গিয়ে রাম নাম দেন।

* * *

ভাবনগরের মহারাজা ও মহারানীর আমন্ত্রণে সপ্তদশতম সংযম সপ্তাহ বৃন্দাবনে অনুষ্ঠিত হয়। এই সংযমে গ্রীসের রাজমাতা ও রাজকুমারী ইরেন মাতৃ দর্শনে আসেন। স্বামী চিদানন্দজীও আসেন।

* * *

অষ্টাদশতম সংযম সপ্তাহও বৃন্দাবনে খুব সুন্দরভাবে অনুষ্ঠিত হয়। সমস্ত মহাত্মারা আসেন। উনবিংশতম সংযম সপ্তাহ দেরাদুনে এবং বিংশতম সংযম সপ্তাহ পুনরায় বৃন্দাবনে অনুষ্ঠিত হয়। এবার সংযম সপ্তাহের মধ্যে চতুর্থদিন মা বৃন্দাবন হতে বিকালে ধ্যানের পর অসুস্থ হরিবাবাকে দেখতে দিল্লী যান। আবার সেদিনই রাত্রিবেলা ফিরে আসেন। এই প্রথম মা সংযমের মধ্যে অন্যত্র গেলেন।

সংযমের শেষ দিন রাত্রিবেলা অধিবাস সহ নাম যজ্ঞ আরম্ভ হয়। মহানিশার ধ্যানের সময় ও নাম রক্ষা হয়।

* * *

শুকতালের দণ্ডী স্বামী শ্রী বিষ্ণু আশ্রমজীর আমন্ত্রণে একবিংশতিতম সংযম সপ্তাহ মহাব্রত শুকতালে অনুষ্ঠিত হয়। শ্রী হরিবাবা, স্বামী মহেশ্বরানন্দজী ও দিদিমার মহাপ্রয়াণের পর এই প্রথম সংযম সপ্তাহ।

প্রতিদিন স্বামী অখণ্ডানন্দজী উপনিষদ ব্যাখ্যা করেন। শ্রী চেতন গিরিজী, স্বামী বিষ্ণু আশ্রমজী, শ্রীশরণানন্দজী, শ্রী গোবিন্দ প্রকাশজী, শ্রী চক্রপানিজী, শ্রী অবধূতজী, আরোও নতুন সাধু শ্রী ব্রহ্মানন্দজী (মহেশ্বরানন্দজীর উত্তরাধিকারী — ইনি বোম্বের সন্ন্যাস আশ্রমের এবং কনখলের সুরতগিরি বাংলার মহামণ্ডলেশ্বর হয়েছেন), স্বামী ভূমানন্দজী, স্বামী ধর্মানন্দজী (পরমার্থ নিকেতন), বোম্বের স্বামী চিন্ময়ানন্দজী ও একদিনের জন্য এলেন।

এবারে শুকতালে ৪ঠা নভেম্বর হতে ১০ই নভেম্বর, ১৯৭০ সংযম সপ্তাহ অনুষ্ঠিত হয়।

* * *

দ্বাবিংশতম সংযম মহাব্রত ও বৃন্দাবন আশ্রমে অনুষ্ঠিত হয়।

(ক্রমশঃ)

*

নামযজ্ঞ ও শ্রীশ্রীমা

(তিন)

— শ্রীমতী সরমা মুখার্জ্জ

শ্রীশ্রী মা

বোধহয় ১৯৭১ সালে কাশীধামে যাওয়া হল মায়ের তিথিপূজা ও নামযজ্ঞ উপলক্ষে। প্রচণ্ড ভিড়। জায় খুবই কম। কে যে কোথায় আছে জানা যাচ্ছে না।

এযাবৎ মায়ের তিথি পূজার আগে নামযজ্ঞ হয়েছে। কিন্তু এবারে আগে জন্মতিথি পূজা, পরে নামযজ্ঞ 'মায়ের' তিথিপূজা আমার একটুও ভালো লাগে না — সহজে যেতে চাই না। আমরা দিল্লীতে 'মায়ের' ছবি সামনে বসে সন্ধ্যা থেকে ভোর পর্য্যন্ত 'মায়ের' নাম করি, তাতে প্রাণ ভরে যায়। যাইহোক, বসে আছি। কয়েকজ 'মাকে' নিয়ে এসে (মাকে) শুইয়ে দিয়ে বেশ দামী, ভারী কয়েকটা শাড়ি চাপিয়ে দিয়ে ঢাকা দিয়ে দিল। ত উপরে বেশ বড় বড় ফুলের মালা এবং কয়েকটি বড় বড় ফুল চাপাল। 'মা' দুই এক মিনিটের মধ্যে মনে হ ঘুমিয়ে পড়লেন, নয়ত সমাধিস্থ হয়ে গেলেন। একদম নড়াচড়া নেই। কোনও দিক থেকেই মাকে দেখা যাচ্ছে না। একটুও ভাল লাগছে না।

কুসুমদা পূজায় বসলেন। পূজা শেষ হলে ভোর বেলা 'মাকে' তুলে নিয়ে যায়। এবারে কিন্তু 'মাকে' তো গেল না। 'মা' সমাধিস্থ একভাবে পড়ে আছেন। চারিদিকে ভাল করে কানাত দিয়ে মণ্ডপটি ঢেকে দেওয়া হ বেলা বাড়ছে, কানাতে রোদ পড়ছে। একে একে অনেকেই এসে জড় হয়েছে। পুরুষেরা প্রায় সকলেই এসে ব আছেন। 'মায়ের' নিঃশ্বাস পড়ছে কি পড়ছে না, বোঝা যাচ্ছে না। কান্নাকাটি পড়ে গেল। বেলা এগারোটার সম গৌরীনাথ শাস্ত্রী চিৎকার করে কাঁদতে কাঁদতে মাকে ডাকতে লাগলেন। শাস্ত্রীজীর দীর্ঘ, গৌর সুগঠিত দেহ, অগা পাণ্ডিত্য ও প্রতিষ্ঠা! আবার তেমনই মায়ের একনিষ্ঠ ভক্ত! তিনি কাঁদছেন আর বলছেন — "মাগো, ও জাগো। বড্ড কষ্ট হচ্ছে। মাগো আর সহ্য করতে পারছি না, জাগো মা।" সকলেই কাঁদছে। আমাদের চোখে জলে কাপড় ভিজে যাচ্ছে। কেন কান্না তাও জানি না — কেবল মনে হচ্ছে কতবার এসেছি এমনত দেখি ডাকাডাকি, হাঁকাহাঁকিতে 'মা' জাগলেন। 'মাকে' যখন ধরে নিয়ে যাচ্ছে, ঘাড় যেন লটকে পড়ছে।

আর 'মায়ের' দর্শন পাওয়া গেল না সারাদিন। অধিবাসের আগে গিয়ে দেখি 'মা' নিজ আসনে বসে আ — তেমনই জ্বলজ্বলে মূর্ত্তি। আমি কাছে গিয়ে প্রণাম করে জিজ্ঞেস করলুম, "মাগো, কেমন আছো?" " কেমন এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললেন। "কেন ভালই ত আছি?" আমি পালিয়ে বাঁচলুম।

ছেলেদের কীর্ত্তনের পর যথারীতি আমরা নাম ধরলুম। মা বসে আছেন। নাম বেশ জমে উঠেছে। মা পূজা উপলক্ষে সারা ভারত থেকে অনেকে আসেন। অনেক গুজরাটি মহিলা গাইছেন আর প্রদক্ষিণ করছে

সকলেরই প্রাণপণ চেষ্টা। আমাদের সঙ্ঘের President, Shri B. K. Shahর স্ত্রী লীলাবেনও ছিলেন। মা হঠাৎ তাঁকে ডেকে কিছু বললেন। খানিক পরে দেখি গুজরাটি মহিলারা গোল হয়ে মায়ের সামনে নাচছেন আর গাইছেন। প্রত্যেকের হাতে দুটি করে ছোট রঙ্গীন লাঠি — ঠকাঠক এ ওর লাঠিতে তালে তালে মারছেন আর গাইছেন। লীলাবেন এর সেবিকাও দুটি লাঠি নিয়ে নাচছেন। গর্‌বা নৃত্য আরম্ভ হয়ে গেল। মা সমানে হাতে তালি দিয়ে যাচ্ছেন। আমরা যত জোর দিই তারাও সেইমত লাঠি ঠকাঠক মারছেন। সে এক অপূর্ব্ব দৃশ্য। 'মা' এক এক সময় উচ্ছ্বসিত হয়ে হাসছেন। বেশ খানিকক্ষণ পরে নাচ থামল। তখন 'মাইয়া আমার' উঠে পরিক্রমা করতে লাগলেন। কখনও আমাকে জড়িয়ে ধরে এক হাত তুলে নাচ, কখনও ছবিকে। আর কারও সঙ্গে নেচেছেন কি না মনে পড়ছে না। মায়ের সে কি আনন্দ — আনন্দ যেন ধরে না। অনেক পরে মা চলে গেলেন, আমাদের অপার করুণা করে, অপার আনন্দ দিয়ে। ভোরে আমাদের নাম শেষ হল। ছবির ত আনন্দের সীমা নেই - কতভাবে কৃপা পেয়েছে। অন্যদেরও কৃপা করেছেন হয়ত। আমাকে এই প্রথম দেবদুর্লভ কৃপা। সকালে হৈ-হৈ পড়ে গেল। ছেলেরা রাতের ব্যাপার শুনেছে - সকলেরই আনন্দ। অনেকে আমাকে অভিনন্দন জানালেন। ভূপেন ভাই হেসে হেসে বলছে, "সরমাদি আজ ত আপনারই দিন।"

জয় মা।

(ক্রমশঃ)



আনন্দময়ী স্মৃতি

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

— কুমারী চিত্রা ঘো

বারান্দার মধ্যে গদ্দা দিয়ে চাদর বেছানো একটি ছোট্ট বিছানা, তার উপর তাকিয়ায় ঠেসান দেওয়া শাড়ি পরা ললিতা সখীর ফটো। মা হেসে হেসে হিন্দীতে সাধুবাবাদের ললিতা সখীর কথা সব বলতে লাগলেন। যেন সখীকে জীবন্ত দেখতে পাচ্ছিলেন, কী দুষ্টু দুষ্টু হাসি —।

যতীশদা আমাদের এদিকে এনে বলছিলেন যে সখী, মাকে কৃষ্ণ ভাবে দেখতেন ও তাঁর সঙ্গে মার অপূর্ব মধুর ভাব ছিল। মাকে দেখলেই নাকি সখী ঘোমটা দিয়ে সলজ্জভাবে ব্যবহার করতেন। সখী নাকি অভয়দাকে একদিন বলেছিলেন, "এই যে মা দেখছ — এঁর কথার কোন দিন অবমাননা করবে না। তিনি যদি বলেন গঙ্গায় ঝাঁপ দাও, কোন কিছু না ভেবে তৎক্ষণাৎ গঙ্গায় ঝাঁপিয়ে পড়বে।"

আমরা এই সব শুনছি - হঠাৎ মা এগিয়ে এসে আমাকে পিঠে হাত দিয়ে সঙ্গে যেতে বললেন কিন্তু আমার এমনি দুর্ভাগ্য যে পাশে packing case এ কাপড় আটকিয়ে যাওয়াতে আমি একটু পেছিয়ে গেলাম। যা হোক নিজেকে বন্ধনমুক্ত করেই ছুটলাম মার পেছনে। দেখি যে মা দিদির পিঠে ভর দিয়ে পশমের জুতোটি পরছেন। তারপর আমরা আবার মার রিক্সার সঙ্গে সঙ্গে ছুটলাম কিন্তু রিক্সার গতি অত্যধিক হওয়াতে পিছিয়ে পড়লাম। মার রিক্সা যে কোনদিকে গেল বুঝতে না পেরে এদিক ওদিক তাকাচ্ছি। এমন সময় যতীশদা এসে আমাদের direct করে আর একটি মন্দিরে নিয়ে গেলেন। আমরা পৌঁছিয়ে দেখি যে মা রাস্তায় দাঁড়িয়ে আমাদের অপেক্ষা করছেন। আমাদের দেখেই দূর থেকে হাত দিয়ে ডাকলেন। আমরা আবার মার আঁচল ঘেঁসে মার সঙ্গে সঙ্গে মন্দিরের ভিতর ঢুকলাম। সকালেও আমরা মহাপ্রভুর এই মন্দিরটি দেখেছিলাম, ছোট বিগ্রহ, কিন্তু ভারী সুন্দর। মা অনেকক্ষণ ধরে বিগ্রহের সামনে দাঁড়িয়ে বেরোবার আগে মহাপ্রভুকে আদর করে আস্তে আস্তে বেরিয়ে এলেন।

এবার মেয়েরা আবার রিক্সায় উঠল। পথিমধ্যে এক বিরাট ঝুরিওলা বটগাছ দেখলাম। সকালেও আমরা এই বটগাছটি দেখেছিলাম। গাছের গুঁড়ির ফাঁপড়ে নাকি মা কালীর আবির্ভাব ঘটে বহু বৎসর আগে, তাই জায়গাটি সিমেন্ট দিয়ে বাঁধিয়ে দিয়েছেন। পাশেই কালী মন্দির আছে। মা কালী পদ্মাসনে বসে আছেন প্রকাণ্ড জিহ্বা বার করে।

এবার আমরা নিত্যানন্দ মহাপ্রভু যে মন্দিরে এসে লুকিয়ে ছিলেন সেই মন্দিরে এলাম। পথিমধ্যে মার রিক্সা আমাদের থেকে এগিয়ে যাওয়ায় মা বারবার পিছন ফিরে আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। সত্যি মার কী ভীষণ চিন্তা আশ্রমের মেয়েদের জন্য বলা যায় না। এক মুহূর্ত্তও চোখের আড়াল করতে চান না। মন্দিরের ভিতর সাধুবাবাদের নিয়ে প্রবেশ করে মা টর্চ দিয়ে দিয়ে সব ছবি ইত্যাদি দেখলেন। অবধূতজী থাকাতে আমরা আর মার পশ্চাৎ অনুগমন করতে পারলাম না। আমরা সব দল বেঁধে নাট মন্দিরের মেঝেতে বসে পড়লাম।

এবার সব ফিরতে হবে তাই আবার রিক্সাতে চেপে ফিরে আসা হল। সাধুরা শ্রীবাস অঙ্গনে ফিরে গেলেন। আমরা মাকে নিয়ে ফিরে এলাম গোবিন্দজীউর মন্দিরে।

ফিরে এসেই মা ছাদে বসবেন বলাতে তক্তপোষ ছাদে বার করে মার বিছানা করে দেওয়া হল। মা ঘরে একবার ঢুকেই পাঁচ মিনিটের মধ্যে বেরিয়ে এসে তক্তপোষে এসে বসলেন। সেদিন আকাশ পরিষ্কার থাকাতে অপূর্ব্ব জ্যোৎস্না। চারদিক যেন চাঁদের আলোয় ধুয়ে যাচ্ছে। মার তক্তপোষটি আমরা ঠিক চাঁদের তলায় পেতেছিলাম। মা সোজা হয়ে গায়ে চাদর জড়িয়ে খানিকক্ষণ স্থির হয়ে বসলেন। আমি মাকে পাখা করছিলাম। ঐ চাঁদনী রাতে "শুভ্র বস্ত্র পরিহিতা" মাকে যে কী অপরূপ দেখাচ্ছিল তা বলা যায় না। মার মাথার চারদিকে কালো চুলের উপর চাঁদের আলো ঠিক halo র (প্রভা-মন্ডলের) মত পড়েছিল। দেখতে দেখতে নবদ্বীপের কিছু কিছু লোক এসে জড় হতে লাগল। ছেলেরা একদিকে ও মেয়েরা একদিকে, আমরা একটা চাটাই এনে মেয়েদের দিকে বিছিয়ে ছিলাম।

একজন মেয়ে হঠাৎ সেই নিস্তব্ধতা ভেঙ্গে বলে উঠল — "মা তোমাকে ত কিছুতেই পাওয়া যায় না — কত ডাকি কিন্তু কিছুই হয় না — আর যে পারি না মা।"

মা খানিকক্ষণ চুপ করে রইলেন। তারপর হঠাৎ বলে উঠলেন, "মা, পারিনা বললেত হবে না, পারতেই যে হবে, ছাড়লেত চলবে না, তাঁকে যে ধরতেই হবে।" আবার খানিকক্ষণ সব চুপচাপ। হঠাৎ আমাকে বলে উঠলেন. "কাল কলকাতার কীর্ত্তনটা খুব ভাল হয়েছিল — তোর মাকে দেখলাম — দেখেই আমার খেয়াল হল যে চিত্রাটাকে ত পাঠিয়ে দিলাম, ওর কীর্ত্তন শোনা হল না। হরিবাবার শরীর খারাপ হওয়াতে অবধূতজী আসতে চায় না — আমাকে বলে "মা যা বলে" — আমি বললাম, "বাবারা যা করে।"

হঠাৎ খানিকক্ষণ চুপ থেকে আবার বলে উঠলেন, "পুরী যাবে নাকি?" আমি বললাম, "মা তোমার যা ইচ্ছা!" মা শুনে হাসলেন।

তখন একজন বৈষ্ণব সপরিবারে এসে উপস্থিত হলেন। মা তাঁকে দেখে বললেন, "বাবা ভাল আছ? বস।" তারপর আবার আমি জিজ্ঞাসা করলাম, "মা, তুমি দাক্ষিণাত্যে কতদিন থাকবে?" মা বললেন, "বাবাদের নিয়ে ছোটমেয়েটা এসেছে। এবার ছোটমেয়েটাকে বাবারা নিয়ে যাচ্ছে।" আমি বললাম, "তোমার কি আশ্রম আছে দাক্ষিণাত্যে?" উত্তরে মা বললেন, "মা, তোমার ঘরই তো আমার আশ্রম। আশ্রম মানে কি? শ্রম নাই যেখানে, এই ছাদই আমার আশ্রম। গাছের তলায় আমার আশ্রম। তোমরা আমাকে যেখানে রাখবে, সেখানেই আমার আশ্রম।"

মা আবার বললেন, "তিন বছর আগে হরিবাবা এই শরীরকে দাক্ষিণাত্যে নিয়ে যেতে চেয়েছিল, তখন যাওয়া হয়নি এবার যোগাযোগ হয়ে গেল।" অনেকক্ষণ ধরে পাখা করাতে আমি একবার এহাত একবার ওহাত করছিলাম। মা ঠিক বুঝতে পেরে বলে উঠলেন — "হাওয়া আছে।" এবার মা বিভুদাকে কীর্ত্তন করতে বললেন। ছোট্ট portable হারমোনিয়াম এনে বিভুদা "জয় হৃদয়বাসিনী শুদ্ধা সনাতনী শ্রী আনন্দময়ী মা" ভাইজী লিখিত গানটি গাইলেন। গানটি এত সুন্দর জমেছিল যে খুব ভাল লাগছিল শুনতে। হঠাৎ গানের মাঝে মা তড়াক করে

উঠে পড়ে বললেন, "তক্তপোষটা এদিকে করে দেত আমি একটু শোব।"

আমরা তাড়াতাড়ি তক্তপোষ সরিয়ে দিতে মা শুয়ে পড়লেন, ছোট বালিশটাতে মাথা রেখে এক পাশ বেঁকে । আলুলায়িত কেশ মাটিতে লুটাচ্ছে দেখে আমি আস্তে করে তুলে দিলাম। মার তখন অপূর্ব্বভাব। অনবরত চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ছে ও চাঁদের আলোয় দুই চোখের ধারা রূপোর মতন চিকচিক করছে। আমারও তখন অবস্থা সঙ্গীন। যে চোখ কচলিয়ে জল আমার কখনও বেরোয়না সেই চোখ দিয়ে আপনা আপনি জল পড়তে লাগল। মার কী অদ্ভুত লীলা —

বিভুদার গান শেষ হতেই মা বলে উঠলেন আমাকে, "তুই গান করতে পারিস? আমাকে একটা শোনাবি?" আমি খুবই ভাল করে জানতাম যে আমার তখন যা অবস্থা গলা দিয়ে আওয়াজ বেরোবে কিনা সন্দেহ তবুও মাকে কিছু বলতে পারলাম না। "ভজ রাধে কৃষ্ণ" করতে গিয়ে দেখি গলায় কোন স্বর নেই, ভাঙ্গা বা মোটা কোনরকম আওয়াজই বেরোচ্ছে না। যাই হোক নিজেকে সামলিয়ে নিয়ে আবার চেষ্টা করলাম। এবার কিছুটা বেরোল। দুতিন লাইন করে ওটা ছেড়ে দিলাম। দিয়ে আবার "ভজ রাধে কৃষ্ণ গোবিন্দম্" ধরলাম ও এবার কিছুটা গাইতে পারলাম। শেষ হতেই মা বলে উঠলেন, "মোহনানন্দের গান, বড় সুন্দর"। তারপর মা পুষ্পকে গাইতে বললেন। ও খুব সুন্দর দুটি ভজন গাইল। আমি তখন ঝরঝর করে কাঁদছি — দুঃখে না আনন্দে এখনও ঠিক বুঝতে পারি না।

মন্দিরের ঘন্টা শুনেই আমরা নীচে প্রসাদ নিতে গেলাম। প্রসাদ পেয়ে উপরে এসে দেখি মারও রাত্রের ভোগ হয়ে গেছে। দিদি মার প্রসাদ দিলেন। আমি খেয়ে ছাদে এসে দেখি যে মা দিদিকে আব্দার করে বলছেন, "দিদি, আমি ছাদে শোব। ওরা মশারী খাটাচ্ছে না, আমিও মশারী খাটাব না।" আমরা আগে থেকেই ঠিক করেছিলাম যে ছাদে মার সঙ্গে শোব। মা এবার নিজে বসে সকলের শোবার position ঠিক করে দিতে লাগলেন।

আমাকে বললেন, "তুই এই পাটীতে শো। আমার (মার) তক্তপোষের পাশে বুনি, গঙ্গা, পুষ্প ও বিশু পাশাপাশি ও দিদি আমার তক্তপোষের পিছনে "border"।

আমি মাদুরটা বেশ খানিকটা দূরে পাতবার উদ্যোগ করতেই মা বললেন, "আরো কাছে টেনে নিয়ে আন নে এবার সব শুয়ে পড়।" মা বিছানায় বসে রইলেন। চারটে খুব লম্বা বাঁশের pole এ মশারী খাটিয়ে দেওয়া হ'ল। মা মশারীর বাইরে বসে রইলেন আসনে, আমাদের দিকে face করে আমি তখন বললাম, "মা, তুমি কেন আমার গলা কেড়ে নিলে?" মা বললেন, "না রে, বাতাস লেগে ধরে গেছলো।" স্বামীজী এসে কাল ভোরে মেয়েদের নিয়ে যাবার কথা বলছিলেন। হঠাৎ হাওয়ার বেগে চারটি বাঁশের pole ই হুড়মুড় করে পড়ে গেল। আমরা ভাবতে না ভাবতেই দেখি যে চারটেই মার পেছন দিকে পড়ল। স্বাভাবিক প্রথায় এলোমেলো ভাবে একটাও পড়েনি। মা তাই দেখে আবার খিলখিলিয়ে মধুর হেসে উঠলেন। এবার স্বামীজী ভাল করে তক্তপোষের পায়ার সঙ্গে pole চারটি বেঁধে দিলেন।

আমি মশারী ও বালিশের বদলে তোয়ালে জড়িয়ে শাড়ীর পুঁটলিকে বালিশ বানিয়ে এনে রাখলাম। মাকে রাতে ভাল করে দেখব বলে চশমাও পরেছিলাম। মা এবার শুয়ে পড়লেন। আমরা মাথার দিকে মশারীর পেছনে

সাদা চাদর দিয়ে ঘিরে দিলাম কারণ অন্য side এ ছেলেরা শুয়েছিল। বুনিদি কাল মাকে ছেড়ে চলে যাবে তাই ফোঁস ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেলছিল। তাই শুনে মা বললেন, "বুনি, হেলায় নিঃশ্বাস অমনি করে ফেলিস না।"

এবার আমরা মার তক্তপোষের চারদিকে কিছুক্ষণ বসে রইলাম চুপ করে, মার শরীরটা ও পড়ে থাকল। মা বললেন, "তোরা শুয়ে পড়। চিত্রা তুই মশারীটা পরে শুয়ে পড়।" আমি মার কথা মতন মশারী চাদরের মতন গায়ে জড়িয়ে শুয়ে পড়লাম। খানিকক্ষণ পরে দিদি এসে শুলেন। চারদিক নিস্তব্ধ কেবল দূরে হরিসংকীর্ত্তন শোনা যাচ্ছে।

হঠাৎ মা বলে উঠলেন, "দিদি, চিত্রার তবে কিছুটা পূর্ণ হল কী বল?" এরপর আর কোন কথাবার্ত্তা নেই। মা আমার দিকে পাশ ফিরে একটা হাত মাথার তলায় ও অপর হাত মাথা ও মুখের উপর ফেলে শুয়েছিলেন।

আমি চিৎ হয়ে শুলাম। চশমা খুলে ফেললাম যাতে মা কিছু বলেন।

এবার এক ভারী মজার ব্যাপার হল, নিত্যকর্ম (জপ) করতে গিয়ে দেখি তা যেন আর থামে না। ঠিক ঘড়ির pendulum এর মতন উঠছে আর নামছে। এমনি সময় কত আজে বাজে কথা মনে হয়। তখন যেন মন স্থির ও শান্ত ও নাম ছাড়া কিছুই মনে আসছিল না। হাতে পায়ে মশা কামড়ানোর দরুন হাত পা নাড়ছি কিন্তু কাজ ঠিক হচ্ছে, এ নির্ঘাৎ মার কৃপা তা না হলে এমন শত চেষ্টা করেও তো ওরকম শ্বাসে শ্বাসে নাম জপতে পারি না।

হাত পা খুব ঘসছি মশার কামড়ে, এই দেখে মা বললেন — "চিত্রা তোর কষ্ট হলে ভেতরে গিয়ে শো।" আমি বললাম, "না মা ঠিক আছে। ভিতরে বড্ড গরম।" হাতঘড়ি পরা ছিল দেখি তখন রাত ১।। টা। মা তাহলে ঘুমোননি।

এবার মার দিকে চেয়ে দেখি যে ঐ জ্যোৎস্না রাতেও মাকে কীরকম কালো দেখাচ্ছে। আরো একটা জিনিষ অনুভব করলাম মাকে যেন ভীষণ স্থূলাকৃতি দেখাচ্ছে। পাশ ফিরে শোওয়াতে যেন মনে হচ্ছিল একটা বিরাট দেহ পড়ে আছে। মাঝে আমি চোখ বুজেছিলাম কারণ একটা কথা স্পষ্ট মনে হচ্ছিল যে মা আমার হাবভাব নড়াচড়া সব যেন বেশ বুঝতে পারছিলেন।

খানিকক্ষণ পর চোখ চেয়ে দেখি মা যেন নেই — কিন্তু আসলে মা চিৎ হয়ে শোওয়ার দরুণ দেহটা বিছানার সঙ্গে মিশে গেছে — একটু আগে দেখলাম বিরাট আর এখন যেন অন্যরকম।

মশার কামড়ে দিদি উস্‌খুস করে ঘরে চলে গেলেন। গঙ্গাও দিদির বিছানা করে দেবে বলে ঘরে গেল। যেই ওরা চলে গেছে অমনি দেখি মা বিছানা থেকে তড়াক করে উঠে ছাদ cross করে ঘরের দিকে গেলেন। আবার কিছুক্ষণ পরে দিদির সঙ্গে ফিরে এসে বিছানায় ঢুকলেন। এবার আমার দিকে face করে আসনে বসে চুল এলিয়ে একভাবে কিছুক্ষণ রইলেন। আমি ভাবলাম মুখের দিকে তাকাব কিন্তু কে যেন আমার সে ইচ্ছা দমন করল। কিছুতেই মার মুখের দিকে চাইতে পারলাম না। তারপর মা যে কখন শুয়ে পড়লেন জানিনা। আমার চোখ দুটি বন্ধ রইল ও আমি জেগেও চাইতে পারলাম না।

(ক্রমশঃ)



আমার মা আনন্দময়ী

(৯)

— বিশুদ্ধা

কন্যাপীঠে আমি যখন আসি তখন আমাদের পড়াশুনার তেমন ব্যবস্থা ছিল না। শুধু বড় গঙ্গাদি সংস্কৃত মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ পড়াতেন আর বিল্লোজী ইংরাজী পড়াতেন। মেয়েরা গঙ্গাদির তত্ত্বাবধানে কলকাতায় গিয়ে সংস্কৃত আদ্য মধ্য পরীক্ষা দিত। তখন বছরের বেশী সময় মা কাশীতে থাকতেন, আর মা থাকা মানেই নিত্য নূতন উৎসবাদি চলতো এবং প্রচুর ভক্ত সমাগমে আশ্রম উৎসব মুখর হয়ে উঠতো। পড়াশুনা আমার কোন দিনই ভাল লাগে না। বরং বারোমাস উৎসবানন্দে বেশ হৈ চৈ করে কাটতো। মায়ের পূত সান্নিধ্য, উৎসব, সাজানো, পূজা, গান কীর্ত্তন, ভাণ্ডারা সব মিলিয়ে দারুণ আনন্দই আনন্দ।

ওদিকে আমার বাবা ছেলেমেয়ের পড়াশুনার ব্যাপারে বিশেষ আগ্রহী ছিলেন। কিন্তু তা হচ্ছে না দেখে আমাকে বাড়ীতে নিয়ে যাবার কথা মাকে বললেন। আমি কিছুই জানিনা। একদিন আমরা মাকে প্রণাম করতে গেছি, মা আমাকে বললেন — 'কি গো, শুনছো ত, তোমার বাবা তোমাকে পড়াশুনার জন্য বাড়ীতে নিয়ে যেতে চায়। কি করবে, এখানে ত তেমন লেখাপড়ার ব্যবস্থা হয় নাই।' আমি হেসে বললাম — 'আমি বাড়ী যাবো না। বাবার ত আরো ছেলেমেয়ে আছে তাদের লেখাপড়া শেখান, একজন না হয় নাই পড়লো।' মা আমার কথা শুনে দাদাভাইকে হেসে বললেন — "খুকুনী, শুনছস্ বিশুদ্ধা কি কয়।" দাদাভাইও বেশ খুশী হলেন যে আমি বাড়ী যেতে চাই না শুনে। বাবা ও দিদি যখন আমাকে বাড়ীতে নিয়ে যেতে চাইলেন আমি একই কথা বলে আর বাড়ী গেলাম না। দিদি (শ্রদ্ধা) বললো — 'হ্যাঁ, আশ্রম ভাল লাগবে না — এখানে সব সময় উৎসব আনন্দ, নেচে বেড়াচ্চে, খুব মজা, পড়াশুনার বালাই নেই।' বেশ চলছিল, হঠাৎ মার খেয়াল হলো দাদাভাইকে বললেন আমাকে আর চন্দনদিকে ম্যাট্রিক পরীক্ষা দেওয়াতে। জোড়াতালি দিয়ে কোনমতে বিল্লোজী, সতীদি, রেণুদি, কমলদা ও আমার বাবা কিছু কিছু পড়ালেন। মনে আছে ভাণ্ডারার রান্না করছি, কমলদা ডেকে বললেন পরীক্ষার ফর্মের জন্য ফটো তুলতে হবে। সেই অবস্থায় ফটো তুললো। রাত্রিবেলা ফর্ম ভরলাম কারণ পরদিনই ফর্ম পাঠাবার শেষ দিন। পরীক্ষা দিতে কলকাতা যাবার আগে মাকে পেন ছুঁইয়ে প্রণাম করলাম, মা মিষ্টি হেসে বললেন — "ভাল পড়লে ভাল পাশ।" এই উপলক্ষ্যে কলকাতা যাবো খুব আনন্দ, কিন্তু পড়াশুনা কি হয়েছে তার ঠিক নেই। কলকাতা রওনা হলাম। সঙ্গে সতীদি, বিমলাদি ও আমার বাবা গেলেন। তখন কলকাতায় একডালিয়াতে মার ছোট্ট আশ্রম। অবনীদা (শর্মা) আশ্রমের দায়িত্বে আছেন। মুক্তিবাবা পা ভেঙ্গে পি.জি.হাসপাতালে ভর্ত্তি ছিলেন, কুসুমদা তাঁর সেবার জন্য আশ্রমে আছেন। কুসুমদা অবনীদাকে বললেন — দিদির কন্যাপীঠের মেয়েরা এসেছে, ওদের থাকা খাওয়ার যেন অসুবিধা না হয়। অবনীদা আমাদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করলেন। কুসুমদাও দেখাশুনা করতেন। মাতৃভক্ত শশধরদা (ভট্টাচার্য্য) আমাদের পরীক্ষা দিতে যাওয়া আসার ব্যবস্থা

করলেন। পরীক্ষার হলে গিয়ে দেখলাম syllabus বদলে গেছে, কোনমতে পরীক্ষা দিলাম। ফল বেরোলে দেখা গেল আমরা দুজনেই ফেল করেছি। পরের বছর আবার পরীক্ষা দিয়ে পাশ করলাম। ম্যাট্রিকের পর চন্দনদি মার নির্দ্দেশে সংস্কৃত মধ্যমা, শাস্ত্রী, আচার্য্য ধারায় পড়তে লাগলো আর আমাকে মা আই.এ. পড়তে বললেন। সেই সময় মৌনীমার ছেলে রাখালদা আমাকে আই.এ. এবং গঙ্গাদিকে (ছোট) ম্যাট্রিক পড়াবার জন্য নিযুক্ত হলেন।

আমার ম্যাট্রিক পরীক্ষার পর ১৯৫২ সনে মা কয়েকদিনের জন্য পুরী যান। কাশী থেকে রওনা হবার আগে মাকে প্রণাম করতে গেছি, দাদাভাই গম্ভীর ভাবে বললেন — 'কী? মার সঙ্গে যাইতাছ, পারবা ত সব করতে?' মা হেসে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন — "দিদি বকিস্ ক্যান, আমি ত দেখছি ওর কপালটা জ্বলজ্বল করছে।" আমি মাকে প্রণাম করলাম, মা মাথায় হাত দিয়ে একটু আদর করে দিলেন। ট্রেনে আমরা থার্ড ক্লাসে, আর মা ও দাদাভাই ফার্স্ট ক্লাসে উঠলেন। মাঝে মাঝে স্টেশনে ভক্তরা মার দর্শন করতে আসছে, মার জন্য ফল, মিষ্টি, খাবার নিয়ে আসছে। মা দাদাভাইকে দিয়ে কিছু কিছু আমাদের জন্য পাঠিয়ে দিচ্ছেন।

পরদিন সকালে হাওড়া স্টেশনে পৌঁছলাম। কলকাতার বহু ভক্ত স্টেশনে মার দর্শনে এসেছেন। শ্রীআপতাপ মিত্র মাকে ও আমাদের তাঁর বাড়ী দমদমে নিয়ে গেলেন। সুন্দর আয়োজন করেছেন। সামিয়ানা টাঙ্গানো সৎসঙ্গের জায়গায় মাকে বসিয়ে আপতাপদার স্ত্রী রেণুদি মায়ের চরণ ধুইয়ে পুষ্পাঞ্জলি ও মালা চন্দন দিয়ে পঞ্চ প্রদীপে আরতি করলেন। মা হাসিমুখে উপস্থিত সকলের হাতে ফল মিষ্টি দিলেন, কুশলবার্তা নিলেন। প্যাণ্ডেল থেকে রেণুদি ও আপতাপদা মাকে ঘরে নিয়ে এলেন। মায়ের জন্য সুন্দর ঘর করেছেন, নিখুঁতভাবে সাজানো। পাশেই সিঁড়ির নীচে ছোট্ট রান্নার জায়গা। আলমারীতে থরে থরে বাসন, চাল, ডাল, তেল, মশলা ঘরে তৈরী বড়ি, আচার কতকি সাজিয়ে রেখেছেন। গরমের দিন, তাই দাদাভাই মেঝেতে শীতল পার্টি পেতে মার বিশ্রামের জায়গা করে দিয়ে আমাকে নিয়ে মার রান্না করতে গেলেন। ঘরে এত জিনিষ থাকা সত্ত্বেও দাদাভাই বললেন মার ঝুড়ি থেকে চাল, ডাল, মশলা যা দরকার নিয়ে আসতে। মা যে ঘরে শুয়ে আছেন, সেই ঘরেই মায়ের মাথার দিকে কাপড়ে বাঁধা বেতের বাস্কেট খুলে সব নিতে হবে। দাদাভাই আরো বলে দিলেন — বাস্কেটের কাপড় খুলে গুছিয়ে সব আনবে আবার যেমন বাঁধা আছে সেইভাবে বেঁধে রেখে আসবে, একটা জিনিষও যেন পড়ে না আর একটুও শব্দ করবে না। মার বিশ্রামের যেন ব্যাঘাত না হয়। কতবার যে কত টুকিটাকি জিনিষ নিতে ঘরে ঢুকলাম সতর্কভাবে নিঃশব্দে আর আসতে যেতে মার দিকে তাকিয়ে দেখছি। মা হাত পা ছড়িয়ে মাথার একরাশ চুল ওপরের দিকে এলিয়ে দিয়ে স্মিত মুখে চোখ বন্ধ করে শুয়ে আছেন — একেবারে মা দুর্গার মত দেখাচ্ছিল। সারা শরীরে যেন দিব্য জ্যোতি ফুটে বেরোচ্ছিল — ভাষায় বোঝাতে পারবো না।

তিন দিন মা দমদমে রইলেন। খুব সৎসঙ্গে গান কীর্ত্তন আনন্দ হলো। মার অনুমতি নিয়ে আমার বড়দা (এয়ার পোর্টে চাকরি করতো) আমাদের অনেককে নিয়ে গেল এরোড্রোম ও এরোপ্লেন দেখাতে। কদিন মার সঙ্গে কলকাতার কিছু কিছু ভক্তের আহ্বানে তাদের বাড়ীও ঘোরা হলো। এরপর কলকাতা থেকে মার সঙ্গে আমরা পুরী রওনা হলাম।

পরদিন ভোরবেলা পুরীতে পৌঁছলাম। স্টেশনে কালো একটা স্টেশন ওয়াগন মার জন্য অপেক্ষা করছিল। মা সামনের সীটে বসেছেন, দাদাভাই আমি ও পারুলদি পিছনে বসেছি। স্টেশন থেকে আশ্রমে যাবার পথে মা দেখাচ্ছেন — দ্যাখ্ এই ধর্ম্মশালায় শরীর প্রথম পুরীতে এসেছিল, ঐ দ্যাখ কি সুন্দর নীল সমুদ্র, সমুদ্রের পাড়েই তোমাদের আশ্রম। আশ্রমে পৌঁছলাম। স্থানীয় ভক্তবৃন্দ শঙ্খধ্বনি করে মাকে স্বাগত জানালেন। ছোট্ট আশ্রম। দোতলায় মার ঘর। পাশের ঘরে আমাদের জিনিষপত্র রাখা হলো। দাদাভাই পারুলদিকে নিয়ে মায়ের রান্নার ব্যবস্থা করতে গেলেন। আমি মার কাছে আছি। ঘরে কোথায় কিভাবে সব রাখা হবে মা দেখিয়ে দিলেন আমি গুছিয়ে রাখলাম।

মার সঙ্গে কলকাতা থেকে বিনুদা (শ্রী শরদিন্দু কুমার নিয়োগী), শ্রী অরবিন্দ বোস ও পরমানন্দ স্বামিজী এসেছেন। পুরী আশ্রমে মায়ের পুরানো ভক্ত মেজর ডা. গিরীন্দ্র মিত্র (ক্ষমাদির বাবা), তাঁর বৌদি ও দুর্গাদি আছেন। বিকালে মা সকলকে নিয়ে সমুদ্রের ধারে হাঁটতে গেলেন। বড় বড় ঢেউ পাড়ে ভেঙ্গে পড়ে বহুদূর পর্য্যন্ত এসে মায়ের শ্রীচরণ ধুয়ে দিয়ে যাচ্ছে। আমি অনেক ঝিনুক কুড়োলাম। সূর্য্যাস্তের পর আশ্রমে ফিরে এসে বাইরে চত্বরে বেদীর উপর মা ও আমরা নীচে বসলাম। সন্ধ্যা কীর্ত্তন করলাম। তারপর মা উপস্থিত ভক্তবৃন্দের সঙ্গে কিছু কথা বলে উপরে চলে এলেন। উপরে মার ঘরের সামনে বারান্দায় সিমেন্টের বাঁধানো বসবার জায়গা আছে, মা সেখানে বসলেন। জানালা দিয়ে ঝড়ের বেগে সমুদ্রের হাওয়া এসে মার চুল উড়িয়ে দিচ্ছে। মায়ের সামনে মাদুরে স্বামিজী, গিরীনদা, বিনুদারা বসে নানা তত্ত্ব আলোচনা করছেন।

পরদিন সকালে দাদাভাই রান্না করতে গেছেন, আমি মার দরজায় বসে আছি। মা বেরিয়ে এসে বললেন — 'সকালে কিছু খেয়েছো? তোমাদের ত কন্যাপীঠে সকালে জলখাবার খাওয়া অভ্যাস।' আমি সলজ্জে বললাম — 'না খাইনি।' মা আলমারী খুলে কলা, একছড়া লিচু ও একভাঁড় রাবড়ি দিয়ে বললেন — 'বসে বসে এগুলো খাও।' বলে মা আবার গিয়ে শুয়ে পড়লেন। আমি প্রথমেই একটা লিচু ছাড়িয়ে যেই মুখে দিয়েছি, অমনি মা ডাক দিয়েছেন — 'বিশুদ্ধা!' আমি ত লজ্জায় জবাবও দিতে পারছি না, উঁ উঁ করছি। মা বললেন — 'ঠিক সাড়ে ন'টায় এই শরীরকে ডেকে দেবে।' আমি আবার নিশ্চিন্ত মনে রাবড়ি, কলা খাচ্ছি, মা উঠে এসে বললেন — "নীচে তোমাদের বাথরুমের উপর ত ছাদ নাই, স্নান ইত্যাদি করার সময় বাথরুমের এদিককার দেওয়াল ঘেঁষে দাঁড়াবে তবে উপর থেকে আর দেখা যাবে না" ইত্যাদি। আমি হাঁ করে মার দিকে তাকিয়ে রইলাম। ভাবছি সত্যি মার কত খেয়াল আমাদের জন্য।

একদিন মা আমাদের নিয়ে শ্রীজগন্নাথ দর্শনে গেলেন। আগাগোড়া মা আমার হাত ধরে আছেন। একেবারে মনিবেদীর সামনে নিয়ে গিয়ে বলছেন — "ঐ দ্যাখ্ বিশুদ্ধা, জগন্নাথ দর্শন কর।" জগন্নাথের কি অপূর্ব্ব রূপ যে দেখলাম, যেন চতুর্ভুজ বিষ্ণুমূর্তি, দিব্য ঝলমলে সাজ, চোখ ঝলসে যাচ্ছে। আশ্চর্য্যের বিষয় তারপর অনেকবার জগন্নাথ দর্শনের সৌভাগ্য হয়েছে, কিন্তু ঐরূপ আর দেখিনি।

রাতে মা ঘরে বসে আছেন, ঘরের সামনে বারান্দায় স্বামিজী, গিরীনদারা ও পাশের ঘরে দরজায় দাদাভাই ও আমি বসে মার কথা শুনছি। কথায় কথায় শ্রীজগন্নাথ মূর্ত্তির সম্বন্ধে কথা উঠলো। মা বললেন — "কি হয়েছে জান না? শ্রীমতী রাধার অথবা ভক্তের যাই বলো প্রেম ও ভাব দেখে জগন্নাথ স্বয়ং ভাববিহ্বল রূপ ধরেছেন। ভাবাবেশে হাত দুটো যেন বিগলিত নিরাকার রূপ ধারণ, করেছে আর অত্যন্ত বিস্ময়ে চক্ষুদ্বয় বিস্ফারিত" বলতে বলতে মা হাত দুটো কেমন ভাবে তুলে ধরে আর চোখ দুটি বেশ গোল করে দেখালেন। যেন স্বয়ং জগন্নাথ আমাদের সামনে। মায়ের ভাবটিও যেন কেমন ভাব বিগলিত। আমরা সকলে মায়ের এই বিচিত্র রূপ দর্শনে চমৎকৃত হয়ে মাকে প্রণাম করলাম।

কদিন খুব বেড়ানো হলো পুরীধামে। রোজই মন্দির থেকে মহাপ্রসাদ আসতো। রাত্রে মার সঙ্গে উপস্থিত সকলে উঠোনে বসে পদে পদে মহাপ্রসাদ খাওয়া, আবার পরদিন মার হাতের মাখা অপূর্ব্ব পান্তা। একই হাঁড়ি থেকে নিয়ে মার মুখে দিচ্ছি, আবার মাও আমাদের মুখে দিচ্ছেন — অপূর্ব্ব লীলা — আনন্দই আনন্দ। বিনুদা ও অরবিন্দ দাদুর আগ্রহে ও ব্যবস্থাপনায় জগন্নাথদেবের কত রকমের ভোগের প্রসাদ আসতো। একদিন মা আমাকে সমুদ্রে স্নান করতে পাঠালেন। সমুদ্রের ঢেউয়ের ধাক্কায় কাপড় খুলে না যায় সেজন্য কেমন করে কাপড় পরে গামছা ভাল করে বেঁধে নামতে হবে সব দেখিয়ে দিলেন। ২/৩ জনকে সঙ্গে দিলেন যাতে অসুবিধা না হয়। আবার যখন আশ্রমের সামনে বালুর ওপর দিয়ে স্নান করতে যাচ্ছি তখন দেখি মা উপরের জানলায় দাঁড়িয়ে দেখছেন। যতক্ষণ না স্নান করে ফিরলাম একভাবে মা দাঁড়িয়ে রইলেন। কয়েকদিন যেন এক মুহূর্তের মত কেটে গেল।

আমরা মার সঙ্গে কলকাতা হয়ে কাশী ফিরে গেলাম।

(ক্রমশঃ)



আমাদের জীবনে আনন্দময়ী মা

(২১)

— শ্রী প্রতিভা কুমার কুণ্ডু

শুধুমাত্র আগ্রহ আকুলতা নিয়ে শত বাধা বিপত্তি পার করে সৎসঙ্গে উপস্থিত হওয়া। তারপর তো মা আছেন, কিসের চিন্তা? ভাগবতী কথার সভা তো সৎসঙ্গই। দক্ষিণ কোলকাতায় যোধপুর পার্কের মাতৃমন্দিরে গত ৩ রা ডিসেম্বর থেকে ১১ ই ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ভাগবত সপ্তাহ পারায়ণ মহাযজ্ঞ অনুষ্ঠিত হোল। দশজন মাতৃভক্ত ব্রতী হয়েছিলেন। তাঁদের উদ্যোগেই এই ভাগবত সপ্তাহ পারায়ণের আয়োজন। আর আমাদের কয়েকজনের মাতৃচরণে নিবেদিত অখণ্ড কর্মযজ্ঞ এই সুসফল বিশেষ মাহাত্ম্যপূর্ণ ভাগবত সপ্তাহ পারায়ণ মহাযজ্ঞের একটি উপলক্ষ্য বা নিমিত্ত মাত্র। এই উৎসবের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল সমস্ত মাতৃভক্তবৃন্দের আনন্দলাভ।

কোলকাতার যোধপুর পার্কে প্রথম ভাগবত সপ্তাহ পারায়ণ মহাযজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়েছিল ১৯৭৪ সনে শ্রীশ্রীআনন্দময়ী মায়ের উপস্থিতিতে এবং মায়েরই নিখুঁত পরিচালন-নির্দ্দেশে। ২৩ শে ফেব্রুয়ারী মা যোধপুর পার্কে এসেছিলেন এবং ৫ ই মার্চ চলে গিয়েছিলেন নিউ আলিপুরে। ঐ উৎসব শেষে মা বলেছিলেন, “এমনটি আগে হয়নি, আর হবেও না।” তাঁর মুখ নিঃসৃত কোনো বাণী ব্যর্থ হবার নয় — ভাইজীর কথা।

২৬ বছর পর যোধপুর পার্কে আবার এই দ্বিতীয় ভাগবত সপ্তাহ পারায়ণ। আমাদের সমস্ত আধ্যাত্মিক উৎসবই শ্রীশ্রী আনন্দময়ী মায়ের প্রীত্যর্থে উৎসর্গীকৃত। উপরন্তু ভক্তবৃন্দ যদি আনন্দ লাভ করেন তাহলেই উৎসব সফল হয় এবং মায়ের প্রীতিও সাধিত হয়। আমাদের শুধু সবিশেষ প্রচেষ্টা। সম্পূর্ণ নিষ্কাম কর্মযোগের সাধনা।

প্রতিদিনই সন্ধ্যায় ভাগবত ব্যাখ্যা শোনার পর মাতৃভক্তেরা যখন বাড়ী ফেরার জন্য “জয় মা” বলে বিদায় নিতেন, তখন অধিকাংশ ভক্তই সজলচোখে বলতেন, “অপূর্ব! কি সুন্দর পরিবেশ! কি সুন্দর কথা! এমনটা আর আগে কখনো দেখিনি।” সকলের আনন্দপ্রকাশের ভঙ্গীতে ও ভাষাতে হয়তো সামান্য বিভিন্নতা থাকত, কিন্তু মূল ভাবটি সকলেরই একই, সেটি হোল অপরিসীম আনন্দলাভ। প্রতিদিনই ভাগবতপ্রেমীদের মনে অনাবিল আনন্দরূপে শ্রীশ্রীমা প্রতিভাত হতেন, তাঁদের হৃদয়ে মা স্নিগ্ধ পবিত্র অনুভূতিরূপে প্রকাশিত হতেন। ভাগবত পারায়ণ মহাযজ্ঞের সম্পূর্ণ সপ্তাহব্যাপী মায়ের স্বাধিষ্ঠান ছিল ভাগবতপ্রেমীদের ও ব্রতীদের মন ও হৃদয়। শ্রীশ্রীমা স্বয়ং যখন আনন্দপ্রদায়িনী মূর্ত্তিমতী কৃপা তখন তো সকলেরই আনন্দাশ্রু ঝরবেই। প্রার্থনা করি, ব্রতীদের উপর এবং শ্রোতা ভক্তবৃন্দের উপর মা আরও কৃপা বর্ষণ করুন।

এত কথা বলা এই জন্য যে সর্বস্তরে সব ব্যাপারে মায়ের কৃপা ও খেয়াল না থাকলে কোনো উৎসবই সাফল্যলাভ করে না। এবারের ভাগবত সপ্তাহ শেষ হতে না হতেই সমস্ত ভাগবতপ্রেমীর জিজ্ঞাসা ও অপেক্ষা — আবার কবে ভাগবত হবে? সহজ উত্তর এই, যখন আবার মাতৃকৃপার সঙ্গে আমাদের মন ও হৃদয়ের যোগসূত্র স্থাপিত হবে শ্রীমদ্‌ভাগবত পারায়ণকে উপলক্ষ্যে করে, তখনই হবে। প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগবত সপ্তাহ পারায়ণের

মাঝখানে সুদীর্ঘ ২৬ বছর পার হয়েছে এই যোগসূত্রটি স্থাপিত হতে।

জ্ঞাতব্য তথ্যাদি জানানো প্রয়োজন। শ্রীমদ্‌ভাগবত মূলপাঠ করতেন পণ্ডিত শ্রীরবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, প্রতিদিন সকালে মাতৃমন্দিরে। মন্দিরের নীচে ভাগবত ব্যাখ্যার চৌকি স্থাপিত হয়েছিল। ভাগবত ব্যাখ্যা করতেন স্বামী নির্মলানন্দ গিরিজী মহারাজ। ভাগবত সপ্তাহ পারায়ণ মহাযজ্ঞের উদ্বোধনী ভাষণ দেন ডঃ গোবিন্দগোপাল মুখোপাধ্যায়। পূজারী নিত্য প্রত্যুষে মন্দিরে শ্রীশ্রী লক্ষ্মীনারায়ণ ও অন্যান্য দেবদেবীর পূজা করে আরতি করতেন। তিনিই মূলপাঠের সময় ধারকের ক্রিয়া করতেন। দুজন জাপক ছিলেন। সকলেই নিজ নিজ ক্রিয়াকর্ম অত্যন্ত নিয়মনিষ্ঠার জন্যেই উৎসব প্রাঙ্গণের সমুদয় বায়ুমণ্ডল ও মন্দির সংলগ্ন পরিবেশ অতিশয় পবিত্র স্নিগ্ধ শান্ত ও আনন্দদায়ক হয়ে উঠেছিল।

পরিবেশ এই অনুভূতির অবস্থায় পরিণত হলে আমরা প্রায়শই বলে থাকি — একটা vibration এর সৃষ্টি হয়েছে। সহজ বাংলায় শান্তিপ্রদ চৈতন্যময় পরিবেশ সৃষ্ট হয়েছে। মা স্থূল শরীরে দর্শন দেবেন, তবে মায়ের দিব্য উপস্থিতি প্রমাণিত হবে, এটি ভ্রান্ত প্রত্যাশা। প্রতিদিন তিন ঘন্টা করে এই সুন্দর মা-ময় পরিমণ্ডলে বসে শ্রীমদ্‌ভাগবতের অপূর্ব ব্যাখ্যা শোনা — কতখানি সুকৃতি থাকলে সেটা সম্ভব হয়, সেকথা সহজেই অনুমেয়। কথায় বলে, ভাগ্যবানের বোঝা ভগবান বয়। এখানেও ঠিক তাই। ভাগ্যবান ভক্তদেরকে আনন্দ দেওয়া যেন মায়েরই দায়।

স্বামী নির্মলানন্দজী ভাগবতের সুন্দর ব্যাখ্যা করতেন এবং তার সঙ্গে মাঝে মাঝে নিজ জীবনের অভিজ্ঞতার কথা ও সর্ব্বোপরি মায়ের কথা মিলিয়ে মিশিয়ে বলতেন। মাতৃকৃপায় প্রতিদিন ব্যাখ্যা এতটা হৃদয়গ্রাহী হোত যে শ্রোতারা কখনো স্তব্ধ হয়ে শুনতেন, কখনো নির্মল আনন্দে হাসতেন, কখনো আনন্দে তাদের চোখ সজল হয়ে উঠত, আবার কখনো সূক্ষ্ম অনুভূতিতে উদ্বেল হয়ে হৃদয় মথিত করে কাঁদতেন। এ এক অভূতপূর্ব অভিজ্ঞতা। আরও একটি কথা বলা বিশেষ প্রয়োজন। জাপক দুজনের অক্লান্ত পরিশ্রমে এই ভাগবত পারায়ণ মহাযজ্ঞ সম্পূর্ণ সফল। ঘড়ির কাঁটা ধরে ভোর পাঁচটা থেকে রাত এগারোটা পর্য্যন্ত নিয়মশৃঙ্খলা রক্ষা করে তাঁরা যেভাবে কাজ করে গেছেন, এক কথায় অকল্পনীয়। যতই তাঁদের প্রশস্তি বন্দনা করা হোক, অত্যন্ত অল্প বলা হবে। মা ওঁদের কৃপা করুন, আশীর্বাদ করুন, আমাদের সকলের এই প্রার্থনা।

ভাগবতের আমন্ত্রণপত্রটিও খুবই সুন্দর হয়েছিল। এই মহাযজ্ঞের প্রারম্ভেতেই আমন্ত্রণপত্রটি হাতে পেয়ে সকলেরই মনে হয়েছিল, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সকলের হৃদয়ে আসন পেতে বসে পড়েছেন। সকলেই শ্রীকৃষ্ণের ছবিটি ঠাকুরের সিংহাসনে রেখেছেন নয়তো কাঁচের আলমারিতে সযত্নে রক্ষিত করেছেন। মন্দিরে প্রত্যুষে নিত্য পূজা ও আরত্রিক, ভাগবত পূজন ও মূল পাঠ, বৈকালে ভাগবত পূজন ও আরত্রিক, সঙ্গে আরতির গান, ভাগবত ব্যাখ্যা, প্রতি এক ঘন্টা অন্তর ব্যাখ্যার স্বল্প বিরতি, সেই সময় শ্রীকৃষ্ণের সুললিত নামগান, ব্রতীদের সংযমিত বিভিন্নতর আহার-ব্যবস্থা, তাঁদের জন্য যৎসামান্য বিশ্রাম-ব্যবস্থা, রাত্রে শ্রীশ্রীমায়ের প্রতিকৃতিতে শয়ন-ব্যবস্থা ইত্যাদি সবকিছুই মহাযজ্ঞের প্রয়োজনীয় অঙ্গ। সবই খুবই সুষ্ঠুভাবে সুসম্পন্ন হোত।

শেষ দিন রবিবার, ১১ ই ডিসেম্বর, অগ্রহায়ণ পূর্ণিমাতে যজ্ঞ ও পূর্ণাহুতি এবং ভক্তবৃন্দ আপ্যায়ন অর্থাৎ ভাণ্ডারা। আরও ছিল দ্বাদশ ব্রাহ্মণ পূজন। মূল পাঠক, ধারক ও দুজন জাপক, এই চারজন যজ্ঞকার্য্য সমাধা করলেন। ভাণ্ডারাতে প্রায় তিনশ জন ভক্ত প্রসাদ গ্রহণ করলেন।

ভাগবত শেষে কয়েকদিন ধরে অনেক টেলিফোন এসেছে, এখনও আসছে, দুমাস পরেও। সকলেরই মূল কথা একই — ভাগবতের কথা ভুলতে পারছি না, বাড়ীতে একদম টিঁকতে পারছি না, ভয়ঙ্কর ফাঁকা ফাঁকা লাগছে, আবার কবে ভাগবত হবে, ইত্যাদি। অনেকেই টেলিফোন করার সময় কেঁদে ফেলছেন।

সম্পূর্ণ ভাগবত ব্যাখ্যা টেপরেকর্ড করা হয়েছে। ভাগবত সপ্তাহের প্রথম দিন ও দ্বিতীয় দিন ভিডিও রেকর্ড করা হয়েছে। স্বামী তন্ময়ানন্দ গিরিজী মহারাজ, ব্রহ্মচারী নির্বাণানন্দজী, মহামিলন মঠের কিংকর সামানন্দ, কুমারী ছবি বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রমুখ সাধু মহাত্মা ও গুণীজন উপস্থিত হয়েছিলেন। চারপাঁচজন ভক্ত শ্রীশ্রীমায়ের প্রতিকৃতিতে মাতৃশরীরের দিব্য দর্শন পেয়েছিলেন।

একটি প্রত্যক্ষ ঘটনার কথা বলে এই ছোট্ট আখ্যায়িকা শেষ করব। গড়িয়াহাটে 'মেঘমল্লার' নামে একটি বহুতল বাড়ীর কমপ্লেক্স আছে। শ্রীমতী তপতী মিত্র সেখানেই থাকেন। তিনি তাঁর বাড়ীতে মাঝে মাঝে দু'এক ঘন্টা ভাগবত পাঠ করান। তিনি মায়ের কথা শুনেছেন, জানেন। ভক্তিমতী শিক্ষিতা মহিলা। সম্ভবতঃ ৭ ই ডিসেম্বর, তিনি স্বপ্ন দেখলেন, কোথাও সুন্দর পরিবেশে ভাগবত ব্যাখ্যা হচ্ছে, সাধু মহাত্মা বসে আছেন, শ্রীশ্রীমায়ের প্রতিকৃতিতে নীল রং-এর শাড়ি পরানো আছে, মায়ের সাদা কাপড় পরা প্রতিকৃতি, শ্রীমতী জয়শ্রী বসু মজুমদার গান করছেন, আর সমস্ত জায়গাটা কাঁপছে।

শ্রীমতী বসু মজুমদারও ঐ বহুতল বাড়ীতেই থাকেন। শ্রীমতী তপতী মিত্র (বয়স প্রায় চুয়ান্ন বছর) শ্রীমতী বসু মজুমদারের কাছ থেকে ঠিকানা পেয়ে ১০ ই ডিসেম্বর বৈকাল ৫.টা-১৫ নাগাদ যোধপুর পার্কের ভাগবত পারায়ণের উৎসবপ্রাঙ্গণে আসেন এবং শ্রীমতী বসু মজুমদারের কাছেই মাটিতে বসেন। তখন জয়শ্রীদিদিই গান করছিলেন।

শ্রীমতী মিত্র অবাক হয়ে দেখলেন, মায়ের প্রতিকৃতিতে নীল রংয়ের শাড়ি পরানো, সাধুরা বসে আছেন, গান হচ্ছে, হুবহু সেই স্বপ্নের পরিবেশ। তিনি মুহুর্মুহুঃ রোমাঞ্চিত হলেন। যোধপুর পার্কের মাতৃমন্দিরে আগে কখনো আসেননি, এই প্রথম এলেন। মা কৃপা করে তাঁকে প্রত্যক্ষভাবে ভাগবত সপ্তাহ পারায়ণের উৎসবপ্রাঙ্গণ দর্শন করিয়ে দিলেন। তাঁর বাড়ীর ভাগবত পাঠের সঙ্গে অবশ্যই এই ভাগবত পারায়ণ মহাযজ্ঞের একটা সূক্ষ্ম যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছিল। তারপর তো তিনি মাতৃকৃপাপ্রাপ্ত হলেনই।

আমাদের জীবনে আনন্দময়ী মা ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছেন। যোধপুর পার্কের এইবারের ভাগবত সপ্তাহ পারায়ণ মহাযজ্ঞ তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।



আশ্রম-সংবাদ

তীর্থরাজ প্রয়াগে মহাকুম্ভ — তীর্থরাজ প্রয়াগে এবার সহস্রাব্দীর প্রথম মহাকুম্ভ পর্ব। মহাসমারোহে এই পূর্ণকুম্ভ সম্পন্ন হল। শ্রীশ্রীমায়ের ক্যাম্প আনন্দময়ী সংঘের পক্ষ হতে রচিত হয়েছিল। বহুভক্ত সমাগম হয়েছিল। বিশ্বের এই বৃহত্তম মেলাতে অপার জনসমুদ্র একত্রিত। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মঠ, আশ্রম, প্রতিষ্ঠানের একত্র সমাবেশ দেখতে পাওয়া যায় এই কুম্ভে। চতুর্দিকে সৎসঙ্গ, আলোর বাহার, মাইকের ধ্বনি। যেন আনন্দমেলায় আনন্দের হাট বসেছে।

৭ই জানুয়ারী শ্রীশ্রীমায়ের সুবৃহৎ প্রতিকৃতি সহ কুম্ভ প্রবেশ করা হল। শ্রীশ্রী মা ও পদ্মনাভের পূজা হল। দুইবেলা সৎসঙ্গ আরম্ভ হল। আশ্রমিকারাই সৎসঙ্গ করত। দুইবেলা সকাল সন্ধ্যায় মায়ের আরতি, উষাকীর্তন ও সন্ধ্যা কীর্তন হত। বেশ জমজমাট ভাব।

পৌষ পূর্ণিমার দিন ৯ই জানুয়ারী চন্দ্রগ্রহণ ছিল। সেদিন সকালে আশ্রমের পূর্ণানন্দজী (শান্তাজী) সত্যনারায়ণের পূজা করান। সেদিন হতেই পাক্ষিক রামায়ণ আরম্ভ হয়। রাত্রিতে চন্দ্রগ্রহণের সময় কীর্তন হল। ভোরে সকলে ত্রিবেণীতে স্নান করতে গেল।

মকরসংক্রান্তির বিশেষ স্নান ১৪ ই জানুয়ারী হয়। সেদিন পদ্মনাভের ষোড়শোপচারে পূজা হয়।

১৫ ই জানুয়ারী জ্যোতির্ময়ানন্দজীর সন্ন্যাস উপলক্ষ্যে নিব্বর্ণী আখাড়ার মহন্তজী শ্রী গিরিধর নারায়ণ পুরীজী, ভোলাগিরি আশ্রমের মহামণ্ডলেশ্বর শ্রীদেবানন্দসরস্বতী, গীতা মন্দিরের মহামণ্ডলেশ্বর স্বামী মঙ্গলানন্দজী এলেন। সকলে প্রসাদ গ্রহণ করলেন।

মহানির্ব্বাণী আখাড়ার ভাণ্ডারা ১৬ ই জানুয়ারী সম্পন্ন হয়।

একদিন যোগদাআশ্রমের স্বামী নির্ব্বাণানন্দজী এসে মার ঘরে বসে ধ্যান করেন। যাওয়ার সময় বলে যান, 'এখানকার পরিবেশ খুব ভাল।'

২০ শে জানুয়ারী কৈলাস আশ্রমের মহামণ্ডলেশ্বর স্বামী বিদ্যানন্দজী আরো কয়েকজন মহামণ্ডলেশ্বর সহ এলেন। সকলে প্রসাদ পেলেন।

দেওঘরের স্বামী ব্রহ্মানন্দজী (বর্তমানে পুরী আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা) অনেক শিষ্য শিষ্যাদের সঙ্গে মৌনী অমাবস্যার স্নানের জন্য এলেন। প্রতিদিন দুইবেলা তাঁর সৎসঙ্গ হত। ২১ শে জানুয়ারী নিরঞ্জনী আখাড়ার সাধুদের ভাণ্ডারা ছিল।

২৪ শে জানুয়ারী মৌনী অমাবস্যার স্নান অপার জনসমুদ্রের মধ্যে করা হল। শুধুই লোক আর লোক। উদ্দেশ্য তাঁদের সকলেরই সেই এক — সঙ্গমে স্নান। বিরাট জনস্রোতের দিকে তাকিয়ে সেই অসীমের কথাই মনে হয়।

২৯ শে জানুয়ারী মহাসমারোহে ক্যাম্পে সরস্বতী পূজা অনুষ্ঠিত হয়। এদিন রামকৃষ্ণ মিশনের বিশেষ সাধুরা প্রসাদ গ্রহণ করেন।

৩১ শে জানুয়ারী এবারে শেষবারের মত সঙ্গমে স্নান করে গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতীকে পূজা করে সেদিন বিকালে কাশী ফেরা হল।

সকলেরই হৃদয়বীণার তারে তারে অনুরণিত হতে থাকল শ্রীশ্রী মায়ের শ্রীমুখ নিঃসৃত পদটি —

"জয় আনন্দ কুম্ভ জয়। কুম্ভ জয় ব্রহ্মজয়
ব্রহ্মময় কুম্ভ জল।"

বারাণসী — কাশী আশ্রমে যথারীতি প্রতিবারের মত পৌষ পার্বণে ১৪ই জানুয়ারী উদয়াস্ত নাম কীর্তন হয়। ২৯ শে জানুয়ারী কন্যাপীঠে সরস্বতী পূজা অনুষ্ঠিত হয়।

৮ই ফেব্রুয়ারী মাঘী পূর্ণিমার দিন শ্রীশ্রী সত্যনারায়ণের পূজা এবং ২১ শে ফেব্রুয়ারী মহা শিবরাত্রি অনুষ্ঠিত হয়।

২৫ শে ফেব্রুয়ারী কন্যাপীঠের বার্ষিকোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এই উপলক্ষ্যে দিব্যজীবন সংঘের পরমাধ্যক্ষ স্বামী চিদানন্দজী মহারাজ, উত্তরপ্রদেশের মহামহিম রাজ্যপাল ডাঃ বিষ্ণুকান্ত শাস্ত্রীজী, কাশীর মহারাজ শ্রী অনন্তনারায়ণ সিংহজী (স্বর্গীয় কাশী নরেশের একমাত্র পুত্র) ও কাশীর বহু গণ্যমান্য ব্যক্তিরা আসেন।

স্বাগত ভাষণের পর বেদধ্বনি, মাল্যার্পণের পর উদ্বোধন সংগীতের দ্বারা সভার আরম্ভ হয়। মেয়েরা বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে। স্বর্গীয় কাশী নরেশের আগ্রহে ইতিপূর্বে মেয়েদের চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা, ক্রীড়া প্রতিযোগিতা এবং সেলাইর প্রতিযোগিতা রাখা হয়েছিল। বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় স্থান অধিকৃত মেয়েদের পুরস্কৃত করা হয়। কাশী নরেশেরই নির্দ্দেশে "সমস্যা পূর্ত্তি" রাখা হয়েছিল। সহজ সরল সংস্কৃত ভাষায় মেয়েরা শ্লোক রচনা করে।

মেয়েরা নিজেদের স্কলারশিপের ১১,০০১ টাকার একটি চেক রাজ্যপালের হাতে তুলে দেয় "Prime Minister's National Relief Fund" এ জমা করার জন্য। গুজরাটের ভূমিকম্প পীড়িতের সহায়তার উদ্দেশে। রাজ্যপাল শ্রী বিষ্ণুকান্ত শাস্ত্রীজী খুব সুন্দর বলেন। তিনি মেয়েদের সংস্কৃত উচ্চারণের প্রশংসা করেন। তিনি বলেন, "আমি প্রায়ই ভাবি প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতি কি পূর্ণভাবে লুপ্ত হয়ে গেল? কিন্তু এখানে এই পবিত্র পরিবেশে মেয়েদের দেখে আমি আশ্বস্ত হলাম যে ভারতীয় সংস্কৃতি এখানে সুরক্ষিত রয়েছে।" রাজ্যপালের ভাষণের পর সভাপতির আসন হতে স্বামী চিদানন্দজীর ভাষণের পর সমাপ্তি সঙ্গীতের দ্বারা সভার সমাপ্তি ঘটে।

গত ৯ই মার্চ দোল পূর্ণিমার দিন গোপালকে আবির দেওয়া হয়। গোপালের অভিষেকের পর ষোড়শোপচারে পূজা ও শৃঙ্গার ইত্যাদি করা হয়।

৩১ শে মার্চ হতে ৩রা এপ্রিল শ্রীশ্রী বাসন্তী পূজা অনুষ্ঠিত হবে। ১ লা এপ্রিল শ্রীশ্রী অন্নপূর্ণা পূজা অনুষ্ঠিত হবে।

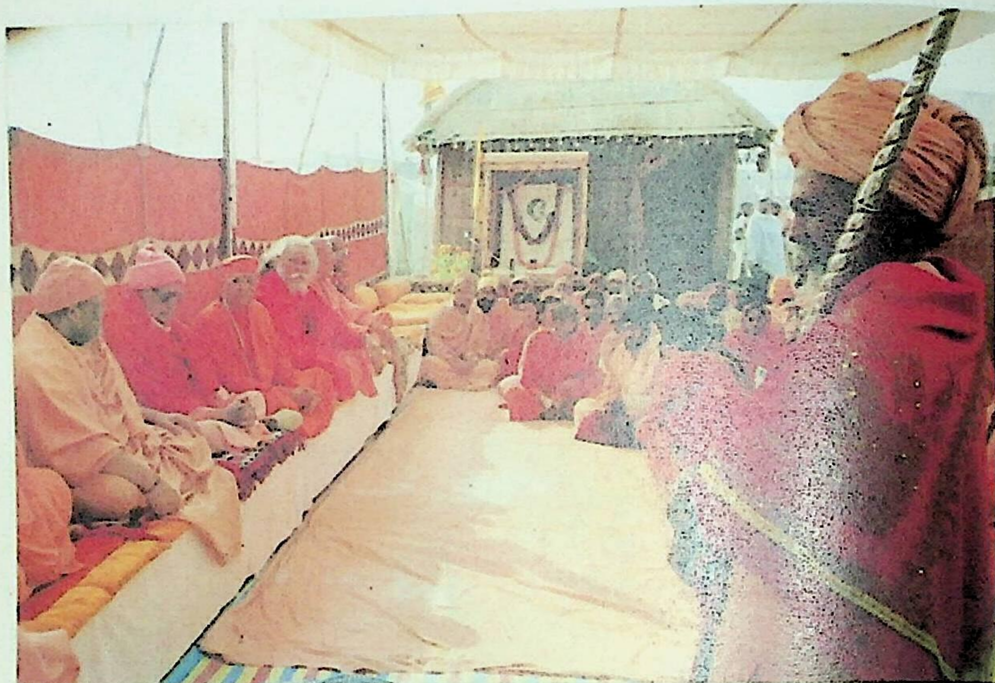
ভীমপুরা — শ্রীশ্রী মায়ের ভীমপুরা আশ্রমে গত ২৯ শে জানুয়ারী শ্রীশ্রী সরস্বতী পূজা অনুষ্ঠিত হয়েছে। নবনির্ম্মিত শ্রী আনন্দেশ্বর শিবালয়ের প্রতিষ্ঠা হয় গত ৩১ শে জানুয়ারী মাঘী শুক্ল সপ্তমী তিথিতে।



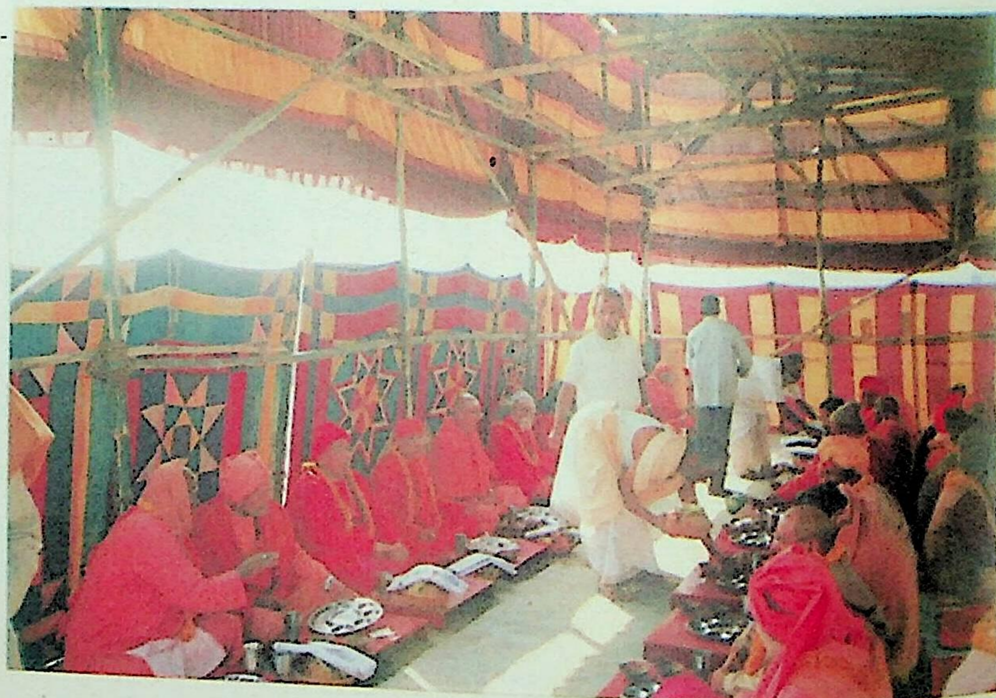
A view of the Saraswati Puja inside Sri Ma's cottage—29th January, 2001



Entrance gate of the Ashram camp in Kumbh Mela ground.



Mahamandaleshwars of the Niranjani Akhara sitting in the pandal in front of Sri Ma's cottage.



Distinguished mahatmas of the Akharas having their meals in the dining pandal.

১২ ই ফেব্রুয়ারী হতে ১৮ই ফেব্রুয়ারী এখানে বিশেষ সংযম সপ্তাহ মহাব্রত এবং ২১ শে ফেব্রুয়ারী মহাশিবরাত্রির পূজা অনুষ্ঠিত হয়েছে। যাবতীয় অনুষ্ঠানে স্বামী ভাস্করানন্দজী উপস্থিত ছিলেন।

বৃন্দাবন — বৃন্দাবন আশ্রমে গত ২১ শে ফেব্রুয়ারী শ্রীশ্রী মহাশিবরাত্রির পূজা অনুষ্ঠিত হয়। ২৫ শে ফেব্রুয়ারী হতে ৫ই মার্চ শ্রীমদ্‌ভাগবত সপ্তাহ জ্ঞানযজ্ঞ আয়োজিত হয়েছে। ভাগবত ব্যাখ্যা করেন পরম ভাগবত স্বামী শ্রী রুদ্রদেবানন্দ সরস্বতীজী মহারাজ।

৯ই মার্চ, ফাল্গুনী পূর্ণিমার দিন দোল মহোৎসব আয়োজিত হয়।

পুণা — শ্রীশ্রী মা আনন্দময়ী আশ্রম, পুণাতে গত ২৯ শে জানুয়ারী সাড়ম্বরে শ্রীশ্রী সরস্বতী পূজা এবং ২১ শে ফেব্রুয়ারী মোরভী পরিবারের সহযোগিতায় মহা শিবরাত্রির পূজা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই উপলক্ষ্যে শিবের রুদ্রাভিষেক হয়।

গত ৯ ই মার্চ দোল পূর্ণিমার দিন মহাপ্রভুর জন্মদিন উপলক্ষ্যে উদয়াস্ত নাম কীর্তন ও ভোগের পর সকলে প্রসাদ গ্রহণ করেন।

আগরতলা — শ্রীশ্রী মায়ের আশ্রম, আগরতলাতে শ্রীশ্রী সরস্বতীর পূজা মহাধূমধামে এবারও অনুষ্ঠিত হয়েছে। শ্রীশ্রী মায়ের পবিত্র উপস্থিতিতে মাতৃমন্দিরে প্রতিষ্ঠিত বীণাপাণি সরস্বতীর অপূর্ব মূর্তি সহজেই সকলকে আকর্ষণ করে। এই উপলক্ষ্যে কীর্তন ও সৎসঙ্গ ইত্যাদিও সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠিত হয়েছে। ভোগের পর সকলে প্রসাদ গ্রহণ করেন।

ভোপাল — শ্রীশ্রী মায়ের আশ্রমে ভোপালে অতি রমণীয় শিব মন্দিরে গত ২১ শে ফেব্রুয়ারী মহাশিবরাত্রি পূজা অনুষ্ঠিত হয়। এই উপলক্ষ্যে রাত্রিতে প্রহরে প্রহরে সুন্দর বৈদিক রীতিতে অনুষ্ঠিত পূজা অপূর্ব ভাব সৃষ্টি করে। পরদিন প্রসাদ বিতরণ করা হয়।



শ্রদ্ধাঞ্জলি

মহামহিম কাশীনরেশ শ্রী বিভূতি নারায়ণ সিংহজী—

শ্রীশ্রী মা এলেন কাশীতে। তখনও আশ্রম হয়নি বারাণসীতে। মা থাকেন গঙ্গাবক্ষে বজরায়। কখনও ঘোরাফেরা করেন নৌকায়। মার কাছে আসেন ভক্তরা। কখনও গঙ্গার ওপারে নৌকা বা বজরা বাঁধা থাকে। গঙ্গার ওপার রামনগর নামে পরিচিত। ধূধূ করছে বালির চর। উত্তরদিকে রাজঘাটের ব্রিজ। আর দক্ষিণ প্রান্তে রামনগর দুর্গ। এই দুর্গেই থাকেন কাশীর মহারাজা আদিত্য নারায়ণ সিংহ। কাশীর মহারাজার চিকিৎসক ডাক্তার গোপাল দাশগুপ্ত আসেন শ্রীশ্রী মায়ের সান্নিধ্যে। রামনগর সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা হয় কখনও কখনও।

তৎকালীন মহারাজা আদিত্যনারায়ণ সিংহ অপুত্রক। রামনগরের ইতিহাসে এই পরম্পরা বহুদিনের। মহারাজ আদিত্যনারায়ণ সিংহ দত্তক নিলেন শ্রী বিভূতিনারায়ণ সিংহকে ১৯৩৪ এ। তখন তিনি সপ্তবর্ষীয় বালক মাত্র। কাশীর রাজারা বিহারের ভূমিহার ব্রাহ্মণ। মহাভারতে ভূমিহার ব্রাহ্মণের প্রসঙ্গ পাওয়া যায়। ১৯৩৯ এ মহারাজ আদিত্যনারায়ণ দেহ রাখলেন। দ্বাদশ বর্ষীয় কিশোর কাশী মহারাজার পদে অভিষিক্ত হলেন মহারাজ বিভূতি নারায়ণ সিংহ। রাজপাট দেখার ভার গ্রহণ করলেন Regency Council । মহারাজ হলেন অধ্যয়নরত। ১৯৪৭এর জুলাই মাসে রাজ্যের সমস্ত দায়িত্বগ্রহণ করলেন বর্তমান কাশী নরেশ ডঃ বিভূতি নারায়ণজী।

ইতিমধ্যে শ্রীশ্রী মায়ের আশ্রমের প্রতিষ্ঠা হয়েছে বারাণসীতে ১৯৪৪এ। গঙ্গার বক্ষে রামনগরের পশ্চিমতটে কেদার আর অসিঘাটের মাঝখানে ঐ আশ্রম। আশ্রম থেকে দেখা যায় লালইঁট দিয়ে তৈরী দুর্ভেদ্য দুর্গ। আশ্রমে তখন ৩ বৎসরব্যাপী অখণ্ড সাবিত্রী মহাযজ্ঞ আরম্ভ হয়েছে। সম্পূর্ণ কাশী নগরীতে ঐ অখণ্ড সাবিত্রী যজ্ঞ চর্চিত। সাধারণ মানুষ আসেন দর্শনার্থী হয়ে। ব্রাহ্মণ আসেন নিমন্ত্রিত হয়ে। মহারাজও এলেন দর্শনার্থে।

শ্রীশ্রী মায়ের সঙ্গে পরিচিত হলেন ধর্মপ্রাণ মহারাজ। মায়ের আশ্রম বিন্ধ্যাচলে। মহারাজ নিজস্ব জমির কিয়দংশ দিলেন শ্রীশ্রী মায়ের চরণে আশ্রমের জন্য।

১৯৫৬ সন মে মাস, ১৯ শে বৈশাখ। শ্রী শ্রী মায়ের হীরক জয়ন্তী উৎসব আয়োজিত হয়েছে। দেশ বিদেশ থেকে বহু ভক্ত, জ্ঞানী গুণীরা একত্রিত হলেন। আয়োজিত হল তুলাদান মহোৎসব, বিবিধ পূজা অনুষ্ঠান। সঙ্গে সাংস্কৃতিক সভা। যোগদান করলেন বিখ্যাত সংগীতজ্ঞরা, গায়ক বাদক। কাশীর মহারাজও এলেন ঐ সভায়। এখানে অতিথি নন তিনি। তাঁরই কাশীধামে এই বৃহদ্ আয়োজন তাই অভ্যাগতদের আতিথেয়তার দায়িত্বটা তাঁরই। তিনি সর্ব্বদা সামনে না এলেও অন্যান্যদের মাধ্যমে সমস্ত সংবাদ নিতেন। শ্রীশ্রী মায়ের প্রতি তাঁর অন্তরে ছিল এক গভীর শ্রদ্ধা।

১৯৬৮র ডিসেম্বর মাসে কাশীতে মাতা আনন্দময়ী চিকিৎসালয়ের উদ্‌ঘাটন করতে এলেন প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী। মহারাজ এলেন আশ্রমের পক্ষ হতে তাঁকে স্বাগত জানাতে। মহারাজ হাসপাতালের কার্যকারিণী সমিতির অধ্যক্ষ। শ্রীশ্রীমা কাশীতে। প্রধানমন্ত্রী আসবেন মোটর বোটে। অন্যান্য আশ্রম কর্ত্তাদের সঙ্গে মহারাজও নেমে এসেছেন ঘাটের সিঁড়িতে।

যাঁর সম্মানে সমস্ত কাশীবাসী দাঁড়িয়ে 'হর হর মহাদেব' ঝংকার তোলে সেই মহারাজ আজ মার হাসপাতালের উদ্‌ঘাটনের ব্যবস্থায় ব্যস্ত। কোথাও কোনও ত্রুটি না হয় সেদিকে তাঁর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। শ্রীমতী গান্ধী একজন মহিলা। তাঁর স্বাগতার্থে দাঁড়িয়ে আছেন মালা হাতে আশ্রমের ব্রহ্মচারী। আমরা ভারতীয়। আমাদের সংস্কৃতি সবদিক রক্ষা করার শিক্ষা দেয়। মহারাজ সেদিকে খেয়াল করিয়ে দিলেন। মালাটা যেন হাতে দেওয়া হয়। এইরকম ছিল মহারাজের আন্তরিকতা মায়ের আশ্রমের প্রতি।

১৯৮০তে ডিসেম্বর মাসে শ্রীশ্রী মা কাশীতে। শুকতালের মহাত্মা বিষ্ণু আশ্রমজী শ্রীমদ্‌ভাগবত ব্যাখ্যা করছেন। বহুভক্ত সমাগম হয়েছে। মহারাজ এলেন তাঁর একমাত্র পুত্র অনন্তনারায়ণের সঙ্গে শ্রীশ্রী মায়ের দর্শনে। একান্তে কথাও হল কিছুক্ষণ।

আমাদের সংঘের বর্ত্তমান অধ্যক্ষ শ্রী গোবিন্দনারায়ণজী কাশীরাজ ট্রাস্টের ট্রাস্টি ছিলেন। মহারাজ তাঁকে আশ্রমের সম্বন্ধে বিশেষ করে সব জিজ্ঞাসা করতেন কোথায় কিছু অসুবিধা হচ্ছে কিনা। বিশেষ করে শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী কন্যাপীঠের প্রতি তাঁর বিশেষ খেয়াল ছিল।

১৯৮৬ থেকে কন্যাপীঠের আমন্ত্রণে মহারাজ সর্বদা সাড়া দিয়েছেন। মহারাজ কুমারীদের নিয়ে প্রতিবার বার্ষিকোৎসবে উপস্থিত থাকতেন এবং তাঁর ভাষণে প্রতিটি শব্দে শ্রীশ্রীমার প্রতি তাঁর অসীম শ্রদ্ধা প্রতিভাসিত হত।

শ্রীশ্রী মায়ের জন্মশতবার্ষিকীতে কাশীতে অনুষ্ঠিত প্রতিটি উৎসবে মহারাজ উপস্থিত থেকে সাফল্যমণ্ডিত করেছেন। ১৯৯৬এ অনুষ্ঠিত শ্রীশ্রী বাসন্তীপূজায় মহারাজ উপস্থিত ছিলেন।

মহারাজ জানালেন বহুবৎসর যাবৎ রামনগর দুর্গে ঐভাবে শারদীয় দুর্গোৎসব করার তাঁর আকাঙ্খা। মহারাজের আগ্রহে রামনগর দুর্গে দুর্গাপূজার আয়োজন হল রাজ পরিবারের পক্ষ থেকে। ব্যবস্থার ভার ব্রহ্মচারী পানুদার উপর যথাবিধি ন্যস্ত হল। কন্যাপীঠের জয়াদি এবং গীতাদি কন্যাপীঠের কিছু মেয়েদের নিয়ে রাজমহলেই পূজার কদিন রইল। আশ্রমের পূজার কাজ দেখে মহারাজ এবং মহারাজ কুমারীরা অত্যন্ত অভিভূত হলেন। কন্যাপীঠের সঙ্গে তাদের সম্বন্ধ আরো গাঢ়তর হল। রামনগর দুর্গের অন্দরমহলে অন্যের প্রবেশ নিষেধ। কিন্তু মার আশ্রমিকাদের অবাধ গতি।

মহারাজ আগ্রহ করলেন তাঁর বড় রাজকন্যা মহারাজকুমারী বিষ্ণুপ্রিয়াজীকে মা আনন্দময়ী কন্যাপীঠের কার্য্যকারিণী সমিতিতে সদস্যা রূপে গ্রহণ করতে। মহারাজের ইচ্ছা সাগ্রহে পালন করলেন কন্যাপীঠের অভিভাবকরা।

আরও গাঢ়তর হল কাশীরাজের সঙ্গে আশ্রমের সম্বন্ধ। গত বৎসর সাবিত্রী মহাযজ্ঞের পূর্ণাহুতির ৫০ বছরের উৎসবের সময় মহারাজ এসেছেন মায়ের আশ্রমে।

মহারাজ কাশী থেকে বাইরে যাওয়ার সময় ও আসার সময় অবশ্য একবার মায়ের ঘরে প্রণাম করে যেতেন। বৃদ্ধ মহারাজ দিল্লী থেকে অপারেশন করিয়ে এসেছেন। Airport থেকে সোজা এলেন মায়ের আশ্রমে

মায়ের ঘরে প্রণাম করতে, আশীর্ব্বাদ নিতে।

গত বাসন্তী পূজায় মহারাজ আসলেন। দর্পণে চরণ দর্শন করলেন। মায়ের ঘরে প্রণাম করলেন। যাওয়ার সময় ব্রহ্মচারী পানুদাকে বললেন, "মা প্রসন্ন নহি হ্যাঁয়।' গম্ভীর ছিলেন মহারাজ। চোখ ছলছল।

কয়েকদিন পরই রামনগর দুর্গ থেকে ফোন বেজে উঠল - মহারাজের 'স্ট্রোক' হয়েছে। মহারাজ চ... শক্তিরহিত। আশ্রমিকাদের ব্যস্ত হওয়া স্বাভাবিক। তাঁরা ছুটে গেলেন রামনগরে। মহারাজ শুনতে চাইলেন মায়ের নাম। তাঁরা শোনালেন 'ওঁ মা শ্রী মা জয় জয় মা।' ব্রহ্মাচারী পানুদা তাঁর চিকিৎসা সম্বন্ধে হাসপাতাল থেকে যথা সম্ভব ব্যবস্থা করতে ত্রুটি রাখেননি।

মহারাজের ডাকে কন্যাপীঠ থেকে যেত জয়াদি, গীতাদিরা মায়ের নাম শোনাতে। শারদীয়া দুর্গা পূজার প... মহারাজ এলেন আবার মায়ের ঘরে। শুনতে চাইলেন মায়ের নাম। নিজেও করলেন। যাওয়ার সময় মেয়ে... বলল, "আবার আসবেন।" অশ্রুপূর্ণ কণ্ঠে বললেন মহারাজ, " আসতেত চাই, কিন্তু শরীর সাথ দেয় না।" ... মহারাজের শেষ যাত্রা। এটা ছিল অক্টোবর মাস।

মহারাজকে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যাওয়া হয়েছিল দিল্লীতে। মহারাজ কাশী কাশী করে ব্যস্ত। ফিরে আসে... ২৩ শে ডিসেম্বর। মহারাজ সুস্থ হননি। ২৫ শে ডিসেম্বর সন্ধ্যায় মহারাজ বিশেষ অসুস্থ। বললেন নিয়ে... 'আনন্দময়ীতে', মানে মার হাসপাতালে। কিন্তু রামনগর থেকে দূরে এই হাসপাতাল। মহারাজকে নিয়ে ... পরিজনরা গঙ্গার পুল পার করে Heritage হাসপাতালে নিয়ে আসছেন। মহারাজ খুব কষ্টে 'ওঁ মা শ্রী মা জয় জ... মা' করছেন অস্ফুট স্বরে। মাঝগঙ্গায় যখন গাড়ি, একটি শীতল নিঃশ্বাস অনুভব করলেন ছোট রাজকুমারী ... মাথা কোলে নিয়ে। 'ওঁ' বলে শব্দ বন্ধ হয়ে গেল। গঙ্গাবক্ষে গঙ্গাভক্ত বিশ্রান্তি নিলেন। রাত্রি ৯টা ত... হাসপাতালের ডাক্তার মহারাজের জীবনলীলা সাঙ্গের ঘোষণা করেলেন।

কাশীতে বিদ্যুৎ প্রবাহের মতন ছড়িয়ে পড়ল এ সংবাদ। মহারাজের শরীর নিয়ে যাওয়া হল নদেশর ম... জনতার শ্রদ্ধাঞ্জলির জন্য। গেলেন ব্রহ্মচারী পানুদা মালা হাতে এতদিনের বিশ্বস্ত আশ্রমের অভিভাবক... অন্তিম শ্রদ্ধা জানাতে।

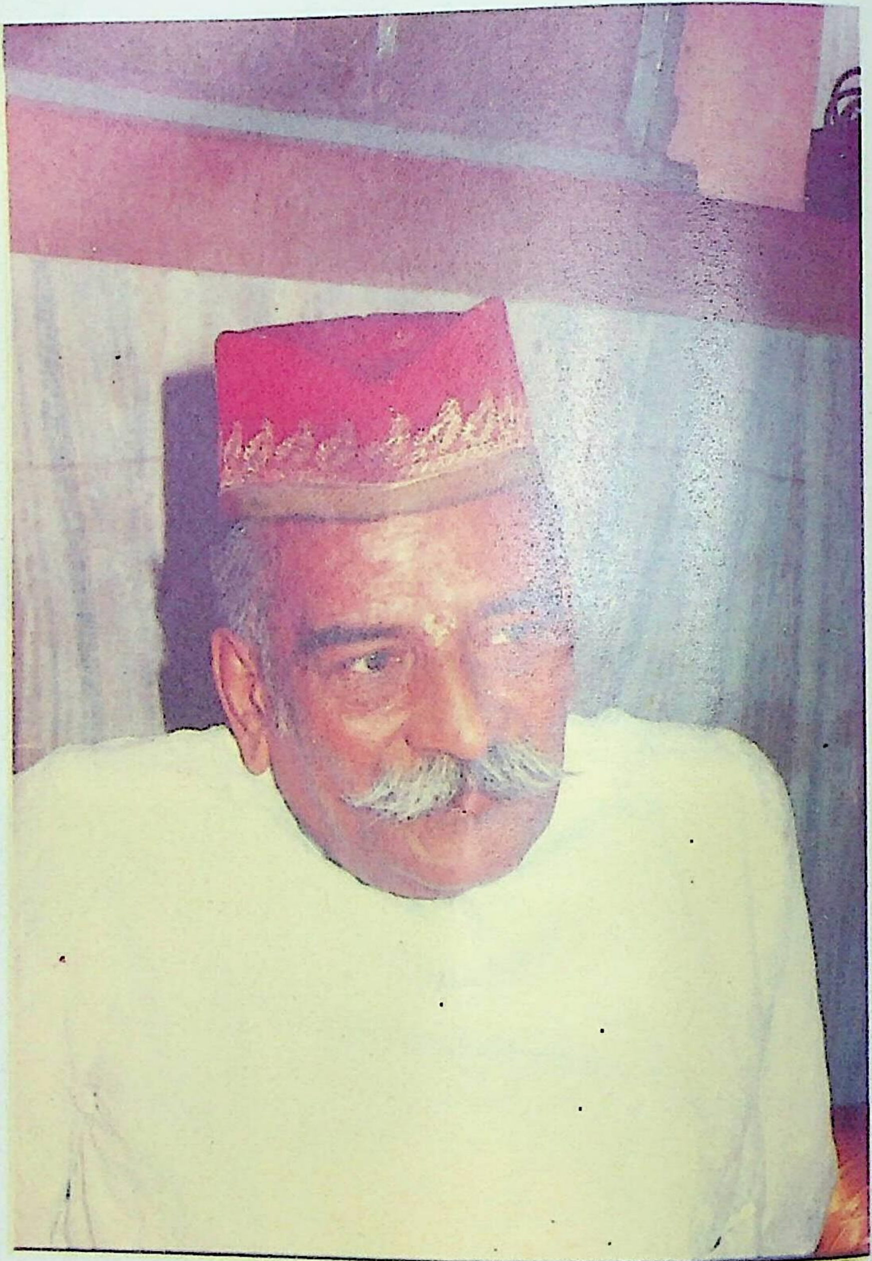
মহামান্য মহারাজ ডঃ বিভূতি নারায়ণ সিংহের অভাব আজ আমাদের কাছে অপূরণীয় ক্ষতি। শ্রীশ্রীমায়ের চরণে জানাই তাঁর চির শান্তির জন্য প্রার্থনা।

'ওঁমা শ্রীমা জয় জয় মা।'



A scene from the annual function of the Ma Anandamayee Kanyapeeth. Pujya Swami Chidanandaji sitting on the left, H.E. Dr. Vishnu Kant Sastri, Governor, U.P. in the middle and Maharaja Anant Narain Singh on the extreme right — all keenly observing the girl's programme. —February, 25, 2001

Km. Santoshi Suvedi, an Acharya student of the Kanyapeeth, offering a Bank draft for Rs. 11,001/- to the Governor out of their merit scholarship amounts for the Gujarat Relief Fund. Km. Jaya Bhattacharya, Principal, also on the scene.



Late Dr. Vibhuti Narain Singh, Maharaja Benares —a man *par excellence*, loved and respected by thousands.

শোক-সংবাদ

শ্রীমতী শিবানী সান্যাল —

গত ৬ই ডিসেম্বর, ২০০০ কলিকাতাবাসী মাতৃভক্ত শ্রীমতী শিবানী সান্যাল মাতৃচরণে আশ্রয় নিয়েছেন। আমরা তাঁর বিদেহী আত্মার জন্য চিরশান্তি কামনা করি ও পরিবার বর্গের জন্য সান্ত্বনা।

শ্রীনারায়ণচন্দ্র চৌধুরী —

মাতৃচরণাশ্রিত শ্রী নারায়ণ চন্দ্র চৌধুরী দুর্গাপুরে গত ৮ই ডিসেম্বর, ২০০০ ইহধাম ত্যাগ করে অমৃতধামে গমন করেছেন।

শ্রীশ্রী মায়ের অতি পুরাতন ভক্ত দিল্লীর শ্রীমতী তুষার চৌধুরীর স্বামী শ্রদ্ধেয় নারায়ণদা বহুদি কাশী আশ্রমের সেবা কার্য্যে যোগদান করেছেন। আমরা তাঁর পরলোকগত আত্মার ঊর্দ্ধ গতি কামনা করি এবং পরিবারবর্গ চির সান্ত্বনা লাভ করুক - মায়ের চরণে এই প্রার্থনা জানাই।

শ্রীশচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় —

গত ৯ই ডিসেম্বর রাঁচীর পুরাতন ভক্ত শ্রী শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় চিরতরে মায়ের চরণে আশ্রয় লাভ করেছেন। আমরা স্বর্গত আত্মার শান্তি কামনা করি এবং পরিবার বর্গ চির সান্ত্বনা লাভ করুক - মাতৃচরণে জানাই এই প্রার্থনা।

ডা. শ্রীমতী সুশীলা নায়ার —

প্রখ্যাত দেশ সেবিকা ডা. সুশীলা নায়ার ৮৬ বৎসর বয়সে সেবাগ্রাম আশ্রমে গত ৩রা জানুয়ারী পরলোক গমন করেছেন।

মহাত্মা গান্ধীর একনিষ্ঠ ভক্ত ও অনুগামী অতিপূর্বে শ্রীশ্রী মায়েরও নিকট সম্পর্কে আসার সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন। নানা স্থানে অনেকবার তাঁর শ্রীশ্রীমার নিকটে আসার সুযোগ ঘটেছিল।

ষাটের দশকে যখন তিনি ভারতের স্বাস্থ্যমন্ত্রী ছিলেন তখন তাঁরই বিশেষ খেয়ালে বারাণসীতে "মা আনন্দময়ী হাসপাতালের" নির্ম্মাণ কার্য্য আরম্ভ হয়। খ্যাতনামা ইঞ্জিনিয়র ও আর্কিটেক্‌টস্ 'কোঠারী অ্যাসোসিয়েট্‌সদের' স্বয়ং তিনি উদ্বুদ্ধ করেন। বারাণসী ধামে শ্রীশ্রী মায়ের নামের উপযুক্ত আধুনিক সকল সুবিধা যুক্ত একটি নতুন হাসপাতালের নির্মাণকার্য্যে সবরকম সহায়তা প্রদান করতে ডাঃ নায়ারের অনুরোধেই ভারত সরকারের তদানীন্তন মুখ্য আর্কিটেক্ট শ্রী জনার্দ্দন শাস্ত্রীজী নিঃস্বার্থভাবে শ্রীশ্রী মায়ের এই হাসপাতালের সেবায় যুক্ত ছিলেন। ডা. সুশীলা নায়ারের প্রচেষ্টার ফলেই হাসপাতাল নির্ম্মাণ এবং আধুনিক সব উপকরণাদি ক্রয়ের জন্য ভারত সরকার থেকে কয়েক লক্ষ টাকা অনুদানেরও ব্যবস্থা হয়েছিল। ডা. নায়ারের অমূল্য অবদান তাই 'মাতা আনন্দময়ী হাসপাতালের' ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকবে।

শ্রীশ্রীমার চরণে এই মহান নিঃস্বার্থ সেবিকার আত্মার চিরশান্তি কামনা করি।

রাজমাতা বিজয়ারাজে সিন্ধিয়া, গোয়ালিয়র —

রাজমাতা বিজয়ারাজে সিন্ধিয়া একটি চির পরিচিত নাম ভারতের ইতিহাসে ভারতবাসীদের মুখে। শু এই নয় শ্রীশ্রী আনন্দময়ী সংঘের ইতিহাসেও রাজমাতা চিরপরিচিতা নিজের জন। শ্রীশ্রীমার বৃন্দাবন আশ্র প্রতিষ্ঠিত ছলিয়া মন্দিরের ইতিহাসের সাথে চিরদিনের জন্য জড়িত আছে গোয়ালিয়রের ধর্মপ্রাণা ঐ মহীয় রাজমাতার নাম। শ্রীশ্রী মা তিরিশের দশকের উত্তরার্দ্ধে মধ্যপ্রদেশের সাগরে গিয়েছিলেন, সেখানে এক নেপালী রানীর ধর্মশালাতে মা কিছুদিন ছিলেন। রাজমাতা ঐ পরিবারেরই।

১৯৫৫ তে ১৪ই আগস্ট মহারাজ জীয়াজীরাও সিন্ধিয়া ও মহারানী বিজয়ারাজে সিন্ধিয়ার আম শ্রীশ্রীমা গোয়ালিয়র গিয়েছিলেন। বিরাট অভ্যর্থনা করেছিলেন রাজ পরিবার। পরে মহারাজা জীয়াজী রাও সিন্ধি আকস্মিক মৃত্যুতে শোকাতুরা মহারানী এসেছিলেন মার চরণপ্রান্তে শান্তির আশায়।

১৯৬১তে মহারাজার উদ্দেশ্যে শিবপ্রতিষ্ঠা উপলক্ষ্যে রাজমাতার আহ্বানে শ্রীশ্রীমা পুনরায় গিয়েছি গোয়ালিয়রে। এইভাবে দ্বিতীয়বার গোয়ালিয়রে পদার্পন করলেন।

১৯৬৩ তে রাজমাতা শ্রীশ্রী মায়ের সান্নিধ্যে মহারাজার স্মরণে শ্রীমদ্ভাগবত সপ্তাহ করালেন বোম্বে গোয়ালিয়র রাজভবনে। ধর্মপ্রাণা রাজমাতা কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত বৃন্দাবন আশ্রমে ছলিয়া মন্দিরের ইতি সর্বজনবিদিত। শ্রীশ্রীমার প্রতি তাঁর বিশেষ আন্তরিক শ্রদ্ধা ছিল। গুরুপ্রিয়া দিদির সঙ্গেও তাঁর যথেষ্ট ঘনি ছিল।

গত ২৪ শে জানুয়ারী তিনি স্বীয় সাধনোচিত ধামে গমন করেছেন। আমরা তাঁর আত্মার চির শান্তি কা করি।

শ্রী সনৎ কুমার চ্যাটার্জ্জী —

গত ১১ ই ফেব্রুয়ারী শ্রীশ্রী মায়ের একনিষ্ঠ ভক্ত কলিকাতাবাসী শ্রী সনৎকুমার চ্যাটার্জ্জী নিজ ইষ্টপাদ লীন হয়েছেন। আমরা তাঁর আত্মার শান্তি কামনা করি ও পরিবার বর্গের জন্য সান্ত্বনা।

শ্রী অশোক কেঙ্করে —

কলিকাতাবাসী অতিপুরাতন ভক্ত মাখনলাল ঘোষের জামাতা শ্রী অশোক কেঙ্করে হঠাৎ গত ২৫ ফেব্রুয়ারী হৃদরোগে কলিকাতায় পরলোক গমন করেছেন। অশোক ভাই মহারাষ্ট্রভাষী হলেও অত্যন্ত অমা সেবাপরায়ণ ও শ্রীশ্রী মায়ের সম্পর্কে আসার পর হতে মাতৃভক্ত সমাজে বিশেষ স্থান অধিকার করে ছি মাত্র ৬০ বৎসর বয়সে তাঁর অকস্মাৎ পরলোকগমনে আমরা অতি প্রিয় একজন ভক্তকে হারালাম।

তাঁর পরিবারজনকে আন্তরিক সমবেদনা জানাই ও তাঁর আত্মার মঙ্গল কামনা করি।



STATEMENT ABOUT OWNERSHIP & OTHER PARTICULARS ABOUT NEWSPAPER ENTITLED "MA ANANDAMAYEE AMRIT VARTA" AS REQUIRED TO BE PUBLISHED U/S 190 OF THE PRESS AND REGISTRATION ACT (FORM IV Rule 8).

1.	Title of Newspaper	:	MA ANANDAMAYEE AMRIT VARTA
2.	Place of Publication	:	SHREE SHREE ANANDAMAYEE SANGHA, BHADAINI, VARANASI – 1.
3.	Periodicity of Publication	:	QUARTERLY
4.	Printer's Name	:	PANU BRAHMACHARI
	Whether citizen of India	:	YES
	Address	:	SHREE SHREE MA ANANDAMAYEE ASHRAM, BHADAINI, VARANASI – 1.
5.	Publisher's Name	:	PANU BRAHMACHARI
	Whether citizen of India	:	YES
	Address	:	SHREE SHREE MA ANANDAMAYEE ASHRAM, BHADAINI, VARANASI – 1.
6.	Editor	:	PANU BRAHMACHARI
	Whether citizen of India	:	YES
	Address	:	SHREE SHREE MA ANANDAMAYEE ASHRAM, BHADAINI, VARANASI – 1.
7.	Name & address of the owner, who owns the Newspaper	:	SHREE SHREE MA ANANDAMAYEE SANGHA (Regtd.), BHADAINI, VARANASI -1.

I, Panu Brahmachari, hereby declare that the particulars given above are true to the best of my knowledge and belief.

March 1, 2001

Sd/-
PANU BRAHMACHARI
PUBLISHER

প্রকাশন সূচী

শ্রীশ্রী আনন্দময়ী সঙ্ঘ দ্বারা প্রকাশিত শ্রীশ্রী মায়ের সম্পর্কে নিম্নলিখিত গ্রন্থ সমূহ শ্রীশ্রী মায়ের বিভিন্ন আশ্রমে উপলব্ধ ঃ—

* **Pictorial Biography of MA** — মায়ের সমগ্র জীবন লেখা ও রেখায় উপস্থাপিত এক অনন্যসাধারণ গ্রন্থ। অতি উচ্চমানের কাগজে অসংখ্য চিত্র - সহ মুদ্রিত। রেক্সিন বাঁধাই। বাংলা সংস্করণ মূল্য ৩৫০/- ইংরাজি সংস্করণ ৪৫০/-

* মাতৃদর্শন — শ্রী জ্যোতিষ চন্দ্র রায় (ভাইজী) রচিত মূল বাংলা ভাষায় এক অতুলনীয় গ্রন্থ। মূল্য ৩০/-

* বিশ্বজননী শ্রীশ্রী মা — মায়ের সংক্ষিপ্ত জীবনী সহ শত উপদেশ। সুললিত বাংলায় লেখা হাতে রাখার মত ছোট একখানি বই। ডঃ গীতা ব্যানার্জী প্রণীত। মূল্য ১৫/-

* আনন্দ জ্যোতি (শতবার্ষিকী স্মারক) — এক গৌরবগরিম সংকলন। মায়ের দিব্য জীবনের ঘটনা পঞ্জী (১৮৯৬ - ১৯৮২), মায়ের বাণীর সুনির্বাচিত শত উদ্ধৃতি, মাতৃ-আশ্রমগুলি ও মাতৃ-প্রতিষ্ঠিত সংস্থাগুলির অসংখ্য চিত্র-সম্বলিত বিবৃতিমূলক ইতিহাস, বহু বিশিষ্ট লেখকের লেখনী-নিঃসৃত স্মৃতিচারণা, প্রখ্যাত মহাত্মাবৃন্দ ও বিশেষ গৌরবান্বিত ব্যক্তিবর্গের বিশেষ সন্দেশ ও সম্মাননা, সর্বোপরি মায়ের বিরল আলোকচিত্রের বহু-সংখ্যক সমাবেশ। অতি উচ্চমানের কাগজে মুদ্রিত। মূল্য ১০০/-

* **In your heart is my abode** – ডক্টর বীথিকা মুখার্জী রচিত ইংরাজিতে মায়ের জীবনের সংক্ষিপ্ত সার এবং শ্রীশ্রী মায়ের শত উপদেশ। মূল্য ২৫/-

* **Matri Vani** – মায়ের অমূল্য উক্তিগুলির ইংরাজিতে সংকলন। হাতে রাখার মত আকার। মূল্য ২০/-

* **Words of Sri Anandamayee Ma** – মায়ের অতিমূল্যবান কথোপকথন আত্মানন্দ (কুমারী ব্ল্যাংকা শ্লাম) কর্তৃক সংকলিত ও ইংরাজিতে অনূদিত। মূল্য ৩০/-

* **Mother as seen by her devotees** – বিশিষ্ট বিদ্বৎমণ্ডলী ও শ্রীশ্রী মায়ের প্রধান ভক্তদের ইংরাজিতে লেখা মাতৃ সম্পর্কে প্রবন্ধাবলীর সংকলন। মূল্য ৩০/-



"হরি কথাই কথা, আর সব বৃথা ব্যথা।"

— শ্রীশ্রী মা

পেন্‌সিলভেনিয়া আমেরিকাতে স্থায়ী রূপে পঞ্জীকৃত প্রতিষ্ঠান "মা আনন্দময়ী সেবা সমিতি'র পক্ষ হতে পরমারাধ্যা শ্রীশ্রীমায়ের সকল ভক্তজনকে সপ্রেম 'জয় মা' জানানো হচ্ছে।

এই প্রতিষ্ঠানের মুখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে শ্রীশ্রীমায়ের জীবনলীলা ও অমূল্য বাণীর প্রচার, বিবিধ আধ্যাত্মিক কার্য্য সম্পাদন। সৎসঙ্গের পরিচালন, সনাতন ভাগবৎ ধর্ম্মযুক্ত প্রক্রিয়ার পরিচালনা এবং জনজনার্দ্দনের সেবা।

আমেরিকান সরকার দ্বারা এই সমিতি আয়কর হতে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত ঘোষিত হয়েছে —No. 23/2967597/I.R.S Code 501 (C) (3)

আমেরিকা ও নিকটবর্ত্তী দেশসমূহের স্থায়ী রূপে নিবাসী ভক্তদের কাছে অনুরোধ জানানো হচ্ছে যে 'মা আনন্দময়ী অমৃতবার্তা' (ত্রৈমাসিক পত্রিকা যা বাংলা, ইংরাজী, হিন্দি ও গুজরাতী এই চার ভাষায় প্রকাশিত হয়ে থাকে) সেই পত্রিকা এবং শ্রীশ্রী মায়ের দিব্যজীবন লীলা ও অমূল্য বাণী সম্বলিত নানা গ্রন্থ উপরোক্ত সেবা সমিতির কাছ থেকে সংগ্রহ করতে পারেন।

বিস্তৃত বিবরণের জন্য নীচের ঠিকানায় সম্পর্ক স্থাপন করুন —

Dr. Mahadev R. Patel
Ma Anandamayee Seva Samiti Inc.
212 Moore Road
Wallingford, P.A. 19086-6843
Tel : 610-876-6862, Fax : 610-879-1351

With Best Compliments from :

"সেবায় চিত্তশুদ্ধি হয়! সেবা ভাবে কর্ম্ম করা
উচিত। চিত্ত শুদ্ধ হলে যে কর্ম্ম করবে
তাহাই সত্য এবং খাঁটি হবে।"

— শ্রী শ্রী মা

A. R. DEWANJEE & CO.

Manufacturers of Hot Pressed Commercial Plywood

Exporters & Importers
12/3 Netaji Subhas Road,
Calcutta – 700 001

Phone :

220 9739/ 220 4746 (O)/ 220 8472 (Fax.)/
477 9239 (Factory)/ 473 3157 (Resi)

At the lotus feet of Ma

Kalipada Dutta
35-H, Raja Naba Krishna Street
Calcutta – 700 005.

With Best Compliments from :

"প্রবাহের ন্যায় যখন যা আসে ঐশ্বরিকভাবে খুব আনন্দের সাথে করে যাওয়া। কর্মীরাই দৈবশক্তির অধিকারী।"

— শ্রী শ্রী মা

Satya Ranjan Kar Chowdhury
87/S, Block - E, New Alipore,
Calcutta – 700 053.
Phone : 478 3545

"হে ভগবান, হে প্রভু, হে মা।
আমি তোমার, তুমি আমার।
আমি তোমার, তুমি আমার।
আমি তোমার, তুমি আমার।"

— শ্রী শ্রী মায়ের বাণী ঃ জন্মোৎসব, উত্তরকাশী।

❉ Branch Ashrams ❉

15. NEW DELHI : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram,
Kalkaji, New Delhi-110019 (Tel : 011-6826813)

16. PUNE : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram,
Ganesh Khind Road, Pune-411007, (Tel : 020-5537835)

17. PURI : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram,
Swargadwar, Puri-752001, Orissa.

18. RAJGIR : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram,
P.O. Rajgir, Nalanda-803116, Bihar (Tel : 06112-55362)

19. RANCHI : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, Main Road,
P.O. Ranchi-834001, Bihar (Tel : 0651-312082)

20. TARAPEETH : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram,
P.O. Chandipur-Tarapeeth, Birbhum-731233, W.B.

21. UTTARKASHI : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram,
Kali Mandir, P.O. Uttarkashi-249193,

22. VARANASI : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram,
Bhadaini, Varanasi-221001, U.P.
(Tel : 0542-310054+311794)

23. VINDHYACHAL : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, Ashtabhuja Hill,
P.O. Vindhyachal, Mirzapur-231307, (Tel : 05442-42343)

24. VRINDAVAN : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram,
P.O. Vrindavan, Mathura-281121 U.P. (Tel: 0565-442024)

IN BANGLADESH :

1. DHAKA : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram,
14, Siddheshwari Lane, Dhaka-17 (Tel : 405266)

2. KHEORA : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram,
P.O. Kheora, Via-Kasba, Brahmanbaria.



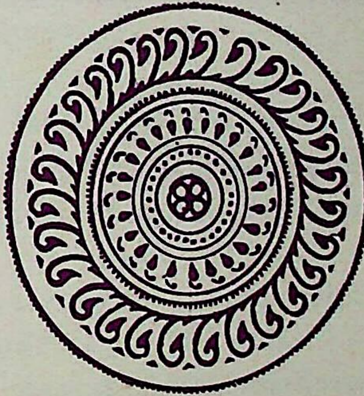
REGISTERED WITH THE REGISTRAR OF NEWSPAPERS
FOR INDIA AS NO. 65438/97



रत्ना ऑफसेट्स लिमिटेड कमच्छा, वाराणसी, फोन–३९२८२०

মা আনন্দময়ী

অমৃত বার্তা



VOL. 5 JULY 2001 NO.3

SHREE SHREE ANANDAMAYEE SANGHA

❄ Branch Ashrams ❄

1. AGARPARA : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, P. O. Kamarhati, Calcutta-700058 (Tel : 033-5531208)
2. AGARTALA : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, Palace Compound, P.O. Agartala-799001. West Tripura (Tel : 0381-208618)
3. ALMORA : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, Patal Devi, P.O. Almora-263602, (Tel : 05962-33120)
4. ALMORA : Shree Shree Ma Anaudamayee Ashram, P.O. Dhaul-China, Almora-263881, (Tel : 05962-62013)
5. BHIMPURA : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, Bhimpura, P.O. Chandod, Baroda-391105, (Tel : 02663-833208
6. BHOPAL : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, P. O. Bairagarh, Bhopal-462030, M.P. (Tel : 0755-521227)
7. DEHRADUN : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, Kishenpur, P.O. Rajpur, Dehradun-248009 (Phone : 0135-734271)
8. DEHRADUN : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, Kalyanvan, 176, Rajpur Road, P.O. Rajpur, Dehradun-248009, (Phone : 0135-734471)
9. DEHRADUN : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram. P.O. Raipur Ordnance Factory, Dehradun-248010
10. DEHRADUN : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, 47/A Jakhan, P.O. Rajpur, Dehradun,
11. JAMSHEDPUR : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, Near Bhatia Park, Kadma, Jamshedpur-831005, Bihar
12. KANKHAL : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, P.O. Kankhal, Hardwar-249408, (Tel : 0133-416575)
13. KEDARNATH : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, Near Himlok, P.O. Kedarnath, Chamoli-246445,
14. NAIMISHARANYA : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, Puran Mandir, P.O. Naimisharanya, Sitapur-261402, U.P.

মা আনন্দময়ী — অমৃতবার্ত্তা

শ্রীশ্রী মা আনন্দময়ীর দিব্য জীবন
ও
অমূল্যবাণী সম্বলিত ত্রৈমাসিক পত্রিকা

বর্ষ - ৫ জুলাই, ২০০১ সংখ্যা — ৩

❋

❋

বার্ষিক চাঁদা (ডাক ব্যয়সহ)
ভারতে - ৬০/- টাকা
বিদেশে - ১২ ডলার অথবা ৪৫০/- টাকা
প্রতি সংখ্যা - ২০/- টাকা

মুখ্য নিয়মাবলী

❋ ত্রৈমাসিক পত্রিকা বাংলা, হিন্দী, গুজরাতী ও ইংরাজী এই চার ভাষায় পৃথক পৃথকভাবে বৎসরে চারবার জানুয়ারী, এপ্রিল, জুলাই এবং অক্টোবর মাসে প্রকাশিত হইয়া থাকে। পত্রিকার বর্ষ জানুয়ারী সংখ্যা হইতে আরম্ভ হয়।

❋ প্রধানতঃ শ্রী শ্রী মায়ের দিব্য জীবন ও অমূল্যবাণী বিষয়ক প্রবন্ধাদি প্রকাশনই এই পত্রিকার মুখ্য উদ্দেশ্য। অবশ্য দেশ-কাল-ধর্ম্ম ও সম্প্রদায় নির্বিশেষে যে কোন আধ্যাত্মিক বা দার্শনিক হৃদয়গ্রাহী প্রবন্ধ এবং বিশিষ্ট মহাপুরুষদের জীবনী ও উপদেশ সম্বলিত লেখা সাদরে গৃহীত হইবে। নিতান্ত ব্যক্তিগত অনুভব ব্যতীত শ্রী শ্রী মায়ের দিব্যলীলা বিষয়ক লেখাও শ্রী শ্রীমায়ের অগণিত ভক্তবৃন্দের নিকট হইতে আশা করা যাইবে।

❋ প্রতিটি লেখা সাদা কাগজের এক পৃষ্ঠায় সুস্পষ্ঠ অক্ষরে লিখিত থাকা বিশেষ আবশ্যক। কোনও কারণবশতঃ লেখা পত্রিকায় প্রকাশিত না হইলে লেখকের নিকট ফেরৎ পাঠান অসুবিধাজনক।

❋ অগ্রিম বার্ষিক চাঁদা কেবলমাত্র মনি অর্ডার বা ডিমান্ড ড্রাফ্ট দ্বারা **"Shree Shree Anandamayee Sangha - Publication A/C"** এই নামে পাঠাইবার নিয়ম।

❋ পত্রিকা সম্পর্কিত যোগাযোগ নিম্নলিখিত ঠিকানায় করিতে হইবে —

Managing Editor,
Ma Anandamayee - Amrit Varta
Mata Anandamayee Ashram
Bhadaini, Varanasi - 221 001

❖ ❖ ❖ ❖ ❖

পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিবার নিয়ম ঃ-
সম্পূর্ণ পৃষ্ঠা — ২০০০/- বাৎসরিক
অর্দ্ধেক পৃষ্ঠা — ১০০০/- ”
১/৪ পৃষ্ঠা — ৫০০/- ”

বিজ্ঞাপনের বিষয়বস্তু সহ অগ্রিম টাকা উপরোক্ত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

শ্রীশ্রী আনন্দময়ী সংঘের পক্ষে মুদ্রক ও প্রকাশক শ্রী পানু ব্রহ্মচারী দ্বারা শ্রী শ্রী আনন্দময়ী সংঘ ভাদাইনী, বারাণসী - ২২১ ০০১ উঃপ্রদেশ হইতে প্রকাশিত এবং রত্না প্রিন্টিং ওয়ার্কস, বি ২১/৪ কামাচ্ছা, বারাণসী - ১০ হইতে মুদ্রিত। সম্পাদক — শ্রী পানু ব্রহ্মচারী।

সূচীপত্র



"হরি কথাই কথা, আর সব বৃথা ব্যথা।"

— শ্রীশ্রী মা

পেন্‌সিলভেনিয়া আমেরিকাতে স্থায়ী রূপে পঞ্জীকৃত প্রতিষ্ঠান "মা আনন্দময়ী সেবা সমিতি"র পক্ষ হতে পরমারাধ্যা শ্রীশ্রীমায়ের সকল ভক্তজনকে সপ্রেম 'জয় মা' জানানো হচ্ছে।

এই প্রতিষ্ঠানের মুখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে শ্রীশ্রীমায়ের জীবনলীলা ও অমূল্য বাণীর প্রচার, বিবিধ আধ্যাত্মিক কার্য্য সম্পাদন। সৎসঙ্গের পরিচালন, সনাতন ভাগবৎ ধর্ম্মযুক্ত প্রক্রিয়ার পরিচালনা এবং জনজনার্দ্দনের সেবা।

আমেরিকান সরকার দ্বারা এই সমিতি আয়কর হতে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত ঘোষিত হয়েছে —No. 23/2967597/I.R.S Code 501 (C) (3)

আমেরিকা ও নিকটবর্ত্তী দেশসমূহের স্থায়ী রূপে নিবাসী ভক্তদের কাছে অনুরোধ জানানো হচ্ছে যে 'মা আনন্দময়ী অমৃতবার্তা' (ত্রৈমাসিক পত্রিকা যা বাংলা, ইংরাজী, হিন্দি ও গুজরাতী এই চার ভাষায় প্রকাশিত হয়ে থাকে) সেই পত্রিকা এবং শ্রীশ্রী মায়ের দিব্যজীবন লীলা ও অমূল্য বাণী সম্বলিত নানা গ্রন্থ উপরোক্ত সেবা সমিতির কাছ থেকে সংগ্রহ করতে পারেন।

বিস্তৃত বিবরণের জন্য নীচের ঠিকানায় সম্পর্ক স্থাপন করুন —

Dr. Mahadev R. Patel
Ma Anandamayee Seva Samiti Inc.
212 Moore Road
Wallingford, P.A. 19086-6843
Tel : 610-876-6862, Fax : 610-879-1351



মাতৃ-বাণী

(সঙ্কলন - কুমারী চিত্রা ঘোষ)

স্বয়ং ভগবানই গুরুরূপে প্রকাশ হন। বিশ্বাস করো, তাঁকে ডাকো।

*　　*　　*

গুরু মানেই হল জগদ্‌গুরু ; জগদ্‌গুরু মানে মৃত্যুর দিকের গতি থেকে যিনি অমৃতের দিকে গতি দেন। সেই গতি যিনি দেন, তিনিই হলেন অন্তর গুরু।

*　　*　　*

গুরুর অনন্ত রূপ, অনন্ত প্রকাশ, অনন্ত অপ্রকাশ। গুরু-ইষ্ট-মন্ত্ররূপে ঐ-ইত। যেখানে মন প্রাণ সেখানে বিশ্বব্যাপক এক আত্মাই ত।

*　　*　　*

হরিনাম, যে সুখ দুঃখ হরণ করে; সেই নামই মন্ত্র। যার যা ভাল লাগে। ভগবানের নামেও কাজ হয়। সকলের জন্য এক মন্ত্র নয়। তোমার যা ভাল লাগে কর। হরি মানে হরি কথা — হরি নাম।

*　　*　　*

বীজ যখন হয়, মাটিতে লুকিয়ে রাখতে হয়। তুমি মাটি খোদাই করে রাখ, কাউকে জানতে দিও না তোমার মাটিতে ভিতরে কি আছে। (নিজের মন্ত্র গুপ্ত রাখতে হয় — এই নির্দেশ দিচ্ছেন)।

*　　*　　*

সেবা তাকেই বলা হয়, যাতে পরমার্থ পথের দিক হয়; সেবক সেই, যে পরমার্থের দিকে নিয়ে যায়। সেই যথার্থ বন্ধু। যথার্থ সেবা, নিষ্কাম সেবা।

*　　*　　*

শ্রেষ্ঠ সেবা ভগবানের পথে নিয়ে যেতে সাহায্য করে - তাই যথার্থ সেবা। যা কর শিব ভেবে কর। যত্র জীব তত্র শিব, যত্র নারী তত্র গৌরী।

*　　*　　*

জনসেবা রূপে দেখলে, নিজেতে নিজেই। ভগবদ্ বুদ্ধি তে সেবা কর। কাউকে আমরা নমস্কার করি। কুকুর বেড়ালকেও নমস্কার কর। ভগবদ্‌বুদ্ধিতে সেবা কর।

*　　*　　*

উপদেশ তো হল, কতটা পালন হল। শোনা ত হল, স্মরণ কতটা হল। শোনা - পালন করা। শুনলেও লাভ হয়। বেকার যায় না।

*　　*　　*

ভগবানকে অর্পণ করেছ। ভগবানের দান ভগবানকে দিচ্ছ। দান কর্ত্তা আমি কে ? সব কিছু ভগবানে দেওয়া। ধন রক্ষাকর্তা কে ? মালিক তিনিই। তাঁর টাকা তোমার কাছে আছে। তোমার দেওয়ার অধিকার আ কি? যা মালিক তোমার কাছে রেখেছেন, তা তুমি কি করে খালি করবে?

* * *

জন মানে জনার্দন। জনার্দন মানে স্বয়ং ভগবান। দিতে পার — ভগবদ্ বুদ্ধিতে। আমি দিচ্ছি — তুমি কে? হে ভগবান; তুমিই তোমার — আমি দান কর্ত্তা কে? সেবা করার দান দেওয়ার অধিকার তোমার অধি নষ্ট করার জন্য নয়।

* * *

যেমন সংস্কার, সেই রূপেই দর্শন হয়। রূপে অরূপে। না ও না - হ্যাঁ ও না — তাতেও আছেনই। তু অরূপে চাও, নির্গুণ নিরাকারে আছেন। রূপে চাও তো রূপে আছেন।

* * *

দর্শন তো আছেই — ভগবানের নিত্য রূপও আছে — প্রাকৃত রূপও আছে - তা ও প্রকট হয়। আর ম জগতেরও হয়। সেই রূপেও তিনিই আছেন। প্রতি রূপে প্রকট। একটি কল্পনা আর একটি নিত্য রূপ।

* * *

মৃত্যু থাকলে অমৃতও আছে। মৃত্যু না থাকলে অমৃতও থাকতে পারে না। অসুখ ও হয়, accident ও হ আত্মা বলা হয়। আত্মা কোথায় যায়? যদি পতিকে পেয়ে থাকো ত তিনি কোথায় গেছেন? জগত আর জগদা - দুইটি রাস্তা আছে। এ শরীরতো কুকুরকেও মালা দেয়। এই শরীরটা তো সকলের মধ্যে আছে, এই কুকু এবং তোমাদের সকলের মধ্যেও।

* * *

আত্মার প্রকাশ হওয়া উচিত। নাম স্বরূপ — নামের প্রকাশ, রাম সীতা। আপনাকে আপনি দেখলে হয়। যতক্ষণ মনের নাশ না হয়, ততক্ষণ প্রকাশ নেই।

* * *

প্রশ্ন - আমি কে?

মা - তুমি জীব, বন্ধনে আছ, তুমি বন্দী। এখন সেবা করতে হবে, সেবিকা হয়ে, দাসী হয়ে, দাস হয়ে, হয়ে, প্রভু-দাস, বিষয় ভোগে শেষে বিষই থেকে যাবে, slow poison যে স্থিতিতে আছ, তাতে অনুভব কেউ কিছু দূর পর্য্যন্ত অহম্ কে দেখতে পারে। সেই বিষয়েরই তার অনুভব হবে। যে স্থিতিতে যে stage আছে সেখান থেকেই দেখবে। এটা কেন হল? ওটা কেন হল? এ তো অজ্ঞান। কর্মের ফল তো ভুগতেই হ স্বয়ং- স্ব-এখন। স্বয়ং - সবেতে তিনিই। ভগবানের কৃপা সব সময়।

*

শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী প্রসঙ্গ

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

— শ্রী অমূল্যকুমার দত্তগুপ্ত

কোন রূপ অনুভূতি না পাইলেও গুরু নির্দিষ্ট পথই অনুসরণীয়

২রা ভাদ্র সোমবার (ইং ১৮.৮.৫২)

আজ সকালে গীতা পাঠের পর মাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "কেহ যদি গুরুর নির্দেশ মত দীর্ঘকাল চলিয়াও নিজের ভিতর কোন অনুভূতি বা আনন্দ না পায় তবে সে যে ঠিক পথে চলিতেছে তাহা কি করিয়া বুঝিবে?

প্রশ্ন শুনিয়া মা অবধূতজীকে বলিলেন, "পিতাজী, এ সম্বন্ধে তোমাদের শাস্ত্রে কি বলে?" অবধূতজী এ সম্বন্ধে অনেক কিছু বলিলেন, তন্মধ্যে গুরুর উপর বিশ্বাস রাখা এবং সৎসঙ্গের উপকারিতা সম্বন্ধে কিছু বলিলেন।

মা — (আমাকে) তোমার প্রশ্নের উত্তর পাইলে ত?

আমি — উনি যাহা বলিলেন তাহাত একরূপ বুঝিলাম। কিন্তু আমার প্রশ্নের জবাব হইল কোথায়? কোন অনুভূতি না পাওয়া সত্ত্বেও আমি যে ঠিকপথে চলিতেছি তাহা বুঝিব কেমন করিয়া?

মা — ঐ যে সৎসঙ্গের কথা বলা হইল।

আমি — মন্ত্র শক্তিতে যাহা পাইলাম না সৎসঙ্গে তাহা পাইব?

মা — তুমি যদি সৎসঙ্গ করিতে থাক তবে উহার মধ্যেই এমন কোন কথা এক সময় পাইয়া যাইবে যাহা হইতে তুমি নিজেই বুঝিতে পারিবে যে তুমি ঠিক পথেই চলিতেছ।

তাহা ছাড়া তুমি ত নারায়ণ শাস্ত্রীর কথা শুনিয়াছ? সেও গুরুর উপদেশ অনুসারে দীর্ঘদিন চলিয়া কোন অনুভূতি না পাইয়া কিশোরী ভগবানের কাছে গিয়াছিল। সেই সময় কাশীতে কিশোরী ভগবানের খুব প্রতিপত্তি চলিতেছিল। এবং নানালোকের মুখে সে শুনিয়াছিল যে কিশোরী ভগবানের উপদেশ মত চলিলে খুব অল্প সময়ের মধ্যে আধ্যাত্মিক পথে উন্নতি লাভ করা যায়। সে কিশোরী ভগবানের কাছে গিয়া উপদেশ প্রার্থনা করিলে তিনি তাঁহার (অর্থাৎ কিশোরী ভগবানের) নাম জপ এবং তাঁহার মূর্ত্তি ধ্যান করিতে উপদেশ দিলেন। ঐরূপ করিয়া নারায়ণ শাস্ত্রী তিনদিনের মধ্যেই এক আশ্চর্য্য অনুভূতি লাভ করিল। সে যে দিকে তাকাইত সেই দিকেই কৃষ্ণের মূর্ত্তি দেখিতে পাইত। ঘর বাড়ী, গাছপাতা সবই যেন কৃষ্ণময়। কিন্তু সে যে কৃষ্ণের মূর্ত্তি দেখিত তাহার গড়ন, চূড়া, বাঁশী ইত্যাদি সবই কৃষ্ণের মত শুধু মুখখানা কিশোরী ভগবানের। এইভাবে কিছুদিন চলিল। একদিন সে নিজের বাসায় বসিয়া জপ করিতেছে এমন সময় তাহার সম্মুখে তাহার গুরুদেবের মূর্ত্তি প্রকট হইল। মূর্ত্তি দেখিতে উগ্র এবং ক্রোধযুক্ত। তিনি নারায়ণ শাস্ত্রীকে তাহার নূতন মন্ত্র জপ করিতে এবং কিশোরী ভগবানের

ধ্যান করিতে নিষেধ করিয়া দিলেন। গুরুর ঐ মূর্ত্তি দেখিয়া নারায়ণ শাস্ত্রী ভয় পাইয়া গেল এবং কিছুদিনের জন্য কিশোরী ভগবানের ধ্যান এবং নামজপ ছাড়িয়া দিল। উহার সঙ্গে সঙ্গেই তাহার যা কিছু অনুভূতি হইতেছিল তাহা সবই চলিয়া গেল। কিছুদিন এইভাবে গেলে সে নিজের মধ্যে আবার শুষ্কতা অনুভব করিয়া পূর্বের অনুভূতির জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিল। গুরুদেব তাহাকে যে কিশোরী ভগবানের কাছে যাইতে নিষেধ করিয়াছিলেন, উহা অমান্য করিয়া আবার তাঁহার কাছে গিয়া উপস্থিত হইল। কিশোরী ভগবান তাহার নিকট হইতে সমস্ত ঘটনা শুনিয়া তাহাকেই দোষী সাব্যস্ত করিলেন এবং পুনরায় তাঁহার নিকট যাতায়াত করিতে এবং তাঁহার নামজপ এবং মূর্ত্তি ধ্যান করিতে বলিলেন। নারায়ণ শাস্ত্রী আবার কিশোরী ভগবানের নিকট যাতায়াত আরম্ভ করিল। একদিন সন্ধ্যাবেলা সে কিশোরী ভগবানের কাছে যাইতেছিল, যে বাড়ীতে কিশোরী ভগবান থাকিতেন সেই বাড়ীতে পৌঁছিয়া সে সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিতেছে এমন সময় দেখিতে পাইল যে তাহার গুরুদেব ঐখানে দাঁড়াইয়া আছেন। গুরুদেবকে দেখিয়াই নারায়ণ শাস্ত্রী চমকিয়া উঠিল। গুরুদেব এবার আর কোন কথা না বলিয়া নারায়ণ শাস্ত্রীর ঘাড় ধরিয়া এমন ধাক্কা দিলেন যাহার ফলে সে সিঁড়ি হইতে ছিটকাইয়া রাস্তায় আসিয়া পড়িল। কাছেই একটি পানের দোকান ছিল। সে কাঁপিতে কাঁপিতে ঐ দোকানে গিয়া বসিয়া পড়িল। ভয়ে সে চলৎ শক্তিরহিত হইয়া গিয়াছিল। ঐখানে কিছুক্ষণ বসিয়া থাকিয়া কিছুটা প্রকৃতিস্থ হইলে সে গোপীবাবার কাছে গিয়া সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করিল। সকল কথা শুনিয়া গোপীবাবা তাহাকে পুনরায় কিশোরী ভগবানের কাছে যাইতে নিষেধ করিয়া বলিল যে সে তাহার গুরুদত্ত মন্ত্র এতদিন যেভাবে জপ করিয়া আসিতেছিল, উহাই তাহার পক্ষে ঠিক পথ। অন্যপথে চলা তাহার পক্ষে মঙ্গলজনক নহে। তাই দেখিতে পাইতেছ যে গুরুনির্দিষ্ট পথে চলিয়া কোন অনুভূতি না পাইলেও ঐ পথে চলাই শিষ্যের কর্ত্তব্য। কোন অনুভূতি আসিতেছে না বলিয়া যে ঠিক পথে চলা হইতেছে না এরূপ আশঙ্কা করিবার কোন কারণ নাই। বিপথে চলিলে যে গুরু নিজেই শিষ্যকে আবার ঠিক পথে লইয়া আসেন তাহাত নারায়ণ শাস্ত্রীর অবস্থা হইতেই বুঝিতে পারিতেছ। তাই বলিতেছি, নির্ভয়ে চলিতে থাক। তাহা ছাড়া তুমি নিজেই জান যে তোমার এক আত্মীয় সৎসঙ্গ করিতে আসিয়া জানিতে পারিয়াছিল যে সে ভুল মন্ত্র জপ করিতেছে।

আমি — মা, তুমি যে ঘটনার কথা বলিতেছ উহা ত সৎসঙ্গের ফল হিসাবে ধরা যায় না।

মা — (হাসিয়া) মনে কর না কেন যে সে সৎসঙ্গ পাইতে আসিয়াছিল বলিয়াই তাহার ঐ ভুল ধরা পড়িয়াছিল।

আজ বেলা ১২ টা পর্য্যন্ত এই প্রসঙ্গই চলিল।

৪ঠা ভাদ্র বুধবার (ইং ২০.৮.৫২)

গত সোমবার শ্রীশ্রী মায়ের বিন্ধ্যাচল যাওয়ার কথা ছিল, কিন্তু উহার পূর্ব্বদিন হইতেই বৃষ্টি আরম্ভ হওয়ায় সম্প্রতি ঐখানে যাওয়া স্থগিত আছে। কারণ শ্রীশ্রী মায়ের সঙ্গে অবধূতজীও বিন্ধ্যাচলে যাইবেন। বৃষ্টি হইলেই

বিন্ধ্যাচলে একজাতীয় পোকার প্রাদুর্ভাব হয় যাহা পীড়ার কারণ হয়।

বিকালবেলা এখন আশ্রমে পাঠ হয়। অবধূতজী "সাধন সমর" পাঠ করেন। এই সময় কখন কখন মায়ের সহিত নানা বিষয়ের আলোচনাও হয়। সম্প্রতি ডঃ পান্নালাল মাকে তাঁহার সঙ্কলিত মায়ের উপদেশাবলী শুনাইতেছেন।

শ্রীশ্রী মায়ের নিকট সিদ্ধাই প্রদর্শনের চেষ্টা

আজ পাঠান্তে ভাইজীর কথা উঠিল। মা বলিলেন, "সাধু মহাত্মা দেখিলে ভাইজী খুব শ্রদ্ধার সহিত তাঁহাদের সেবা করিত। এই জন্য অনেক সাধু তাহার নিকট যাইত। একবার এক সাধু গিয়া তাহাকে বলিল যে, সে লোকের প্রার্থনানুরূপ যে কোন দেবদেবী দেখাইয়া দিতে পারে। ভাইজী যদি কোন দেবদেবী দেখিতে চায় তবে সে তাহাকে উহা দেখাইয়া দিবে। ভাইজী বলিল যে তাহার নিজের কিছু দেখিবার ইচ্ছা নাই, তবে সাধু যদি অপর কাহাকেও উহা দেখাইতে প্রস্তুত থাকেন তবে হয়ত দেখা যাইতে পারে। সাধু বলিল যে, সে যে কোন লোককেই ঐ সকল দেবমূর্ত্তি দেখাইতে পারে। তখন ভাইজী আসিয়া ভোলানাথের সহিত পরামর্শ করিয়া ঠিক করিল যে সে সাধুকে শা'বাগে লইয়া আসিবে এবং আমাকে ঐ সকল মূর্ত্তি দেখাইতে বলিবে।

তাহারা এই রূপ স্থির করিয়া সাধুকে সন্ধ্যাবেলা শা'বাগে লইয়া আসিল এবং এদেহকে দেখাইয়া বলিল যে ইহাকে দেখাইতে হইবে। সাধু তখন বলিল যে, সে দেখাইতে প্রস্তুত আছে, তবে এদেহকে তাহার কথা মত চলিতে হইবে। একটি অন্ধকার ঘরে এদেহকে তাহার সহিত বসিতে হইবে এবং সেখানে অন্য কেহ থাকিতে পারিবে না। ইহা শুনিয়া ভোলানাথ ভয় পাইয়া গেল পাছে ঐ সাধু এদেহের কোন অনিষ্ট করে। ভাইজী ও দোমনা। তখন আমি তাহাদিগকে বলিলাম, "তোমরা যখন সাধুকে কথা দিয়া আনিয়াছ, তখন তাহার কথামত তোমাদিগকে অবশ্যই চলিতে হইবে। এখন আর তোমরা উহার অন্যথা করিতে পারিবে না।" আমার কথা শুনিয়া ভোলানাথের মতের পরিবর্ত্তন হইল। তখন একটি ছোট ঘরে সাধু এবং আমি বসিলাম। সাধু এদেহের হাতের পাতায়, আঙ্গুলের নখে এবং চোখে কাজল লাগাইয়া দিয়া বলিল যে এ দেহ হাতের পাতা এবং নখের দিকে চাহিয়া থাকিলেই দেব, দেবী, মন্দির ইত্যাদি দেখিতে পাইবে। আমি স্থির হইয়া বসিয়া হাতের পাতার দিকে চাহিয়া রহিলাম। সাধুও চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। ঘন্টার পর ঘন্টা যাইতে লাগিল। এইভাবে বসিয়া থাকা এ দেহের পক্ষে নূতন কিছু নয়, কিন্তু সাধু নিজে আর ঐভাবে বসিয়া থাকিতে না পারিয়া জিজ্ঞাসা করিল যে আমি কিছু দেখিতে পাইতেছি কিনা। আমি বলিলাম, "কিছুই না।" সাধু দৃঢ় বিশ্বাস নিয়া আসিয়াছিল যে সে আমাকে কত কিছুই দেখাইয়া দিবে। পরে সে অপরের নিকট বলিয়াছিল, "ইহাকে (অর্থাৎ মাকে) কিছু দেখান সম্ভব নয়।" ডঃ পান্নালাল মাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মা, আপনার সংস্পর্শে আসিয়া ঐ লোকটির মঙ্গল হইল কি?" মা কোন উত্তর না দিয়া শুধু হাসিলেন।

চালনার পাগলা শিব —

১১ ই ভাদ্র, বুধবার (ইং ২৭.৮.৫২)

কয়েকদিন যাবৎ ডঃ পান্নালাল তাঁহার লিখিত মায়ের জীবনী এবং উপদেশ পাঠ করিয়া মাকে শুনাইতেছেন। এই পাঠের উদ্দেশ্য হইল এই যে যদি উহাতে কোন ভুল ভ্রান্তি থাকে মা হয়ত উহা সংশোধন করিয়া দিবেন। এই জাতীয় পাঠ হইলে মা যে কখনও কখনও কিছু কিছু সংশোধন করিয়া না দেন তাহা নহে;তবে অধীত বিষয় অনেক সময়ই মায়ের কর্ণগোচর হয় না, এবং কখন কখন ভুলভ্রান্তি কর্ণগোচর হইলওে উহা সংশোধন করিয়া দিবার খেয়াল হয় না। ইহা বড়ই বিচিত্র। এইজন্য এ কথা বলা চলে না যে, যেহেতু মায়ের জীবনের কোন ঘটনা বা উপদেশ মাকে পড়িয়া শুনান হইয়াছে এবং মা ঐ সম্বন্ধে কোন উচ্চবাচ্য করেন নাই কাজেই উহা অভ্রান্ত। তবে মায়ের নিকট এ জাতীয় পাঠের যে কোন সার্থকতা নাই একথা বলা চলেনা। কারণ মা অনেক সময় আমাদের বর্ণিত ঘটনাবলীর সূত্র ধরিয়া অনেক নূতন কথা বলেন।

ডঃ পান্নালাল তাঁহার পুস্তক হইতে চালনার শিবের গল্পটি মাকে পড়িয়া শুনাইলেন। শ্রীশ্রী মায়ের বয়স যখন ৭/৮ বৎসর তখন একবার তিনি তাঁহার এক আত্মীয়ার (যাহাকে তিনি বড় মা বলিতেন) সহিত চালনার শিব দর্শনে গিয়াছিলেন। এই শিব সম্বন্ধে নানারূপ কিংবদন্তী ছিল। এই জন্য লোকে ইহাকে পাগলা শিব বলিত। শ্রীশ্রী মায়ের আত্মীয়া মাকে শিব মন্দিরে রাখিয়া মেলা দেখিতে গেলে মা দেখিতে পাইলেন যে শিবলিঙ্গ হইতে মহাদেব বাহির হইয়া আসিয়া মায়ের সম্মুখে নৃত্য করিতেছেন। এই ঘটনাটি ডঃ পান্নালাল যখন মাকে পড়িয়া শুনাইলেন এবং ঐ সম্বন্ধে আরও কিছু শুনিতে চাহিলেন, তখন মা বলিলেন, "ঐ বড় মা এ দেহকে শিব মন্দিরে রাখিয়া যায় নাই আর ওখানে কোন মন্দিরও ছিল না। একটি টিনের ঘরের মধ্যেই শিব স্থাপিত ছিল। ঐ ঘরের সম্মুখে একটা গাছ ছিল। এ দেহের বড়মা এদেহকে ঐ গাছতলায় রাখিয়া মেলা দেখিতে গিয়াছিল। এ কথা ঠিক নয় যে এ দেহ শিবলিঙ্গ হইতে মহাদেবকে বাহির হইয়া আসিয়া নৃত্য করিতে দেখিয়াছিল। ঘরের মধ্যে যে লিঙ্গ ছিল উহা একভাবেই ছিল, উহার সম্মুখে মহাদেবকে নৃত্য করিতে দেখিয়াছিলাম। ঐখানে একটা পুকুর ছিল। যখন এ দেহের দৃষ্টি পুকুরের উপর পড়িয়াছিল তখন দেখা গিয়াছিল যে ঘরের ঐ শিবলিঙ্গই পুকুরের জলের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে একবার ডুব দিতেছে আবার জল হইতে মাথা উঠাইতেছে। এইভাবে সে জল তোলপাড় করিয়া যাইতেছে।"

(ক্রমশঃ)

*

কে এই মা ?

— কমলা ভট্টাচার্য্য

ত্রেতা যুগে শ্রীরামচন্দ্র ও দ্বাপরে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ থেকে শুরু করে ধরাধামে মানুষের রূপ ধরে যাঁরাই এসেছেন তাঁদের সকলকেই একটা বিশেষ অবস্থার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। সেটা এই যে একদল লোক অহঙ্কার এর বশবর্তী ও তমোগুণাচ্ছন্ন হয়ে তাঁদের বুঝতে পারেননি, জানতে পারেননি। পরবর্তীকালে ঠাকুর রামকৃষ্ণ, ত্রৈলঙ্গস্বামী, ঠাকুর ওঙ্কারনাথ, বাবা লোকনাথ, যীশুখ্রীষ্ট এদের সকলকে অল্পবেশী এই অবস্থায় পড়তে হয়েছে। এঁদের মধ্যে যীশুখ্রীষ্টই সর্বাধিক নির্য্যাতিত হয়ে বলেছিলেন ‘ Father forgive them, for they know not what they do !’

মা আনন্দময়ীর বেলায় ঘটনাটা ঘটে অন্য প্রকারে। তখন মা নিজেকে প্রকাশ করেননি। স্ত্রীলোক হওয়ার জন্য প্রথমে সাধুরা মাকে বিশেষ পছন্দ করতেন না। পূর্ণানন্দ স্বামী মায়ের কাছে না এসে এক শিষ্য দ্বারা মাকে গোপনে একটা প্রশ্ন করে পাঠিয়েছিলেন এবং উত্তর নিয়ে যেতেও বলেছিলেন। প্রশ্ন - ‘আপনার স্বপ্ন কী রকম হয় ?’ উত্তরে মা যা বলেছিলেন তার মূল এই যে, “অজ্ঞান অবস্থায় নিদ্রা হয়। সেই নিদ্রাতেই স্বপ্ন হয়। যাহার অজ্ঞানতা নাই, তাহার নিদ্রাও নাই। স্বপ্ন আসিবে কোথা হইতে ?” মা সম্পূর্ণ নাগালের বাইরে।

ভগবান রামচন্দ্রকে মাত্র বারো জন ঋষি নাকি জানতে পেরেছিলেন। সে ছিল ত্রেতা যুগ। মাকে কে-ই বা জানতে পেরেছেন। দু-একজন যাঁরা জেনেছিলেন তাঁরা সম্ভবত এক খণ্ড জানতে পেরেছিলেন, তা-ও মা কৃপা করে জানিয়েছিলেন তা-ই।

ঠাকুর রামকৃষ্ণ একবার এই ঘটনাটা বলেছিলেন !

“কথায় আছে যার যেমন পুঁজি, জিনিষের দর তেমনি।”

একজন বাবু তাঁর চাকরকে বলেন, “তুই এই হীরেটা বাজারে দিয়ে যা। আমায় বলবি কী রকম দর দেয় আগে বেগুনওলার কাছে যাবি।” চাকরটি বেগুনওলার কাছে যায়। বেগুনওলা হীরেটা নেড়ে চেড়ে বলল, “ভাই নয় সের বেগুন দিতে পারি এর বদলে। আর একটু বেশী হলে দশ সের দিতে পারি - বাজারের দর-এর চেয়ে বেশী দিচ্ছি।”

বাবু সব শুনে হেসে বললেন, “আচ্ছা কাপড়ওলার কাছে যা, সে কি বলে দেখ।” কাপড়ওলা বললো, “হ্যঁ জিনিষটা ভালো, এতে গহনা হতে পারে। তা ভাই নয় শো টাকা দিতে পারি ও শেষে হাজার টাকায় উঠতে পারি।” চাকর আবার ফিরে এলো।

বাবু এবার হেসে বললেন, “এইবার জহুরীর কাছে যা, সে কি বলে দেখ।” চাকরটি জহুরীর কাছে এলো জহুরী একটু দেখেই একেবারে দাম দিল এক লাখ টাকা। জহুরী ছাড়া জহর বা হীরে কে চিনতে পারে ?

ভগবতী মা আমাদের, সাক্ষাৎ জগদ্ধাত্রী — মানুষ রূপে এসেছিলেন। মা বলেছেন নিজেকে জানা মানেই ভগবানকে জানা। মার কথাতেই জেনেছি যে আত্মোপলব্ধির এক চরম পর্য্যায়ে ভাইজী পৌঁছেছিলেন। জীবনের শেষ মুহূর্তে ভাইজী বলেছিলেন বাবা ভোলানাথকে, "আমি ও মা এক।" শ্রদ্ধেয় গোপিনাথ কবিরাজ মহাশয়ের বিষয়ে জানতে পারি মায়েরই কথা থেকে। তিনি মাকে বুঝতে পারতেন। ঠাকুর ওঙ্কারনাথ ত মাকে আদ্যাশক্তি হিসাবে বর্ণনা করতেন।

কৃষ্ণ কথায় আছে ঋষিরাই গোপিনী হয়েছিল। মা বলতেন, "বাহিরের দিক দিয়া দেখিলেও গরু রক্ষা করে গোপীরা। গোপ নাম হইল গোপন হইতে। কারণ মাখন গুপ্ত ভাবে দুধের মধ্যে থাকে।" মার অনেক কিছুই গোপন ছিল সাধারণ দৃষ্টির সম্মুখে। আর মায়ের কথা, "আমি ছোট মেয়ে, আমি কিছু জানি না। যা হয়ে যায়, যা বলাও তাই বলিয়া থাকি।"

মাকে নাগালে পেতে গেলে চাই নির্মল ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা ভক্তি। তার পরেই ত শুরু হবে আমাদের নিজেকে জানার পথের যাত্রা। আমাদের যাচাই করবার শক্তি কই? ভক্তের আস্পৃহা দেখে ভগবান লীলা করতে আসেন এবং মানুষের যাচাই এর ফাঁদে স্বেচ্ছায় ধরা দেন।

মা কথায় কথায় বলতেন, "তাঁকে ধর। ধরিয়া থাকিলে পড়িয়া যায় না।" গুরুকে অবলম্বন করে, তাঁকে বিশ্বাস করে এগিয়ে যেতে হবে তবে যদি বন্ধুর পথ একটু সহজ হয়। ঠাকুর রামকৃষ্ণ বলতেন, "এগিয়ে চলো, আরও এগোও। শেষে যখন গন্তব্য স্থানে পৌঁছবে তখন হীরে পাবে।" হীরেকে কাঁচ ভাবলে, সেটা আমাদের মানসিক বোধ শক্তির বা অন্তর্দৃষ্টির দারিদ্র্যই প্রমাণিত করে।

কথোপকথনের মাঝে খণ্ড খণ্ড ভাবে মার প্রকাশ।

রামতারণ বাবু গম্ভীর প্রকৃতির লোক। কিন্তু রসিকও তদ্রূপ। এক একটা কথা যা বলেন তার যথেষ্ট মূল্য। মাকে একবার তিনি তিনটে নাম দিয়েছিলেন — ১) জ্ঞানপাপী ২) কেউটে সাপ ৩) বিশ্রী মিষ্টি হাসি — বিশদ ব্যাখ্যা করে বলেন — জ্ঞানপাপী, "কেন না আপনার শক্তি থাকা সত্ত্বেও মা আমাদের কিছু দিচ্ছেন না"; কেউটে সাপ — "একবার ছোবল মারিলেই তাহার বিষ আর নামে না — মাকেও যে একবার চিনিয়াছে তাহার আর ছাড়িবার উপায় নাই"; বিশ্রী মিষ্টি হাসি — "কিনা বিশেষ শ্রীযুক্ত মিষ্টি হাসিটুকু।" মাকে দেখিলেই রামতারণবাবুর দুচোখ জলে ভরিয়া উঠিত।

কুমুদ ভট্টাচার্য্য একদিন জিজ্ঞাসা করলেন, "শান্তি কিসে হয় মা?" মা উত্তর দিলেন, "দূর অন্ত হলেই শান্তি হয়। যতক্ষণ তিনি দূরে আছেন এই বোধ থাকে ততক্ষণই অশান্তি বোধ। তাঁকে জানা চাই। তারজন্য অন্ধ বিশ্বাস চাই। বিশ্বাসের চক্ষু নাই।"

মা সর্ব্বরূপে বিরাজমানা। কখনও অহেতুকী বাৎসল্য ভাবের রূপ ধারণ করে, কখনও সন্তানের প্রতি অপার করুণাবশতঃ জাগতিক জীবনে ভগবানকে কেন্দ্র করে জীবন নির্ব্বাহের উপদেশ দেন গুরুরূপে, আবার

নিজ শরীরে রোগ এর আক্রমণকে বিষয় বস্তু করে তত্ত্বকথার বিতরণ — এরকম আরও কত কী!! এমন একটি বিষয় বস্তু নেই যা মায়ের সামনে উপস্থাপিত হয়নি এবং যার interpretation মা দেননি। নানা লোকে নানা ভাব নিয়ে মায়ের কাছে এসেছেন। মাও যাহার যা ভাব সেই ভাবেই কথা বলে শান্ত করেছেন।

কতরকম ভাবে মা আমাদের মনকে ভগবানকে কেন্দ্র করে জাগতিক জীবন যাপন করবার শিক্ষা দিয়েছেন। একজনকে মা বলে ছিলেন, "তোমরা কাজের পর পেনসন পাও। ভগবৎ স্থানেও পেনসন পাওয়া যায়। ঐ পেনসন কিন্তু শেষ হয় না।"

আবার অন্যজনকে "তোমরা দুশ্চিন্তা বল না? দুশ্চিন্তা কেন হয় জানো? ভগবানকে দূরে রাখলেই দুশ্চিন্তা হয়। দুর্বুদ্ধির অর্থও তাই। ভগবানকে দূরে রাখা মানে দুবুর্দ্ধি অর্থাৎ তিনি দূরে।"

দয়াময়ী মায়ের একবার হার্টের ব্যাধি হলে ডাক্তার যে ঔষধ দেয় তাতে বিপরীত ক্রিয়া হয়। তাতে ডাক্তার বললেন, "মা তুমি নিজেকে রোগমুক্ত করার ব্যবস্থা করো। ঔষধে আর হবে না।" মা হাসতে হাসতে বলেছিলেন, "ভালোই হয়েছে। আমি ত সকলকে বলি বাহির ছেড়ে অন্তরে যাবার চেষ্টা করো। ঔষধও বাহির হতে অন্তরকে ধরেছে।" ভক্তের প্রার্থনা ও তাহার আকুলতায় মা কয়েকবার শরীর রক্ষা করেছিলেন। মা বলিতেন, "হয়ত তোমাদের দরকার তাই এইসব হইয়া যাইতেছে।"

মা ত শরীর ত্যাগ করা পর্য্যন্ত এই চেষ্টাই করে গেছেন যাতে আমাদের মন ভগবৎমুখী হয়। আমরা মায়া, মোহ জালে বদ্ধ জীব তাঁকে বারে বারে নিরাশ করেছি। আবার সংসারের জ্বালা যন্ত্রণায় বিপর্য্যস্ত হয়ে আবার মায়ের কাছেই ফিরে গেছি সমস্যার সমাধানে, একটু আনন্দ, একটু শান্তির আশায়। কৃপাময়ী জননী বারে বারে আমাদের কাছে টেনে নিয়েছেন;আর মনোরম স্নিগ্ধ হাসি ও ভালোবাসার পরশ দিয়ে আমাদের শান্ত করেছেন।

"যাঁকে পেলে সব পাওয়া যায়, তাঁকে পেতে চেষ্টা করো। তাঁকেই ভাবো। তোমাদের কষ্ট, আবেদন নিবেদন প্রাণ খুলে তাঁকেই জানাও। তিনি পূর্ণ কি না, সব দিক তিনি পূর্ণ করেন। তিনি যে সর্বদুঃখহারী — সর্বদাই তাঁকে ডাকতে চেষ্টা কর। খালি সংযম, সংযম, শুধু সংযম। যতটা সংযমের ভিতর দিয়ে যেতে পারবে ততই জীবন সুন্দর হবে। তদ্‌মুখী হবে।"

"হরি চিন্তা ছাড়া আর সব বৃথা। সময় বৃথা নষ্ট না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখা। সকলে মিলে সপ্তাহে একসঙ্গে সৎসঙ্গ করা।" আমাদের ভিতর যে মন্ত্রের বীজ আছে তাকে অঙ্কুরিত করার জন্য চাই সৎসঙ্গ।

"মন্ত্র কী? যা ত্রাণ করে তাই মন্ত্র।"

"কর্ম যে রকম, ফলও সেইরূপ। তবে ভগবৎ চিন্তা দ্বারা সব ভয় দুর হয়।"

মহাপুরুষদের কথার সঙ্গে মায়ের কথার সমতা আছে। যেমন বাবা লোকনাথ বলেছেন " ... তাঁকে স্মরণ করলে সব ভয়, দুঃখ দূর হবে।" ঠাকুর রামকৃষ্ণ কি বলেননি, "গুরু শক্তি প্রকাশ হলে আর ফেল হয় না।" দেবতাদেরও আকাঙ্খিত মনুষ্য জন্ম পেয়েও মাতৃ আদেশ মান্য করবার চেষ্টা থেকে যদি বিরত হই তবে পশুতে

ও আমাদের প্রভেদ কোথায়?

সাধনার পথে যাতে আমরা এগিয়ে চলি তাই মা উৎসাহ দিয়ে বলেছেন, "ভক্তির বীজ উপযুক্ত আধারে পড়লে অব্যর্থ হয়, ক্রমে ক্রমে তার ফল দেখা দেবে।" আধার তৈরী করার দায়িত্ব ত আমাদের — মা ত সর্ব্বদাই আমাদের হাত ধরে রয়েছেন। বলেছেন, "ভগবানের দিকে মন না গেলেই দুর্বুদ্ধি, দুর্গতি, দুর্ভোগ।" পদে পদে সজাগ করে দেওয়াটা কী হাত ধরে থাকা নয়? মাতৃকৃপা ত নিরবচ্ছিন্নভাবে বর্ষণ হয়েই চলেছে। পাত্র সোজা রাখলে ভরে যায়, পাত্র উল্‌টা করে রাখলে কিছুই ধরে না। সন্তানের সদ্‌গতি অবশ্যম্ভাবী হওয়ার জন্য শেষে মা সকলের কাছে প্রতিদিন ১৫ মিনিট সময় ভিক্ষা চেয়েছেন। এই সময়টুকু যেন ভগবৎ চিন্তায়, তাঁর ধ্যানে, তাঁর জপে কাটান হয়। মার কাছে সকলেরই অবারিত দ্বার। ঠাকুর রামকৃষ্ণ, বাবা লোকনাথ, ঠাকুর ওঙ্কারনাথের কাছেও সর্ব সম্প্রদায়ের লোকেরা এসেছে। ধনী দরিদ্র নির্বিশেষে মায়ের কাছেও যারা এসেছে কেউ ব্যবহারে কোনও তারতম্য দেখতে পায়নি। মায়ের কাছে "যার যেমন ভাব তার তেমন লাভ।" জাগতিক চক্ষে তারতম্য পেয়ে থাকলে, তা গভীরভাবে নিজেকে অনুসন্ধান করার বিষয়। এক ভদ্রলোক অন্য এক ভদ্রলোকের পরিচয় দিতে গিয়ে মাকে বলেছিলেন, 'ইনি খুব ধনী, খুব উচ্চশিক্ষিত ইত্যাদি।' মা শুনে বলেছিলেন, 'দেখ বাবা, পরম ধনে যারা ধনী তারাই প্রকৃত ধনী। এই জাগতিক বিদ্যাত বিদ্যাই নয়, পরমার্থ বিদ্যাই প্রকৃত বিদ্যা। সেই ধন যার নেই, সে ত গরীব।"

মা'র কাছে আমরা কত কী জেনেছি। কত শাস্ত্রের বিষয়, যাগযজ্ঞের বিষয়, নানা ধর্ম অনুষ্ঠানের বিষয়। সহজ, সরলভাবে পুংখানুপুংখ বিশ্লেষণ — আবার সেই সব বিষয়ের তাৎপর্য্য। যেমন এক ভক্তের প্রশ্নের উত্তরে মা অক্ষয় তৃতীয়ার মাহাত্ম্য সম্বন্ধে বলেছেন, এই দিনে সত্যযুগ আরম্ভ হয়। এই দিনেই পরশুরামের জন্মদিন। জপ, তপ, দান যা কিছু কর সব অক্ষয় হয়। বদ্রীনাথের দরজা খোলা হয়। বৃন্দাবনে বিহারী লালজীর চরণ দর্শন হয়। এই দিনে জল দান করে ঠাকুরকে বলা, "ঠাকুর আমার পিপাসার নিবৃত্তি কর। অক্ষয় তৃপ্তি লাভ, চির তৃপ্তি লাভ কর।"

মার বিষয়ে লেখার কী শেষ আছে? তাই এই কয়েকটি শব্দে জানাই আমাদের মায়ের প্রতি প্রণতি —

"সীমার মাঝে অসীম তুমি বাজাও আপন সুর..."

ভিন্ন সুরে

"যা দেবী সর্বভূতেষু মাতৃরূপেন সংস্থিতা
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ।

*

মা

(গান)

— শ্রীমতী অঞ্জলি ভট্টাচার্য

ওগো মা, মাগো,
তুমি বিনা দিন তো চলে না।
সারাদিন খেলায় মেতে এখন এই সাঁঝ বেলাতে
আঁধারেতে কিছু যে দেখি না। তুমি হাত বাড়িতে ধর না।।
মা যে গো হয় স্নেহময়ী অহেতুকী কৃপাময়ী
(তাই) ছেলে যদি যায় রে দূরে, তবু থাকে সে মা'র হৃদয় জুড়ে।
মা তো তারে ভুলতে পারে না, মা তো তারে ফেলতে পারে না।
তুমি গুরু তুমি ইষ্ট। পায় না ছুঁতে কোনও অনিষ্ট
তোমার স্থিতি সেখানেতে অনিষ্ট তো পথ পায় না।।
জানিনাকো সাধন ভজন, নাইকো আমার কোনও আরাধন
গানে গানে সারাজীবন তোমায় ডেকে চলেছি মা।
তুমি বিনা দিন তো চলে না।।
জানি তোমায় আসতে হবে সন্তানেরে কোলে লবে
ছেলে যদি কুপুত্র হয়, মা তো কভু বিমুখ হয় না।।
তুমি বিনা দিন তো চলে না।



মাতৃ-স্বরূপামৃত

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

— শ্রী প্রিয়ব্রত ভট্টাচার্য্য

"পূর্ণব্রহ্মনারায়ণ"

মায়ের মুখ থেকে তাঁর স্বরূপ পরিচয় একবার উচ্চারিত হয়েছিল, "পূর্ণ ব্রহ্মনারায়ণ"। মাকে প্রশ্ন করা হয়েছিল, "মা! এই যে 'পূর্ণ ব্রহ্মনারায়ণ' শব্দটি শ্রীমুখ হইতে বাহির হইল, এখানে এ প্রশ্ন ত আসে যে - ইহা কি সাধনলব্ধ স্থিতির কথা? না ঐ চরম পরম স্বয়ং?" ইহা জানিবার জন্য বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিলে উত্তরে মা বলিলেন - "আরে! এই ছোট মেয়েটা ত যা তা। তাই ত প্রকাশ। সাধনার গতিতে কি এই কথা? তোরা চতুর্ভুজ মূর্ত্তিই কি কেবল ভাবছিস?" একটু পরেই গম্ভীর স্বরে বলিলেন — "আমাকে জানতে চেষ্টা কর - যেখানে নির্দ্বন্দ্ব। এ মন দিয়া কি দ্বন্দ্ব মিটাইবি?" (মায়ের কথা, ভাইজী, ৮০-৮১)।

ঋক্ বেদের দশম মণ্ডলের ৯০ তম সূক্তের ঋষি ও দেবতা হলেন পুরুষ-নারায়ণ। পুরুষ সূক্তে নারায়ণ হলেন প্রাণ সিঞ্চনকারী জীবন-বীজ। তিনি বিরাজ সৃষ্টি করেন। বিরাজের মধ্যে প্রবেশ করেন। বিরাজ বিশ্ব নিখিল সৃষ্টি করে। বিরাজ কি? যিনি সমষ্টি সূক্ষ্ম শরীরে হিরণ্যগর্ভ রূপে স্থিত, তিনিই সমষ্টি স্থুল শরীরে বিরাজ রূপে বা বিরাট রূপে প্রকাশিত হন। সূক্ষ্মসৃষ্টি করে তিনি সর্বদেহে অনুপ্রবিষ্ট হয়ে পরে নানা রূপে প্রকট হন। আসল কথা সূক্ষ্ম সৃষ্টিতে তাঁকে হিরণ্যগর্ভ এবং দৃশ্য প্রপঞ্চে তিনি বিরাজ নামে পরিচিত হন। এই হিরণ্যগর্ভই সূত্রাত্মা - তিনিই অন্তর্যামী পুরুষ নারায়ণ। "হিরণগর্ভঃ সমবর্ততাগ্রে ভূতস্যজাতঃ" (ঋ.বে. ১০।১২১।১) অর্থাৎ হিরণ্যগর্ভই আদিদেব, তিনি জলে জন্মে ছিলেন। সৃষ্টিপূর্ব অবস্থাটা কি ছিল? তমের দ্বারা তমাবৃত ছিল প্রথমে। চিহ্নহীন জল, অবিদ্যমান বস্তুদ্বারা সেই সর্বব্যাপী আচ্ছন্ন ছিলেন, তপস্যার দ্বারা সেই এক বস্তু জন্মিলেন। (ঋ.বে. ১০।১২৯।৩) এই 'একবস্তু' হিরণ্যগর্ভ, সৃষ্টির আগেও তিনি বর্তমান ছিলেন। ঋক্‌বেদ আরো বলছেন যে সৃষ্টি পূর্বে জল সমস্ত বিশ্ব নিখিল আচ্ছন্ন করেছিল, সেই জল গর্ভধারণ করে অগ্নি উৎপাদন করল, তা থেকে দেবতাদের প্রাণপুরুষ যিনি, তাঁর আবির্ভাব হল (ঋ.বে. ১০।১২১।৭)। তারপর এই সূক্তের শেষে প্রশ্ন উঠল "কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম" অর্থাৎ 'কোন দেবতাকে হবিদ্বারা পূজা করব?' 'কোন দেবতা' হিসাবে মূলতঃ এখানে জল মধ্যে ভাসমান বীজ -রূপ নারায়ণের কথাই ভাবা হয়েছে। তবে পরমেষ্টি প্রজাপতি, অগ্নি, সূর্যরূপী ব্রহ্মা এবং হিরণ্যগর্ভের কথাও ভাবা যেতে পারে। কারণ বেদে তাঁরা সবাই এক ও অভিন্ন রূপে প্রকাশিত।

পুরুষ নারায়ণ বেদে বিষ্ণু, বিষ্ণুই সূর্যের অন্যতম প্রকাশ। সূর্যই নারায়ণ, সূর্যমন্ডলের মধ্যে তাঁর শুধু অবস্থান নয়, উভয়ের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। নারায়ণ সৃষ্টির স্বমূল। ঋকবেদের দশম মন্ডলের ৯৮/১২ সূক্তে বলা হয়েছে অগ্নিকে "প্রকাণ্ড আকাশে যে এই সমুদ্র বিদ্যমান হয়েছে, তা থেকে অপরিসীম জল এনে দাও।" তাহলে বুঝা গেল যে সূর্যাগ্নির তেজ জড়ানো মহাকাশই সমুদ্র বা অপ্ নামে ঋকবেদে গৃহীত হয়েছিল। মেঘরূপী সলিলের আধার আকাশ এবং এই আকাশের অধিপতি সূর্য জলের কর্ত্তা। অথর্ব বেদও বলেছেন সূর্যের আকাশ সলিলে ভেসে বেড়ানোর কথা (অ. বে. ১১।২।৬।২১)। আদিত্য বিষ্ণু বা পুরুষ নারায়ণ, ইন্দ্র, অগ্নি, বরুণ প্রভৃতি

দেবতার নিবাস স্থান আকাশ সমুদ্র। অগ্নিগর্ভা অগ্নিজননী অপ্‌দেবতা সূর্যরশ্মিতে উজ্জ্বল আকাশই ঋক্ বেদের সমুদ্র। পরবর্ত্তীকালে আকাশ সলিল ও পার্থিব সলিল অপ্ নামে খ্যাত হয়েছে। উভয় সলিল একাত্ম হওয়ায় বিশ্ব নিখিলের জীবজড় সৃষ্টির স্বমূল হিসেবে সলিলই কারণ রূপে শুধু বেদে নয়, বেদান্তে স্বীকৃত হয়েছে। যাস্ক বলেছেন, 'জল পবিত্র বলেই সর্বদেবতার নিবাস স্থল এবং সর্বদেবতার উৎপত্তিস্থল। ঋক্‌বেদ স্পষ্টভাবে বলেছেন "সমিদ্ গর্ভ প্রথমং দধ্র আপো যত্র দেবাঃ সমগচ্ছন্ত বিশ্বে। অজস্য না ভাবদ্যেকর্ম পিতং সম্মিন্বিশ্বানি ভুবনানি তস্তুঃ।" অর্থাৎ 'জলে বিশ্ববীজ রয়েছে, যাতে সমস্ত দেবতা একত্রিত। তিনি ছিলেন অজ, এক, যাঁর নাভিতে সবকিছু রয়েছে।' অজ হলেন 'একম্', তাঁর নাভিতে রয়েছে বিশ্ব নিখিল সৃষ্টির মূল। তিনি 'কিমপি সবিদ্' রহস্যময় বস্তু, যাকে ব্যাখ্যা করা যায় না, প্রকাশকেও হার মানায়। তাঁকে ভাগ করা যায় না।

অজ বিশ্ববীজ, তিনি অগ্নি প্রজাপতি, তিনি নিদ্রাগত নারায়ণ। অজ নিদ্রাগত হয়ে সলিলে শয়ান — এখানে তিনি স্থিতি। নিদ্রার সময় তিনি লোক সমূহকে নিজেতে লীন করে নেন। সৃষ্টির সময় নাভি থেকে তা ছেড়ে দেন। তাই অজই হলেন নিদ্রাগত নারায়ণ-বিষ্ণু। তিনি 'একম্', স্থিতি-গতি হীনভাবে তিনি নারায়ণ বিষ্ণু। ঋক্‌বেদ তাঁকে লক্ষ্য করে বলেছেন, "একম সদ বিপ্রা বহুধা বদন্তি (ঋ. বে. ১।১৬৪।৪৬)। অরূপ অবস্থায় তিনি পরম ব্যোম, সহস্রাক্ষরা। তিনি কখনও বাক্ বা গৌরী বা ব্রহ্মাত্মক বাক্য। ঋক্‌বেদের ১।৬৭।৩ সূক্তে বলা হয়েছে অজই সূর্য, যিনি "অজো ন ক্ষাং দাধার পৃথিবীং তস্তম্ভদ্যাং মন্ত্রেভিঃ সত্যৈঃ" অর্থাৎ 'অগ্নি অজাত পুরুষের ন্যায়। পৃথিবী ও অন্তরীক্ষ ধারণ করে আছেন।' অগ্নি এখানে সূর্য, তাই সূর্যরূপী বিষ্ণু-নারায়ণকে ঋক্‌বেদের ঋষি 'একম্' বলেছেন। ঋক্‌বেদের ঋষি আরো বলেছেন যে "অজ' স্বর্গীয় পক্ষ বিশিষ্ট ও সুন্দর গমনশীল। তিনি এক হলেও বহু বলে বর্ণিত হন। তাঁকে অগ্নি, যম, মাতরিশ্বা বলে (ঋ.বে ১।১৬৪।৪৬)। এই ঋক্ মন্ত্রের 'গরুত্মান' উপমার মধ্যে নারায়ণের গরুড় পক্ষীর ধারণার উৎস রয়েছে।

সূর্যই নারায়ণ, চার বেদেই তাঁকে যজ্ঞ-নারায়ণ রূপে স্তুতি করা হয়েছে। সূর্য-নারায়ণের রশ্মিরাশিকে দেবদেবীরূপে বেদে কল্পনা করা হয়েছে। দীর্ঘাকার সূর্য রশ্মিগুলিকে, যেমন বৃষ্টি, জল প্রভৃতি আহরণ কর্মে নিযুক্ত যাঁরা, তাঁদের যে শক্তি পালন করেন, তাঁরাই নিরুক্তকার-গণদ্বারা দেবীশক্তি বলে সমর্থিত হয়েছেন। দেবীশক্তি বেদে অক্ষয়া মায়াশক্তি, যাঁর সঙ্গে আত্মা অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত — এই দেবীশক্তিরাই হলেন সূর্যা-নারায়ণী, বাক, অদিতি, অগ্নায়ী, ইন্দ্রানী, সরস্বতী ইত্যাদি। এই সব দেবীরা অগ্নি স্বরূপ, তাঁরা পার্থিব জগতকে ঘিরে রেখেছেন। তাঁরা প্রজ্ঞাযুক্ত নিরাকার চৈতন্য। জীবাত্মার সঙ্গে নিরাকার প্রজ্ঞাযুক্ত চৈতন্যময়ী দেবীশক্তির হৃদ্যতা। বেদে সূর্য নারায়ণের অঙ্গ-স্বরূপ দেবদেবীরূপী রশ্মিগণ ভিন্ন ভিন্ন নামে ভিন্ন ভিন্ন কর্ম করেন। একের শক্তিই মূলত বহুরূপে প্রকাশিত হয় এই 'এক'ই বৈদিক বিষ্ণু, নারায়ণ বা আদিত্য।

নারায়ণ ছাড়া বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে ভাববার কিছু নেই। বেদে সূর্যকে বলা হয়েছে 'সম্বৎসর'। কখনো বলা হয়েছে 'কাল', আবার কখনো বলা হয়েছে 'সুপর্ণ'। সুপর্ণই হল সূর্যরূপী গরুড়, পরবর্তীকালের পুরাণের নারায়ণের বাহন গরুড়। গরুড়ের দুটি পাখাই হল সূর্যের সঙ্গে যুক্ত বৈদিক কাল ও ব্যোম। কালচক্রের ছন্দই আবার গরুড়, অহ ও রাত্রিকে তার দুটি পাখার রূপকে প্রকাশ করা হয়েছে। বৈদিক কালচক্রই নারায়ণের সুদর্শন চক্র, পুরাণের সূর্যের রথচক্র। কালচক্রের মধ্যে হয়েছে জন্ম, মৃত্যু, সৃষ্টি, লয়। ঋক্‌বেদের ১৬৪ সূক্তের ৪৮ ঋকমন্ত্রের দেবতা

সম্বৎসর রূপী কাল। এই কালের দ্বাদশ পরিধি, একচক্র এবং নাভি। কালচক্রে ত্রিশতষষ্টি সংখ্যক চলাচল সন্নিবিষ্ট রয়েছে। সায়নাচার্য ব্যাখ্যা করে বলেছেন যে দ্বাদশ মাস হল পরিধি, বৎসর হল চক্র, তিন নাভি হল গ্রীষ্ম, বর্ষা ও হেমন্ত ঋতু, শঙ্কু তিনশত ষষ্টি দিবস। এই কাল চক্রকে ঋক্‌বেদে আরও নানাভাবে প্রকাশ করা হয়েছে। অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঋক্‌টি হল "বিষ্ণোনু কং বীর্যাণি প্রবোচং যং পার্থিবানি বিমমে রজাং সি। যো অসকভায়দুত্তরং উধস্থং বিচক্রমাস্ত্র ধোরুগায়।" (ঋ. বে. ১।১৫৪।১) অর্থাৎ 'আমি বিষ্ণুর বীরকর্ম শীঘ্রই কীর্ত্তন করি তিনি পার্থিবলোক পরিমাণ করেছেন। তিনি উপরিস্থ জগত স্তম্ভিত করেছেন।'তিনি তিনবার পদক্ষেপ করেছেন। লোকে তাঁর প্রভূত স্তুতি করে।' ঋক্‌বেদের প্রথম মন্ডলের ১৫৫ সূক্তের ৬ষ্ট ঋকে বলা হয়েছে, "চতুভিঃ সাকং নবতিং চ নামভিশ্চক্রং ন বৃত্তং ব্যতীরবীবিপৎ। বৃহচ্ছরীরো বিসিমান ঋক্কভিযূবা কুমারঃ প্রত্যেত্যাহ্‌বম" অর্থাৎ "বিষ্ণু গতি বিশেষ দ্বারা বৎসরের চতুর্নবত্তি দিবস, চক্রের ন্যায় চালিত করেন। বিষ্ণু বৃহৎ শরীর বিশিষ্ট এবং স্তুতি দ্বারা পুরিমেয়, তিনি নিত্য তরুণ, কুমার, তিনি আহবে গমন করেন।' আসলে চারটি নব্বই দিবস নিয়ে বৎসরের চক্র। কাজেই বিষ্ণু কালের নিয়ামক, তিনিই সম্বৎসর প্রজাপতি, তিনিই সূর্য-নারায়ণ।

নারায়ণ অব্যয়। ক্ষর হল 'সর্ব্বানি-ভূতানি' অর্থাৎ সর্বভূত। অক্ষর হল প্রাণ বা প্রাণাত্মন, ক্ষর হল ভূতাত্মন এবং অব্যয় হল প্রজ্ঞানাত্মন। উক্ত ত্রয়ের উপস্থরে নারায়ণ অব্যয় রূপে আছেন সৃষ্টিমূলের প্রক্রিয়ায় তাঁকে বিভিন্ন নামে বা সংজ্ঞায় অবিহিত করা হয়, যেমন গুহা, নাভি, গর্ভ, সানু, হৃদয়, উর্ধ, অনিরুক্ত, অন্তঃ, পর, অব্যয়, এক, কুলায়, অমৃত, অগ্র ও অমূর্ত্ত। নারায়ণে রয়েছে অনন্ত রহস্য, নামরূপের স্বমূল তিনি। নারায়ণের মধ্যে রয়েছে দুই ধরনের দৃষ্টি ভঙ্গীর মহামূল। একদিকে ব্যক্ত, অন্যদিকে তিনি অব্যক্ত – কখনো তিনি আলো, কখনো বা অন্ধকার, তিনি এক, আবার তিনি অনেক।

পূর্বেই বলা হয়েছে ঋক্‌বেদের পুরুষসূক্তে দেখা যায় যে পুরুষ নারায়ণ বিশ্ব নিখিলকে আবৃত করেছেন এবং দশ অঙ্গুলি যে দশদিক নির্দেশ করে তিনি তা অতিক্রম করে রয়েছেন। এখানে নারায়ণের ঈশ্বরত্ব প্রকাশিত। কারণ একই সঙ্গে তিনি তন্ময়ত্ব ও অতিরিক্তত্ব কল্পনার দ্বারা বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছেন। পুরুষসূক্তে আরো বলা হয়েছে যে তাঁকে ত্রিপাদ মায়া স্পর্শ করতে পারে না। তিনি তা থেকে উর্ধ্বে অবস্থিত। মায়া কবলিত একপাদ, তাঁরই বিশ্বলোকে গমনাগমন হয়। মায়া কবলিত পদেই দেব নর, তির্যকাদি বিবিধ রূপে ব্যপ্ত হন। অন্নপানাদি ভোগমুক্ত জীব এবং জড় রূপে তিনি সর্ব্বত্র স্থিত। এই যে পুরুষ নারায়ণের স্বরূপ ব্যক্ত হল, তা "সর্ব্বং খলু ইদং ব্রহ্ম"কেই যেন প্রকাশ করছে। ঋক্‌বেদের দশম মণ্ডলে বলা হয়েছে যে বিশ্বকর্মা দেবতাও তিনি আদিসত্ত্বা রূপে বিরাট জলরাশির মধ্যে বিরাজমান ছিলেন, তিনিই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের বীজ। তাই ঋক্‌বেদের বিশ্বকর্মা ও পুরুষ নারায়ণ একাত্মক। (ঋ.বে. ১০।৮১।৩)

শতপথ ব্রাহ্মণে নারায়ণ যে পুরুষ তা অতি সুন্দরভাবে প্রকাশিত হয়েছে, "পুরুষং হ নারায়ণং প্রজাপতি রুবাচ। পুরুযোহ নারায়ণোহ্‌ কাময়ত। অতিতিষ্টেয়ং সর্বানি ভূতান্যহ্‌মেবেদং সর্বং স্যামিতি।" (শতপথ, ১৩।৬।১) অর্থাৎ পুরুষরূপী নারায়ণকে প্রজাপতি বললেন, পুরুষ নারায়ণ ইচ্ছা করলেন, আমি ভূতকে অতিক্রম করব, এই সবই আমি হব।' শতপথ ব্রাহ্মণ আরো বলেছেন, "ই মে বৈ লোকা পূরয়মেব পুরুষোহ্‌য়ং পবতে সোহস্মিন্‌ পরিশেতে তস্মাৎ পুরুষ" (শতপথ ১৩।৬।২) অর্থাৎ 'এই সমস্ত লোক পূর্ণ করেন বলেই পুরুষ, যিনি পরি

করেন, তিনি জলে শয়ন করেন, তাই তিনি পুরুষ।' এই যে শতপথ ব্রাহ্মণে নারায়ণের উল্লেখ করা হল, তার সঙ্গে বিষ্ণুর বা কৃষ্ণের যোগ নেই। বোধায়নের ধর্মসূত্রে বিষ্ণুর সঙ্গে নারায়ণের অভিন্নতা প্রথম দেখা যায়। তৈত্তিরীয় আরণ্যকে বলা হয়েছে, "নারায়ণায় বিদ্মহে বাসুদেবায় ধীমহি তন্নো বিষ্ণু প্রচোদয়াৎ" (তৈত্তি. আ. ১০/১১) — এখানে নারায়ণ, বাসুদেব এবং বিষ্ণুকে অভিন্ন বলে প্রকাশ করা হয়েছে। তৈত্তিরীয় আরণ্যকের এই মন্ত্রে প্রথমেই কিন্তু নারায়ণ রয়েছেন, যা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। মূলকথা নারায়ণের সঙ্গেই বাসুদেব ও বিষ্ণুকে এক করে প্রকাশ করা হয়েছে। বেদান্তদর্শনের শংকরভাষ্যে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে " ... তাঁহারা যে বলেন, প্রকৃতি হইতে পর অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ, প্রসিদ্ধ, সর্বাত্মা, পরমাত্মা এই যে নারায়ণ, তিনি নিজেই নিজেকে বহুভাগে বিভক্ত করিয়া অবস্থিত আছেন ইত্যাদি, এ উক্তির সহিত আমাদের কোন বিরোধ নেই, তা খণ্ডনও করিতেছি না, কারণ তিনি এক প্রকার ও হন, আবার তিন প্রকারও হন ইত্যাদি শ্রুতিতে পরমাত্মার বহুভাগে বিভক্ত হইবার বিষয় অবগত হওয়া যায়।" বেদান্তে বর্ণিত নারায়ণে পূর্ণ ব্রহ্ম স্বরূপ প্রকাশিত, তিনি 'এক', তিনিই পরমাত্মা। শ্রুতিতে বলা হয়েছে "একো বৈ নারায়ণ আসীৎ। ন ব্রহ্মা নেশানো নেমে দ্যাবাপৃথিবী ন নক্ষত্রানি নাপো নাগ্নির্ন যমো ন সূর্য ইতি।" অর্থাৎ সৃষ্টির পূর্বে 'তিনি এক নারায়ণ রূপে ছিলেন। তখন ব্রহ্মা, ঈশান, দ্যাবা পৃথিবী, নক্ষত্র, জল, অগ্নি, যম ও সূর্য ছিল না।' শ্রীভাষ্যে শ্রীরামানুজ স্বামী বলেছেন যে "বেদ একমাত্র পরব্রহ্ম স্বরূপ পরমপুরুষ নারায়ণকেই জগতের নিমিত্ত ও উপাদান কারণ বলে থাকেন। পরব্রহ্মস্বরূপ পরমপুরুষ নারায়ণকে স্বরূপে জানাই মোক্ষোপায় উপাসনা বলে নির্দেশ করেন।" (ব্র. সূ. ২.২.৩৭ এর শ্রীভাষ্য)।

নারায়ণ ব্যক্ত ও অব্যক্তে, মূর্তে ও অমূর্তে ব্যাপ্ত হয়েও এদের অতিক্রম করে রয়েছেন। তিনি অদ্বৈতবাদেরও উর্ধে, অদ্বৈতাবাদের দ্বারা তাঁকে সীমায় রাখা যায় না। দ্বৈতবাদ দ্বারাও নয়, আসলে কোন বাদের মধ্যে তাঁকে বেঁধে রাখা যায় না। তিনি দেবতা নন, কিন্তু দেবতা রূপে তাঁর উপাসনায় তাঁর পূর্ণব্রহ্মত্বের হানি হয় না। যে কোন রূপের মধ্যে তাঁর উপাসনা করা যায় এবং তার সাহায্যে পূর্ণ ব্রহ্মে উপনীত হতে বাধা নেই। মুণ্ডোকোপনিষদে তাঁকে লক্ষ্য করেই হয়তো বলা হয়েছে, "আপ্রানোহ্যমনাঃ শুভ্রোহ্যক্ষরা পরতঃ পরঃ।" অর্থাৎ 'অক্ষরা থেকে তিনি পরে পরমাত্মা হয়েছেন, তাঁর প্রাণমন নেই।'

দেবতা যখন ছিলেন না, তখন অক্ষরা ছিলেন। এই অক্ষরা কিন্তু অসৎ। ঋক্‌বেদ বলেছেন, "দেবানাম পূর্ব্বে্যযুগেহ্সতঃ সদ্‌জায়ত।" (ঋক্‌বেদ ১০।৭২।২)। অক্ষর ক্ষর ভাবাপন্ন হয়, অসৎ থেকে সৎ - ব্যক্ত জগত প্রকাশে পায়। এই অক্ষরা তিনি অদিতি শব্দে বেদে প্রকাশিতা। তিনি অখণ্ড এবং সদ্ চিৎ ও আনন্দ। অদিতি ও নারায়ণ এক ও অভিন্ন। অদিতি সূর্য, অদিতি সূর্যাগ্নির তেজরাশি, প্রতিটি রশ্মিইতো দেবতা, তাই তিনি দেবমাতা। অদিতি জলগনের অখণ্ডরূপ, জল মানে তো বেদে আকাশেরই সূর্যরশ্মি। অদিতি বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের মাতা, অনন্তরূপা। তাতেই সমস্ত দেবতা থাকেন, "তে বিশ্বে সহসমপুত্র" (ঋক্‌বেদ, ২।১।৩) : অদিতি অগ্নি. বেদ বলেছেন, "তমগ্নে অদিতিদেব দাশুহে"। 'হে অগ্নি তুমি হব্যদাতার পক্ষে অদিতি।' (খ. বে. ২।১।১১)। অগ্নি বলতে নিত্য ব্যবহৃত প্রাকৃতিক অগ্নিকেই ভাবলে হবে না। বেদে আসলে ত্রিলোকের অগ্নি চৈতন্যস্বরূপ প্রাণশক্তি রূপেই স্বীকৃত হয়েছেন। অগ্নি বেদে জ্ঞানময় ঐশ্বরিক খেয়ালের প্রতীক। সায়নাচার্য স্পষ্টভাবেই বলেছেন, "সব বা এষোহ্গ্রে দেবানাম জায়ত তস্মাদগ্নির্নামেতি" (নিরুক্ত, ৭।১৮।২)। অগ্নি আর সূর্য একাত্মক। পূর্বেই বলা হয়েছে সূর্যই

নারায়ণ, সূর্যই অদিতি। স্বীয় শরীর নিয়ে অগ্নি প্রথম বিশ্বে প্রকাশিত হন দেবতা রূপে "অগ্নিরেতু প্রথমো দেবানাম" (পারস্কর গুহ্য সূত্র, ৫।১১)। অগ্নি জাতও হন — "জাতো যদগ্রে ভূতানাম" (বৃহদ্দেবতা, ২।২৪)। অগ্নি একটি তত্ত্ব, প্রথম তত্ত্ব, আদিতত্ত্ব। প্রাকৃতিক অগ্নি যে লোকেরই হোক না কেন, আসলে বিশ্বাত্মা অগ্নির প্রতীক মাত্র - পূর্ণ চৈতন্য স্বরূপ অগ্নি চিৎশক্তি রূপে আত্মা বা ব্রহ্ম। তিনি সর্বব্যাপী হলেও বিশেষ আকারে বিগ্রহে সীমাবদ্ধ হতে পারেন অথচ তাঁর আকারের কোন প্রশ্নই উঠে না। অগ্নি পূর্ণব্রহ্ম, অগ্নিই সূর্যমণ্ডল মধ্যবর্ত্তী পরমপুরুষ। পুরুষ বলতে এখানে "পূর্ণং অনেন সর্ব্বং ইতি পুরুষঃ" বলা হচ্ছে। অগ্নি সূর্যশক্তি, সূর্য এবং অদিতি। মা তো অদিতিই। পূর্বে বহুবার বলা হয়েছে অদিতিতে শক্তিমত্তার পূর্ণ প্রকাশ, তাই তাঁকে বলা হয়ে থাকে ব্রহ্মময়ী বা পূর্ণব্রহ্ম।

(ক্রমশঃ)



বারাণসীধাম

— শ্রী চিত্তরঞ্জন পাত্র

গঙ্গাতীরে প্রাচীন শহর বিশ্বনাথের ধাম;
পাপ-বিনাশিনী, শান্তিদায়িনী বারাণসী এর নাম।
মহান-বিভূতি বুদ্ধ এসেছেন, এসেছেন শংকর;
শিবের আশিসে পেয়েছেন তাঁরা ঋদ্ধি সিদ্ধি বর।
তৈলঙ্গস্বামী, বিজয় গোস্বামী, সেবার মূর্ত্ত বীর;
তাঁদের স্মরিয়া সশ্রদ্ধ চিত্তে ঝুঁকাই মোদের শির।
শ্রীরামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, আরো কতশত জন;
লভেছেন যত, দিয়েছেন তত, হননি অকিঞ্চণ।
মা আনন্দময়ী, শ্যামাচরণ, প্রণবানন্দ মহাজন;
করেছেন দান, হয়েছেন মহান, শাশ্বত অম্লান।
বারাণসী ধামে হিন্দুধর্মের মিলনতীর্থ স্থান;
ভারতভূমির গৌরব রূপে রক্ষিছে সম্মান।
হিন্দু, বৌদ্ধ, শিব, জৈন, পার্শী আর ইস্‌লাম
কাশীতীর্থে এক হয়ে, করেছে 'বিশ্ব-তীর্থ-ধাম।'



স্মৃতি চারণ
(চার)

— শ্রীমতী রেণুকা মুখার্জী

জানুয়ারী, ১৯৪৬ — কাশী আশ্রম

আবার ডায়েরীতে ফিরে যাই। ক'দিন হল পরমানন্দ স্বামীজী এক দিন সন্ধ্যা বেলায় হাত ধুচ্ছিলেন, ঝপ করে একটি টিয়া পাখী এসে পায়ের কাছে পড়ল। ছানাদি ত লাফিয়ে উঠেছে — সে রাখবেই। সত্যদার কাছ থেকে খাঁচা চেয়ে এনে তক্ষুনি পাখিটি রাখা হল। নামকরণ হল "ভক্তদাস"।

ভক্তদাস একদিন উড়ে চলে গেল। কেউ খাঁচার দরজা খুলে দিয়েছে। ক'দিনে বেশ পোষা হয়ে গিয়েছিল — সবারই একটু মন খারাপ। সন্ধ্যার সময় দেখা গেল চারিপাশে উড়ে বেড়াচ্ছে — অনেক চেষ্টা করেও ধরা গেল না।

দুজন কাশ্মীরী পণ্ডিত এসেছেন। আশ্রমে দু'একদিন থাকবেন — খুকুনীদি সেই মর্মে চিঠি দিয়েছেন। তাঁরা মায়ের দর্শনে গিয়েছেন। মা এক জনকে আগেই সূক্ষ্মে দেখেছেন। সে প্রণাম করতেই বললেন, "তোমার দাড়ি কোথায়?" সে ত অবাক। মা আরও বলছেন, "তোমার ত বেশ বলিষ্ঠ চেহারা দেখেছিলাম — এখন এমন দুর্বল কেন?" পণ্ডিত বলল যে কাশ্মীর থেকে অনেক কষ্ট করে এসেছে। পথশ্রমে শরীর খারাপ হয়েছে এবং দর্শনের জন্য আসার আগে shave করে এসেছে। পণ্ডিতরা দুদিন আশ্রমবাস করলেন।

এক এক সময়ে মনটা খুব খারাপ হয়ে যায়। ভালইত আছি। কিন্তু কাজের কাজ কিছু হচ্ছে কি? মনে পড়ে মায়ের অনুমতি নিয়ে অভয়দার সঙ্গে আমরা কয়েকজন সিদ্ধিমার দর্শনে গিয়েছিলাম। বেশ সুন্দর উজ্জ্বল চেহারা। তবে কথাবার্তা নৈরাশ্যজনক। বললেন, "এই পথে আসা সহজ নাকি। বামন হয়ে চাঁদের দিকে হাত বাড়ানো।"

আমি কি তাই করছি? সত্যিই এই বিরাটের সামান্য 'রেণুকণা'। সেই মহানের হদিশ পাওয়ার চেষ্টা কি হাস্যাস্পদ নয়? কিন্তু মা তো সহজ সরল করে দিচ্ছেন। এক এক সময় যখন জপে মন বসে যায় তখন আনন্দের স্পর্শ পাই। মার বাণীই একমাত্র সম্বল। তবে মা কাছে না থাকলে যত ভাবনা চিন্তা। মা কবে আসবেন? তার জন্য আমার নীরব আকুলতা, বুনিদির সরব আক্ষেপ, আর ক্ষমাদির কাজে কর্মে নিজেকে হারিয়ে ফেলা।

আজ খেতে বসে, স্বামীজী কথায় কথায় কি একটা প্রশংসা করেছেন। শুনে গিরীনদা সায় দিয়ে আরও প্রশংসা করলেন। আমার কিন্তু কথাগুলি ভাল লাগলনা। মানুষের কাছে ভাল হব বলে ত আসিনি। আত্মগ্লানিতে মন ভরে গেল, কিন্তু প্রতিবাদ করা যায় না - বিনয় করা হবে। আমি যে কি পর্য্যন্ত মায়ের কৃপাদৃষ্টির যোগ্য হতে পারছি তা আমিই জানি, মাই জানেন।

ফেব্রুয়ারী

মৌন ঘরে বেশি করে সময় কাটাচ্ছি — বেশ ভাল লাগছে। মাঝে মাঝে চমৎকার সুগন্ধ পাই। মা কি আসেন?

৪-২-৪৬

আজ কন্যাপীঠের বিন্দু, গঙ্গা, রমা, অঞ্জলি, কেশবদার সঙ্গে আলমোড়া থেকে এল। চোখের চিকিৎসা হবে। মেয়েরা আসাতে খুব সুন্দর কীর্তন হল।

৬-২-৪৬

আজ সরস্বতী পূজা। আমরা ফলফুল ও ভোগের আয়োজন করেছি। কেবলই মনে হচ্ছে, মা থাকলে কি আনন্দ হ'ত। বহুদিনের কথা মনে পড়ে গেল। একবার হরিদ্বারে মা ও বাবা গিয়েছিলেন। আমরা যাইনি। মা আমার মা বাবাকে বললেন, "রেণু ওরা আসেনি — ওরাও আসলে আনন্দ হত।"

গঙ্গা সরস্বতী পূজা করল। ফতেপুর থেকে আমার মার চিঠি পেলুম — বীথুর pleurisy হয়েছে এলাহাবাদের University hostel থেকে তাকে চিকিৎসার জন্য বাড়ী নিয়ে গিয়েছে। জোর করে মনকে চিন্তা শূন্য করছি। সবইত মায়ের খেয়ালেই আছে। মাই দেখবেন।

২০-২-৪৬

খুকুনীদি, বিল্লোজী এবং আরও দুজন দিল্লী থেকে এসেছেন। মা উদাস, উপেন মহারাজ ও দেবী-দত্তকে নিয়ে আপাততঃ মথুরা থেকে অজ্ঞাতবাসে গেছেন। দিদির কাছে মায়ের কথা সবাই শুনছি। হরিবাবা দোল উৎসব করবেন, মায়ের উপস্থিতিতে। এদিকে বহরমপুরের ভক্তরা বিরাট করে উৎসবের আয়োজন করেছে। দিদি তাদের কাছে যাচ্ছেন, মায়ের যাওয়ার তারিখ একটু পিছিয়ে দিতে। দিদির কর্মদক্ষতা দেখে অবাক হতে হয়। মায়ের কাজের জন্য সব সময় প্রস্তুত। এই সুদূর পথ যাবেন আর আসবেন, ভক্তদের মন রাখবার জন্য। বৃন্দাবনের উৎসবের পর হরিবাবা মার সঙ্গে বহরমপুরেও যাবেন। তাঁর ইষ্ট দেবতা শ্রী গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু। মাকে তিনি নিজ ইষ্ট রূপেই দেখেন। এইবার তিনি তীর্থযাত্রায় বেরোবেন নবদ্বীপ, বহরমপুর এবং পরে ঢাকাও যাবেন। মায়ের প্রথম জীবনের লীলাস্থল সব দর্শন করবেন। হরিবাবার সঙ্গে তাঁর গাঁয়ের লোকেরা যাবে, প্রায় ৫০ জনের মত এইসব কথাবার্তা দিদি বহরমপুরের ভক্তদের বুঝিয়ে বলবেন।

২১-২-৪৬

দিদি আজ বহরমপুর রওনা হলেন। বিল্লোজী আমাদের কাছে রইল।

মার্চ, ৪৬

মায়ের কাশীতে আসাতে চারিদিকে সাড়া পড়ে গেছে। কতদিন পরে মাকে পেয়ে আমরা যেন দিশাহারা হয়েছি। হরিবাবাও দলবল সহ এসেছেন। নিত্য সৎসঙ্গ, নিত্যরাস, নিত্য উৎসবাদিতে আশ্রম সরগরম হয়েছে। যেখানে নিঝুম চুপচাপ সেখানে এখন ভক্ত সমাগম, বাচ্চাদের কলরব ও বিরাটভাবে খাওয়া দাওয়া চলছে।

ডায়েরী লেখার আর সময় নেই। এবার স্মৃতি থেকে পূরণ করতে হবে।

মায়ের সঙ্গে যাঁরা এসেছেন এবং মায়ের কাছেও বৃন্দাবনের অনেক গল্প শুনলাম। হরিবাবা নিজের লোকেদের আহ্বান জানিয়েছেন, তারা তীর্থ ভ্রমণে তাঁর সঙ্গে যাবে বাঙ্গলা দেশে (নবদ্বীপ, শান্তিপুর, ঢাকা)। বাঙ্গলাদেশে

নাম শুনে নাকি গাঁয়ের লোকেরা ভয়ানক ভয় পেয়ে গেছে। তাদের ধারণা বাঙ্গলাদেশের মায়াবিনীরা লোকেদের ভেড়া বানিয়ে রেখে দেয় — গাঁয়ে কান্নাকাটি পড়ে গেছে। কিন্তু হরিবাবাকে — "না" করবার সাহস কারও নেই তাই সব ভয়ার্ত্তভাব সম্বরণ করে চলে এসেছে। অনেকেরই ধারণা তারা আর বাড়ী ফিরে যেতে পারবে না। অদ্ভুত গুরুভক্তি।

আমাদের দলও মন্দ নয়। বুনিদি, ক্ষমাদি, আমি, গিনি এবং আরও অনেকেই যাবার অনুমতি পেয়েছি। একদিন হঠাৎ দেখি বীথু ও আমার মা এসেছেন। বীথু কিঞ্চিৎ ভাল হওয়াতে এলাহাবাদ এসেছিল M.A. পরীক্ষা দিতে। মা কাশীতে আছেন শুনে একরকম জোর করে ডাক্তারের মতের বিরুদ্ধে (কেন না শরীর খুবই দুর্বল) আশ্রমে চলে এসেছে। মা পরীক্ষা ও অসুখের ব্যাপার শুনে বীথুকে বললেন, "আমার খেয়াল হয় না (যে তুমি পরীক্ষাতে বস।)" বীথু ভয়ানক মনঃ ক্ষুণ্ণ হয়েছে বোঝা গেল। একটু চুপ থেকে বলে ফেলল, "আমি যদি পরীক্ষা দিতে না পারি ত এখন বাড়ী যাব না, তোমার সঙ্গে যাব।" মা স্থির নেত্রে বীথুর দিকে অনেকক্ষণ চেয়ে রইলেন, তারপর বললেন, "যদি তুমি ডাক্তারের কথা মত সব নিয়ম পালন কর আর ঠিকমত খাওয়া দাওয়া ও বিশ্রাম কর তবে নিতে পারি।"

বীথুকে কাশীতে দেখা শোনা করার ভার আমারই হওয়া উচিৎ ছিল, কিন্তু কার্য্যত আমি কিছুই করে উঠতে পারতাম না। সবটা সময় মায়ের কাজেই চলে যেত। দিদির সাহায্যই প্রধান কাজ। তবে বীথুর কোনও অসুবিধা হয়নি। ক্ষমাদি খেয়াল রাখত।

আমরা বিরাট party বহরমপুর রওনা হলাম। বহরমপুরে এক অদ্ভুতভক্ত সমাগম। বাঙ্গালীরা এক অক্ষরও হিন্দী বোঝে না - তাও আবার গাঁয়ের ভাষা। খাওয়া দাওয়ার কোনও মিল নেই। সেবক এবং volunteer বৃন্দ একেবারে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়। কিন্তু তাও কিছুমাত্র বেমিছিল হয়নি। তারা ডজনে ডজনে মশারী এনে উপস্থিত করল। হরিবাবার গ্রুপের দেখাশোনাতে যাতে কোনও ত্রুটি না হয় সর্বদা সেই প্রচেষ্টা। একটি জায়গায় এসে সমস্ত প্রাদেশিক ব্যবহারিক ও ভাষাগত ভিন্নতা দূর হয়ে অদ্ভুত আনন্দ উল্লাসের অফুরন্ত উৎস দেখা গেল - সেটি হল 'হরিনাম সংকীর্ত্তন।' হরিবাবার দলে অনেক সুগায়কও ছিলেন। প্রেমরাজ বাঙ্গলাদেশীয় কীর্ত্তনের সুর কি সুন্দর আয়ত্ত করে নিল। মনোহর (হরিবাবার প্রিয় শিষ্য) তো ভাল গাইতই, এখন আরও যেন তার গান করার ক্ষমতা জাগ্রত হয়ে গেল।

এদিকে বাঙ্গালীরা হরিবাবার ঘন্টা বাজিয়ে অতি পরিশ্রমযুক্ত সান্ধ্য কীর্ত্তনে যোগদান করে অভিনব আনন্দ পেল। শ্রী হনুমান চালীসার গানের সময় তিল ধারণের জায়গা থাকত না। সবাই অবাক বিস্ময়ে এই উদাসীন সন্ন্যাসীর অকৃত্রিম নিষ্ঠা ও ভগবৎ প্রেম দেখে স্তব্ধ হতেন। মায়ের বাণী "হরি কথাই কথা আর সব বৃথা ব্যথা" হরিবাবা মহারাজ নিজের জীবনে সার্থক করেছিলেন।

এই সব নানারকম হট্টগোলের মধ্যে মায়ের শান্ত, ধীর, উজ্জ্বল চেহারা ও মন মাতানো হাসিটুকু দেখে সবাই ধন্য।

নবদ্বীপে হরিবাবা সব মন্দির দর্শন করলেন। সব মন্দিরেই মাকে ইষ্টদেবের আগমনের মত যথোচিত সৎকার পূজারীরা করেন। হরিবাবা পদব্রজে কীর্তন party সঙ্গে নিয়ে মন্দির দর্শনে বেরোতেন। একবার একটি

ঘোড়াগাড়ীতে মা ও দিদির ব্যবস্থা হয়েছে। বীথুকে ধর্মশালার দরজায় দাঁড়ানো দেখে মা ইশারায় কাছে ডাকলেন ও গাড়ীতে উঠে আসতে বললেন। গাড়ী ছোট, দিদি ও মায়ের মধ্যে জায়গা নেই। মা বল্লেন, "কোলে বস"। সেই যাত্রায় মা বীথুকে কোলে বসিয়ে সঙ্গে নিলেন। একটু পরে দিদি নিজের কোলে বসিয়ে নিয়েছিলেন। হরিবাবা আগে আগে যেতেন। মায়ের গাড়ী কাছাকাছি এলেই পিছু ফিরে হাটতেন। মার দিকে পিঠ দিয়ে হাঁটবেন না। কীর্ত্তন করতে করতে সঙ্গে সঙ্গে নিয়ে মহা উৎসাহে চলেছেন ইষ্টদেবের নানা মন্দির দেখতে এবং যাঁর মন্দির তিনি নিজেকে নিজে দর্শন করবার জন্য সঙ্গেই আছেন। মহানন্দে তীর্থ পথ পর্য্যটন।

আমরা কলকাতা এলাম। এবার নানা জায়গায় থাকবার ব্যবস্থা হল। একেবারে অন্য পরিবেশ। বিরাট শহরের কোলাহল, ভক্তদের বেমিছিল মায়ের সন্নিধি প্রাপ্তির চেষ্টা - একটা যেন chaos এর মধ্যে এসে পড়লাম। তারই মধ্যে একদিন মা বললেন, "বীথুর শরীর ভাল না - এইভাবে আমার সঙ্গে ঘুরলে ঠিক হবে না। বীথু বাবার কাছে ফতেপুরে ফিরে যাক। আমি তো বাঙ্গলাদেশের পর সোলন যাব - সেখানে আসবে। সেখানে ঠাণ্ডা ও নিরিবিলি - শরীর সুস্থ হবে।" আমরা মার নির্দ্দেশমত করব বললাম। মাই আমাদের কাছে প্রশ্নোত্তর করে জেনে নিলেন যে আমাদের মামাবাবু ভবানীপুরে থাকেন। তাঁর সঙ্গে বীথু ফতেপুর যাবে ঠিক হল। মামাবাবু (শ্রী আশুতোষ চট্টোপাধ্যায়) বিপত্নীক - তেমন যোগাযোগ রাখেন না। মা না বলে দিলে আমাদের মাথায় মামাবাবুর কথাটা আসতই না। যা হোক এখন খবর পেয়ে মামাবাবু বেশ উৎসাহিত হলেন। অনেক দিন পরে ছোট বোনের সঙ্গে দেখা হবে। তিনি রাজি হয়ে গেলেন।

বীথুকে দিদি (সিধুদি) ও জামাইবাবু নিজেদের বাড়ী নিয়ে গেলেন — সেখানে কয়েকদিন বিশ্রাম করে মামাবাবুর সঙ্গে ফতেপুরে চলে যাবে।

গত শিবরাত্রিতে মা কোলকাতায় ছিলেন। তখন নাকি দিদি (সিধুদি) প্রার্থনা করেছিল একটি সন্তানের জন্য। এই বছরের শিবরাত্রির দিন তার জ্যেষ্ঠ পুত্র সন্তান প্রভাতের জন্ম। আমার আর দিদির বাড়ী গিয়ে বাচ্চা দেখবার সুযোগ হল না, আমরা দলবল সহ মায়ের সঙ্গে ঢাকা রওনা হলাম।

(ক্রমশঃ)



অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে জানাই যে প্রবন্ধ-লেখিকা শ্রীমতী রেণুকা মুখার্জী হঠাৎ ৩০ শে মে এলাহাবাদে দেহরক্ষা করেছেন। 'স্মৃতিচারণের' প্রকাশন যাতে বন্ধ না হয় তার প্রচেষ্টা করা হবে।

— সম্পাদক

সংযম সপ্তাহ মহাব্রত প্রসঙ্গে

(সাত)

—ব্রহ্মচারিণী গীতা ব্যানার্জী

শ্রীরাম পঞ্জবওয়ানীজীর আমন্ত্রণে ত্রয়োবিংশতম সংযম সপ্তাহ মহাব্রত স্বামী ব্রহ্মানন্দজীর আশ্রমে কনখলে সুরতগিরি বাংলাতে অনুষ্ঠিত হয়।

স্বামী গিরীশানন্দ এই আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা, তাই এই আশ্রমটিকে "গিরীশানন্দ আশ্রম"ও বলা হয়। তারও বহু পূর্বে সুরতগিরি নামে কোনো মহাত্মার এখানে একটি কুটির ছিল। তখন ইংরেজদের রাজত্ব। তারা এই কুটিরকে 'বাংলা' বলতো। সেই হতে এই আশ্রমের নাম 'সুরতগিরি বাংলা' হয়েছে।

কনখলের অর্থ হল "কঃ ন খলঃ তরিষ্যতি" অর্থাৎ এমন কোন 'খল' - দুষ্ট ব্যক্তি আছে যার উদ্ধার এখানে হতে পারে না ? অর্থাৎ সকলেরই এখানে উদ্ধার হবে।

সুরতগিরি বাংলাতে অপূর্ব সংযম সপ্তাহ অনুষ্ঠিত হয়। হলঘরটিকে খুব সুন্দর করে সাজানো হয়েছিল। ধ্যানের সময় হলের সমস্ত দরজা বন্ধ করে দেওয়া হয়। এর অর্থ কেঁউ কেউ করে থাকেন আমাদের সমস্ত বহিরিন্দ্রিয়ের দ্বার বন্ধ করা। যেমন চক্ষু, শ্রোত্র, নাসিকা, রসনারূপী বহিরিন্দ্রিয়ের দ্বার রুদ্ধ করা। অর্থাৎ বাইরের কোলাহলে যাতে চিত্ত উদ্বিগ্ন না হয়;তার জন্য হলের চারটি দরজা বন্ধ করা হয়; তেমনই চক্ষু, শ্রোত্র, নাসিকা, রসনা রূপী বহির্দ্বার বন্ধ করে অন্তর্নিহিত তত্ত্বকে অনুসন্ধান করা। যেমন সমস্ত বৈদ্যুতিক বাতি নির্বাপিত করা হয়, তেমনই বহির্জগতের বিষয়ের দ্বারা দূষিত মনকে সেই দিক হতে অপসৃত করে অমৃতলোকের সন্ধানে প্রকাশিত করা। বেদির মধ্যভাগে দীপ প্রজ্জ্বলিত করা হয় ধ্যানের সময়, এর অর্থ হতে পারে যেমন, নির্বাত দীপ শিখা স্থির থাকে, তেমন বহির্জগতের বিষয়রূপী বায়ু হতে দূরে অবস্থান করে স্থির দীপশিখার মত চিত্তকে স্থির করা।

মহাত্মাদের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণানন্দ অবধূতজী, মহামণ্ডলেশ্বর শ্রী গণেশানন্দজী, ম.ম. শ্রী বিদ্যানন্দজী, ম.ম. শ্রী ভজনানন্দজী, ম.ম. শ্রী পূর্ণানন্দজী, স্বামী অখণ্ডানন্দজী, স্বামী চিদানন্দজী, স্বামী সদানন্দজী, শ্রী বিষ্ণুআশ্রমজী, ম.ম. শ্রী গোবিন্দপ্রকাশ জী, শ্রী ধর্মানন্দজী, শ্রী আনন্দস্বামী জী, শ্রী চক্রপাণিজী প্রভৃতি মহাত্মারা প্রত্যেকেই স্বীয় প্রজ্ঞালোকে সকলকে আলোকিত করেন। সৎসঙ্গের পরিচালনা করেন ব্রহ্মচারী নির্মলানন্দজী।

একদিন দিব্যজীবন সংঘের স্বামী কৃষ্ণানন্দজী এসে ইংরাজীতে ভাষণ দেন। কলকাতা হতে ডঃ রমা চৌধুরী বাংলাতে ভাষণ দেন। শ্রদ্ধেয় শ্রী ওঁকারনাথ ঠাকুরও আসেন একদিন।

সংযমের অন্তিম দিন রাত্রিতে শ্রী যোগেশ ব্রহ্মচারীজী মাকে বলেন, "মা, আজ বৈকুণ্ঠ চতুর্দশী। আজ দীপ জ্বালাতে হয় এবং হরিনাম কীর্তন করতে হয়।" তখনই মাতৃনির্দেশে দুইটি থালাতে মোমবাতি জ্বালানো হল। ব্রহ্মচারীজী আরতি করলেন। (সেই হতে প্রতি সংযমে শেষের দিন মোম বাতি জ্বালানো হয়।)

মহানিশার ধ্যানের পর মার হাতে ফলগ্রহণ, পরদিন হোমের পর ব্রত সমাপন। ১৯৭২ সনে ১১ই হতে ১৮ই নভেম্বর এই সংযম সপ্তাহ হয়।

*　　*　　*

চতুর্বিংশতম সংযম সপ্তাহ বৃন্দাবনে অনুষ্ঠিত হয়। গোণ্ডালের রানী লক্ষ্মীদেবীর আমন্ত্রণে এই সংযম সপ্তাহের অনুষ্ঠান।

বৃন্দাবনে এইরূপে ৬বার সংযম সপ্তাহ অনুষ্ঠিত হয়। যথা পঞ্চদশতম, সপ্তদশতম, অষ্টাদশতম, বিংশতম, দ্বাবিংশতম আর চতুর্বিংশতম সংযম সপ্তাহ এখানেই অনুষ্ঠিত হয় মাতৃ সান্নিধ্যে। এই রূপে সংযম সপ্তাহের ইতিহাসে বৃন্দাবনের একটি বিশিষ্ট স্থান থাকবে।

শ্রী অবধূতজী প্রথম হতে প্রতিটি সংযম সপ্তাহে যোগদান করেছেন। ২৩টি সংযম সপ্তাহ তাঁর উপস্থিতিতেই অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই প্রথম তাঁর সংযমে অনুপস্থিতি। কয়েক মাস পূর্বে এই বৃন্দাবন আশ্রমেই তাঁর মহাপ্রয়াণ হয়েছে।

মা একদিন সৎসঙ্গে 'ধ্যান' ও 'জপে'র অর্থ করলেন। ধ্যান অর্থাৎ 'ধরো' ও 'নেও'। অর্থাৎ এই দুঃখময় সংসার সাগর হতে যদি পারে যেতে চাও, তবে তাঁর চরণরূপী নৌকোকে ধর। তাতে তুমি কি পাবে? কি তুমি নেবে? পাবে পরম শান্তি, পরম আনন্দ আর নেবে চির শান্তিময় মায়ের ক্রোড়। আর মা জপের অর্থ করলেন 'যা পাও' অর্থাৎ যা তুমি করবে তেমন তুমি পাবে। "যেমন ভাব তেমন লাভ" মা সর্বদা বলে থাকেন।

এবারে আমেরিকান সাধু স্বামী নির্মলানন্দজী ১০ জন সাধু সহ সংযমে আসেন। তিনি একদিন ইংরাজীতে ভাষণ দেন।

মা একদিন সকলের কাছে ভগবানের জন্য নাম-ভিক্ষা, সময়-ভিক্ষা চাইলেন। বললেন, "তোমরা প্রার্থনা করবে ভগবান আমি তোমার। তুমি আমার সর্বস্ব। কৃপাবর্ষণ কর আমার উপর। তোমার দিকে যাত্রার পথ তুমি আমায় দেখাও।"

১৯৭৩ সনে, ৩রা হতে ১০ই নভেম্বর এই সংযম সপ্তাহ অনুষ্ঠিত হয়।

*　　*　　*

সংযম সপ্তাহ মহাব্রতের রজত রজন্তী মহোৎসব অর্থাৎ পঞ্চবিংশতম সংযম ভারতের পবিত্র উত্তরাখণ্ডে দেরাদুনে রামতীর্থ মিশনে ম.ম. স্বামী গোবিন্দপ্রকাশজীর আমন্ত্রণে ২২ শে নভেম্বর হতে ২৮ শে নভেম্বর ১৯৭৪ সনে অনুষ্ঠিত হয়।

সংযম প্রারম্ভ হওয়ার আগের দিন অপরাহ্নে তিনটার সময় মাতৃ নির্দেশে মণ্ডপে ব্রতীদের আসন পাতার নিয়ম। ব্রতীরা সকলে নিজেদের নির্দিষ্ট স্থানে আসন পেতে আসেন। ৭ দিনের মধ্যে সেই স্থান আর পরিবর্তন করা হয় না।

এবারে রজত জয়ন্তীতে অনেক নতুন সাধু এলেন। যেমন দেরাদুন শাহানশা আশ্রমের অধ্যক্ষ গোবিন্দানন্দজী, প্রয়াগের যোগীরাজ নানকচাঁদজী, মহা মণ্ডলেশ্বর চন্দ্রশেখরজী, হরিদ্বারের পাবন আশ্রমের স্বামী বেদান্তানন্দজী, গীতা ভবনের সম্পাদক হংসরাজজী প্রভৃতি। স্বামী গিরিধরনারায়ণ পুরীজী (নির্ব্বাণী আখাড়ার মহন্ত) ও এলেন

মা বললেন, "মহাত্মারা এই শরীরটাকে ভিক্ষা দিয়েছে তাঁদের অমূল্য ভাষণ দিয়ে। ব্রতীরা এই শরীরটাকে ভিক্ষা দিয়েছে এই সংযম ব্রত গ্রহণ করে। সংযম খুব ভাল হয়েছে।"

মুসৌরীর রাস্তার ধারে পাহাড়ের কোলে অবস্থিত অপূর্ব প্রাকৃতিক শোভায় মণ্ডিত এই রামতীর্থ মিশনে সংযম সপ্তাহ মহাব্রত খুবই সুন্দরভাবে অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

* * *

কানপুরে স্বদেশী হাউসে ষড়বিংশতম সংযম সপ্তাহ মহাব্রত অনুষ্ঠিত হয়। উত্তরপ্রদেশের রাজ্যপাল ডঃ চেন্না রেড্ডী এই সংযম সপ্তাহে যোগদান করেন।

একদিন মা সৎসঙ্গে বলেন, "এখানে (অর্থাৎ সংযমে) যারা সব বসে আছে, তারা বৈকুণ্ঠে বাস করছে। এরা সবাই ডাণ্ডিতে বসে আছে। যতই বাধা বিঘ্ন আসুক, এরা পার হবেই, যদি শুধু গুরুর আদেশ এরা পালন করে, তবেই।" ১০ ই নভেম্বর হতে ১৭ ই নভেম্বর, ১৯৭৪, এই সংযম হয়।

* * *

গোণ্ডালে সপ্তবিংশতম সংযম সপ্তাহ মহাব্রত অনুষ্ঠিত হয়। রাণী লক্ষ্মীদেবী সংযোজিকা।

এবার ব্রতীদের সংখ্যা অনেক ছিল। প্রথম শ্রেণীতে ১০০ এবং দ্বিতীয় শ্রেণীতে ৪০০ এই রূপে ৫০০ ব্রতী হন। মহাত্মাদের মধ্যে সকলেই প্রায় আসেন। স্বামী চিদানন্দজীও আসেন। সাধুদের মধ্যে একজন নতুন সাধু যোগীরাজ আর সন্ন্যাসিনী উমা ভারতীও মাতৃচরণে আসেন।

মা মহারাণীকে বলেন, গঙ্গা জল পানে শরীর সুস্থ হয়। গোণ্ডালে ৩০ শে অক্টোবর হতে ৬ই নভেম্বর, ১৯৭৬ সংযম সপ্তাহ অনুষ্ঠিত হয়।

(ক্রমশঃ)

*

আনন্দময়ী স্মৃতি

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

— কুমারী চিত্রা ঘোষ

৩টের সময় মন্দিরের ঘন্টা শুনে উঠবো উঠবো করছি, কিন্তু তন্দ্রাভাবে গঙ্গা, বিন্দুদি ও পুষ্পের ওঠার কিছু পরে আমি উঠলাম। ইতিমধ্যে সারারাত ছাদে ছেলেদের মধ্যে একজন যোগাভ্যাস করছিল ও আর একজন নাম সংকীর্তন করছিল। আমি যখন উঠলাম, তখনও আকাশে চাঁদ — মা আমাদের দিকে পাশ ফিরে মাথার উপর হাত দিয়ে শুয়ে আছেন।

আমি উঠে নাম করতে লাগলাম, কিন্তু এত বেশি মশা কামড়াচ্ছিল যে মাঝে মাঝে হাত নাড়তে হচ্ছিল। একবার মনে হল যে, ছিঃ, মা যদি বোঝেন যে চিত্রা এত অস্থির তা হলে কী ভাববেন। অমনি মনকে সান্ত্বনা দিলাম যে মা তো দেখছি ঘুমোচ্ছেন, নিশ্চয় বুঝতে পারেননি। সত্যি কী বোকা আমি!

কিছুক্ষণ বাদে আমি বারান্দায় গিয়ে দেখি যে পুষ্প ও গঙ্গা খুব সুন্দর কীর্তন করছে। কীর্তনের পর আমরা স্নান করলাম — তখন ৪টা। তারপর ফিরে এসে দেখি যে মা তখনও শোওয়া। আমি মার খাটের কাছে কিছুক্ষণ বসে একবার ভিতরে গেলাম। আবার ফিরে এসে দেখি যে মা এবার উঠে বসেছেন। আমি পায়ের কাছে প্রণাম করে উঠতেই বললেন, "স্নান করেছিস্? ভোরে এখানে বসেছিলি না?"

তারপর মা শয্যাত্যাগ করে আস্তে আস্তে নেমে অস্তগামী চাঁদের দিকে মিষ্টি করে তাকিয়ে হাত দুটো মুঠ করে দাঁড়ালেন। এবার ছাদে নিঃস্তব্ধভাবে পায়চারী করতে লাগলেন। চুলগুলি পিঠ ছাপিয়ে পড়েছে। বুনিদির মাকে প্রণাম করে চলে গেল। মা তারপর ঘরে গিয়ে শুলেন। দিদি বললেন যে মা বিশ্রাম করছেন। এখন দুঘন্টা এইভাবে শরীরটা পড়ে থাকবে — ঘুমোন না।

বহু বৈষ্ণবী 'মা'র দর্শনপ্রার্থী। তারা এসে ফিরে যাচ্ছে দেখে আমি আস্তে করে দরজা ফাঁক করে ওদের দেখতে দিলাম। মা পাশ ফিরে শুয়ে আছেন। চুল খোলা। মুখের উপর হাত পড়ে আছে। দেখলে ঠিক মনে হয় যেন ঘুমোচ্ছেন। এমন সময় তো মার মুখটুকু ছাড়া কিছুই দেখা যায় না, এখন স্পষ্ট দেখলাম হাত দুটি সকালের কেমন যেন কালো দেখাচ্ছে। অথচ অন্য সময় তো দেখেছি রং ধবধবে ফরসা। চোখের ভুলও হতে পারে — জানি না।

খানিকক্ষণ পরে দিদির সঙ্গে ঘরে বসে কথা বলছি ও দিদিকে হাওয়া করছি। হঠাৎ দেখি মা চুড়ো বেঁধে এসে দোর গোড়ায় দাঁড়িয়েছেন — বললেন, "দিদি তোকে ডাকলাম। তুই শুনতে পাস নাই।" দিদি তাড়াতাড়ি উঠে পড়তেই মা এসে ধপ করে আমাদের তক্তপোষের উপর বসে পড়লেন। একটা আসন পাতবারও অবকাশ দিলেন না।

নীচ থেকে কয়েকজন ছেলে এসে গীতা পাঠ করবে বলাতে মা বললেন যে — আমি এই ঘরে বসে শুনি জানালাটা খুলে দাও ওরা দেখতেও পারবে।

দিদি মাকে মিশ্রির জল ও আপেল খাওয়াবেন বলে দরজা বন্ধ করলেন। আমরা গীতা পাঠ আরম্ভ করলাম। আমি তো সুর করে গীতাপাঠ কখনও করিনি তাই শুনে শুনে গুনগুন করতে লাগলাম। গঙ্গা মার ঘর থেকে বেরিয়ে এসে যোগ দিতে আমার খুব সুবিধে হলো। ষষ্ঠ অধ্যায় থেকে অষ্টম অধ্যায় অবধি পৌঁছাতেই হঠাৎ দেখি মা বেরিয়ে এসে আমি ও গঙ্গা যে তক্তপোষে ঠেসান দিয়ে বসেছিলাম তাতে এসে বসলেন। তাড়াতাড়ি বিছানার চাদর পেতে দিলেন স্বামীজী। মা তাঁর ছোট্ট বালিশের উপর হেলান দিয়ে আমাদের দিকে মুখ করে শুলেন।

তাকিয়ে দেখি মা যেন কোন এক ভাব রাজ্যে বিরাজ করছেন। অষ্টম অধ্যায়ের শেষেই বললেন গঙ্গাকে, "একটা ভজন করে শেষ কর তাড়াতাড়ি — নীচে কীর্তন করবে।" গঙ্গার গান শেষ হতেই তরতরিয়ে পায়ে চটি জুতো কিছু না দিয়ে নীচের নাট মন্দিরে গিয়ে বসলেন। গঙ্গা ও দিদি "বাবা"দের খাবার তৈরী নিয়ে ব্যস্ত, তাই আমি নীচে গেলাম।

মাকে টানা পাখা দিয়ে পাখা করতে — মা বারণ করলেন। ঠাকুরের সামনে এটুকু সেবাও নিলেন না। তবে আরতির সময় যখন ঠাকুরকেও পাখা করা হচ্ছিল, তখন কোন আপত্তি করলেন না।

বিভুদা কীর্তন আরম্ভ করল। "দীনবন্ধু দীনদয়াল" ইত্যাদি — হঠাৎ মা আখর দিতে আরম্ভ করলেন। "জগন্নাথ জগবন্ধু" "দীননাথ - দীনবন্ধু" "গোবিন্দ গোপাল" "গোপাল গোপাল" "গোবিন্দ গোবিন্দ গোবিন্দ গোবিন্দ" ঘুরিয়ে ফিরিয়ে নানা সুরে মার যে কী ভাবাবেশে গান সেদিন শুনলাম তা বলা যায় না। গানের মধ্যে রাখাল এসে গোবিন্দজীর মালা — শিউলী ফুলের ছলহর ও মাঝে পদ্ম দেওয়া — মাকে পরিয়ে গিয়েছিল। মা গানের শেষে মালাটি খুলে ফেললেন। আমাদের ইসারা করতে আমি এগিয়ে যেতে মা আমাকে সেই মালা পরিয়ে দিলেন। আমি এত ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গিয়েছিলাম যে মালা পরে হতভম্বর মত বসে পড়লাম। মা বললেন, "প্রসাদী মালা, ঠাকুরকে প্রণাম করে আয়।" আমি তখন আমার "সচল বিগ্রহ" (মাকে) প্রণাম করলাম। আরতি আরম্ভ হল।

এবার একজন বড় বৈষ্ণব এসে মাকে প্রণাম করলেন। তিনি মাকে প্রশ্ন করলেন, "মা আমার ইষ্টদেব শিব। তা তুমি তো বল সবই এক, কিন্তু আমি তো ধ্যানে বসে শত চেষ্টা করেও অন্য মূর্ত্তির ধারনা করতে পারি না।" মা বললেন, "বাবা, তুমি একজনের পিতা, অন্যের পতি, আবার অন্যের পুত্র — তিন হয়েও তুমি তুমিই — সেরকম তিন ও এক। এই ছোট মেয়েটাকে তো লেখাপড়া শেখাও নাই। খালি প্রথমভাগটা একটু আধটু পড়াইছ। তবে ছোট মেয়েটাকে দিদি মহাভারত শুনাইছে — সেখানে বলে যে যিনি কৃষ্ণ তিনিই কালী - বাবা - তুমিই শিব!" বলে মা আবার খিলখিলিয়ে হেসে উঠলেন। মা বললেন, "ছোট মেয়েটা কখনও মিথ্যা কথা বলে না। ঠাকুরের সামনে বসে এ শরীর বলছে যে সবই এক।" —

পৌনে এগারোটা বাজছে দেখে আমি উঠে ঠাকুর প্রণাম করে উপরে এসে রওনা দেবার জন্য প্রস্তুত হতেই দেখি মা উপরে এলেন।

দিদি অবধূতজীকে খাইয়ে ফিরে এসেছেন। মাকে অবধূতজীর মেজাজের গল্প করছেন। মা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে

সব শুনলেন। অবধূতজী নাকি খাবার সময় জল দেখে রাগ করে জল সরিয়ে দিয়ে ডাব খেতে চেয়েছেন। দিদি বেচারী রান্নাবান্না করে এত যত্ন করে নিজে তদারক করতে গিয়ে মেজাজ দেখে খুব দুঃখ পেয়ে মাকে সব জানাতে লাগলেন। মা কিন্তু ন্যায় অন্যায় কোন যুক্তি না করে — তারপর, — কী হলো — বল — ইত্যাদি বলে গম্ভীর ভাবে সব শুনতে লাগলেন। আমাদের দেরী হয়ে যাচ্ছে দেখে মাকে প্রণাম করে বেরিয়ে এলাম। আমার মনটা একটু খুঁতখুঁত করছিল যে মা কিছু বললেন না যাবার আগে — ভাবতে না ভাবতেই — মা একগাল হেসে দরজা দিয়ে মুখ বার করে — "তোরা যাচ্ছিস, আচ্ছা আয়।"

রবিবার ৫ই অক্টোবর ১টার গাড়ীতে কলকাতাভিমুখে রওনা হলাম। Ladies Inter class এ আমি একলাই এলাম। নদীয়ার কথার এখানেই ইতি।

জয় মা।

(ক্রমশঃ)



পথিক

— ডাঃ চিত্ততোষ চক্রবর্তী

অজানা এক পথের আমি
পথিক হয়েছি।
চিনব বলে অচেনা পথ
পথে নেমেছি।।
(ভাবি) নাইবা হল পথকে চেনা
নাইবা হল পরম পাওয়া
প্রাণের মাঝে মায়ের স্মৃতি
(সেটাই) অনেক পেয়েছি।।
পথে নেমে চলতে গিয়ে
(পথ) খুঁজে পেয়েছি
পরম গুরুর অসীম কৃপায়
(আলোর) দেখা পেয়েছি।।
মার কৃপাতেই মাকে আমি
কাছে পেয়েছি
বুকের মাঝে তাইতো তাঁকে
ধরে রেখেছি।।

মা আনন্দময়ী

— মৃদুলা ভট্টাচার্য্য

তুমি মা আনন্দময়ী আনন্দলোক হতে
আসিয়াছ ধরা তলে, শ্যাম বিরহেতে
রাধা সাজি সাধিতে যে কঠিন সাধনা,
লভিতে আপন ইষ্ট কৃষ্ণ ঘনশ্যামে।
কত জপ, কত তপ, দিবানিশি ধরি,
সঁপিলে যজ্ঞাহুতি চিত্তশুদ্ধি করি।
একাসনে নিরালায় একাগ্র মনেতে
আপনার স্থান লভো গোবিন্দের বামে।।
তুমি রাধা, রাধারানী জগতে বিদিত
বালকৃষ্ণ রূপে ভক্ত জনে যে পূজিত।
মাতা হয়ে আশীর্ব্বাদ দাও সর্বজনে।
তোমার কৃপার ধারায় প্লাবিত ভুবন।
সন্তানের স্নেহময়ী তুমি মা জননী
তুমি ছাড়া কেহ নাহি, শুধু তোমা জানি।
আপদ বিপদে পড়ি সংসার যাতনায়
তোমায় স্মরণ করি, পূজি হে চরণ।
শরণাগতেরে তুমি রক্ষা করো সদা,
তোমার মঙ্গল হস্ত তার শিরে বাঁধা,
মা বলিয়া কেহ যদি করুণ কাতরে
কাঁদে, মাগো, দাও সাড়া সেই অভাজনে।
সাধিকা, যোগিনী তুমি, মহা তপস্বিনী,
ভক্ত কল্পতরু ভবে, তুমি মা কল্যাণী।
খালি হাতে নাহি ফেরে তব দ্বার হতে,
ভক্তজনে করো তৃপ্ত অকৃপণ দানে।।

মনের মন্দিরে তাই তোমার প্রতিমা
ইষ্টরূপে পূজে তুষ্ট হে আনন্দময়ী মা।
জানি তুমি দেখাইবে আঁধারেতে আলো
জীবনের সন্ধ্যা যখন আসিবে নিশ্চয়।
মাতা ছাড়া গতি নাহি জীবন মরণে,
সন্তানের ভালোমন্দ মাতা-ই তো জানে;
এইআশে বসে আছি ওগো মা জননী,
তুমি যে আসল মা, আছে এ প্রত্যয়।।
মা নাম মহামন্ত্র লবো সাথে করে
মম হাত বাঁধা রবে তব স্নেহ ডোরে।
মৃদু মৃদু ঐ তব মুখোজ্জ্বল হাসি —
হেরিয়া নয়ন যুগল হইবে সফল।
আনন্দলোক হ'তে স্রোত আনন্দ বন্যায়
বহে যাবে ধরণীতে পবিত্র ধারায়।
সকলে সিনান করি সকল তীর্থের
লভিবে অমৃতসম মহা পুণ্যফল।।
তোমার চরণপদ্মে থাকে যেন মতি,
তুমি গুরু, তুমি ইষ্ট, অগতির গতি।
তোমার করুণাসিন্ধু হ'তে বিন্দুবারি
দয়া করে দিও মাগো ওগো দয়াময়ী।
অপরাধ বোঝা, আর চাহিনা বাড়াতে,
ভবনদী পার হই যেন ভালোমতে।
ভক্তি প্রদায়িনী মাতা, মুক্তি গো দায়িনী
শতকোটি প্রণাম লহো, হেমা চিন্ময়ী।।



নামযজ্ঞ ও শ্রীশ্রীমা

(পুর্ব্বানুবৃত্তি)

— শ্রীমতী সরমা মুখার্জ্জী

কানপুর

সংযম সপ্তাহে হরিদ্বার যাওয়া হল। সেখানে "মা" বারবার আমাকে আগামী ডিসেম্বরে কানপুর যেতে বললেন। সেখানে ভাগবৎ সপ্তাহ হবে — তারপর নামযজ্ঞ। সংসারী মানুষের অনেক ঝামেলা - সংযমে এসেছি, আবার কদিন পর কানপুর যাওয়া! বাড়ীতেও একবার বলা দরকার। "মা" বলছেন। আর আমি মানা করছি। "মাইয়া আমার" ঘরোয়া "মায়ের"মত গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে বলতে লাগলেন - "যেতেই হবে।" এত কৃপা - কল্পনাও করা যায় না। সকল চিন্তা গেল। 'যাবো' বলে দিলাম।

কানপুরে ভোরবেলা পৌঁছেছি। কুলিদের থাকবার মত বিরাট একটা ব্যারাকের মত ছোট ছোট অনেকগুলি ঘর একেবারে নতুন। খানিকটা গিয়ে নীচে সিমেন্ট দেওয়া অনেকগুলি সারি সারি জলের কল। আরও খানিকটা দূরে পাশাপাশি অনেক পায়খানা। আমার মা সঙ্গে ছিল। ঘরগুলিতে খড় বিছানো মোটা করে। আমরা একটা ঘরে জিনিষগুলি রাখলাম। দিল্লী party এসেছে। বীরেনদা হাসিমুখে দেখতে এসেছে। ঘর দেখে রেগে গেল - বলল, "জিনিষ খুলিস না। দেখি কি করতে পারি।" খানিক পরেই ফিরে এসে বললো, "চল ঘর ঠিক করে এসেছি। এখানে মেয়েরা থাকতে পারে? ছেলেরা এখানে থাকবে। কাছেই দুটি পাশাপাশি চমৎকার বাড়ী — একটা ঘরে আমি, মা, ঘোষালদি আর একজন থাকলাম। অন্য ঘরে কলকাতা দিল্লীবাসীরা মিশিয়ে রইল।

আমি স্নান করে দেখতে গেলাম। কাছেই মূল বাড়িটি - বিশাল জায়গা। সেখানে "মা" ছেলে মেয়েদের নিয়ে থাকেন। আরও অনেকে সেখানে আছেন। রান্না খাওয়া সবই সেখানে। এগিয়ে চলেছি - দেখি বিরাট সভামন্ডপ, যেখানে ভাগবৎ পাঠ হচ্ছে। আরও এগিয়ে গিয়ে সিংহানিয়ার বিশাল মন্দির। তাল তাল সোনা দিয়ে নানা দেবদেবীর মূর্ত্তি, বাকী সবই রূপোর। সামনে মস্ত বারান্দা - মজবুত গ্রিল দিয়ে ঘেরা! অনেক রক্ষী সেখানে। এই সব দেখে ফিরে আসছি — দেখি, সামনে জ্বলজ্বলে মূর্ত্তি "মা"। প্রসন্ন হাসি নিয়ে কয়েকটি আশ্রমের মেয়ের সঙ্গে আসছেন। আমি শ্রীচরণে লুটিয়ে পড়লুম। "মায়ের" কী আনন্দ! "এসে গেছে সবাই?" এই বলে আমার একটা হাত চেপে ধরে আমাকে নিয়ে চললেন। খানিকটা গিয়ে একটি ছোট তাঁবু। একটু রাস্তা ছেড়ে একটি মস্ত তাঁবু। "মা" আমাকে সেখানে নিয়ে গিয়ে দেখালেন — "এখানে নামযজ্ঞ হবে।" তারপর ছোট তাঁবুতে নিয়ে গেলেন — হাতটি কিন্তু ধরা। সেখানে একটা সুন্দর খাট পাতা আছে। "মা" বললেন, এখানে আমি থাকবো। পর্দা তোলা থাকবে। আমি এখান থেকে নাম শুনবো আর দেখব। দেখবার মত "মায়ের" সেই আনন্দ স্ফুর্তি। "মা" যেন কি করবেন ভেবে পাচ্ছেন না। আমার যেমন আনন্দ হচ্ছে, তেমনই লজ্জা করছে "মায়ের" কাণ্ড দেখে। এমনিতেই শ্রীমায়ের কাছে পৌঁছাতে পারলেই শুধু আনন্দ আর আনন্দ! "তিনি" যে জনসাধারণকে আনন্দ

দিতেই এসেছেন!

যেদিন অধিবাস হল, সন্ধ্যার পর "মা" এসে বসলেন। বীরেনদা "মাকে" চন্দন দিয়ে, সুন্দর বড় মালা পরিয়ে দিলেন। "মা" যেই মালাটি খুলতে যাবেন বীরেনদা মালাটি চেপে ধরে বললেন, "থাকবে।" "মা" লক্ষ্মী মেয়ের মত সারাক্ষণ মালাটি পরে বসে রইলেন। একটি মেয়ে "মায়ের" কাছে দাঁড়িয়ে আছে। ছেলেরা অধিবাস কীর্ত্তন আরম্ভ করার আগে একে একে এসে "মাকে" প্রণাম করছে। মেয়েটি "মায়ের" হাতে একটি করে মালা তুলে দিচ্ছে। "মা" সেটি পরিয়ে দিচ্ছেন। সেও এক দর্শনীয় দৃশ্য। প্রত্যেকটি ছেলে মালা চন্দন পরে কাছাকাছি বসল। জোর বাজনা শঙ্খধ্বনির মধ্যে দিয়ে বীরেনদা গাইতে আরম্ভ করলেন। "মা" বীরেনদার দিকে তাকিয়ে ... হাসিমুখে ... আনন্দ যেন ধরছে না। যখন আমাদের নাম আরম্ভ হল "মা" যথারীতি ছেলেদের বার করে দিয়ে গিয়ে একটু বসলেন। খানিক পরেই "মা" এসে ঘুরতে লাগলেন। কখনও একটি শ্রীহস্ত তুলে ধরে আমাদের উৎসাহ দিয়ে পরিক্রমা করছেন, কখনও হাতে তালি দিয়ে...। মুখটি অফুরন্ত হাসিতে লাল। পরমা প্রকৃতি "মা" আমার, কি খেয়ালে একজনকে জড়িয়ে ধরে চলতে থাকলেন। এমনিতেই "মায়ের" উপস্থিতিতে নাম খুব জমে যায় তার উপর কানপুর অর্ধপথ। কলকাতা থেকে "মায়ের" আশ্রিত অনেক গাইয়ে এসেছেন। জমজমাট নাম হচ্ছে। পশ্চিমের ডিসেম্বরের ঠাণ্ডা কারও বোধই হচ্ছে না। সবাই চাদর ছুঁড়ে ফেলে দিচ্ছে। খানিক পরেই আর একজনকে ধরে পরিক্রমা! আবার একটু পরে "মা" আর একজনকে ধরে ঘুরছেন। তারপর যাঁরা বসেছিলেন তাঁদের এক এক করে টেনে নিয়ে জড়িয়ে ধরে চললো ঘোরা। কান্তি কাকীমা বসেছিলেন। তাকে ধরে "মায়ের" টান দেওয়াতে তিনি সঙ্কোচ বশতঃ উঠতে চাইছিলেন না। "মায়ের" ভ্রুকুটিতে উঠে পড়লেন। মাইয়া তাঁকে নিয়ে খানিকটা প্রদক্ষিণ করলেন। কেউ আর বাদ রইল না। সকলেই "মায়ের" কৃপা পেয়ে ধন্য হয়েছে। সুভদ্রাদি বোধহয় শুতে যাবার আগে একটু দেখতে এসেছিলেন। তিনি তাঁবুর বাইরে। তাঁবুর পর্দাটি ধরে দাঁড়িয়ে দেখছেন। "মা" ছুটে গিয়ে তাঁকে ধরে নিয়ে এসে প্রদক্ষিণ করতে লাগলেন। তিনি ত লজ্জায়, সঙ্কোচে আড়ষ্ট হয়ে গেছেন। "মা" সেদিন অনেকক্ষণ আমাদের সাথে চলেছেন। এতক্ষণ "মাকে" থাকতে কখনও দেখি নি। এটা কি "রাসলীলা" হল? পাছে আমি এই পরম সুখ, পরমানন্দ থেকে বঞ্চিত হই, তাই কি "তিনি" আমাকে অত বলেছিলেন? লীলাময়ী মাগো তোমার লীলা তুমিই জান — আমাদের বুকে পরমধন জমা হয়ে রইল।

সামান্য একটু পরে "মা" এসে আবার বসলেন। ভোর হয়ে এসেছে। ছেলেরা নাম ধরবে। "জয়মা"।

দিল্লী

দিল্লীতে "মায়ের" বিরাট party. Lead করার অনেক লোক ছিল যেমন গিরিধারী, বনওয়ারী, আরও দুতিনজন ছিলেন। এদিকে বীরেনদা তখন দিল্লীতে। বীরেনদা, কানুভাই, ননী, সতপাল, শিবজী, তিনি খোলও পিটতেন, লাহিড়ীদা, হরেনদা, ভুপেন এরা ত ছিলেনই। এঁরা ছাড়া, 'মা' উপস্থিত থাকলে, স্ত্রী পুরুষ অনেকেই "মাকে" দর্শন করতে আসতেন। যাঁরা নাম রসিক তাঁরা নামে সঙ্গ দিতেন। "মায়ের" সঙ্গে আসত বিভূদা, হীরুদা, কখনও শোভনদাও থাকতো। জমজমাট কীর্ত্তন হত। আশ্রমের মেয়েরা প্রায় সকলেই গাইতে বাজাতে পারতেন।

কিন্তু তাঁরা এত ব্যস্ত যে নামে বেশী সময় দিতে পারতেন না। মেয়েদের মধ্যে শক্তি ও তুষার প্রধান। গৌরীদি, আমার মা নেচে নেচে ভারী সুন্দর নাম করত - নিজেই গাইছে আবার নিজেই দোহার দিচ্ছে এটা খুব কমেই পারে। গৌরীদি অপূর্ব্ব সুন্দরী — lead করার পর সারারাত বাজিয়ে মঞ্চ পরিক্রমা করে গেয়ে যেতেন। আরও অনেকে ছিলেন। ছেলেদের মধ্যে ছ'সাত জন অদ্ভুত সুন্দর খোল বাজাতেন। এঁদের মধ্যে শ্রীমন্তবাবু, আমার মেশোমশায়, শক্তির বাবা, একটু বয়স্ক সরকারী ভাল চাকুরে। আবার হোমিপ্যাথ ডাক্তার - অত্যন্ত ভালো আর নির্ব্বিরোধী মানুষ ছিলেন। তিনি খোল পেলে আর ছাড়তে চাইতেন না। গোলাপ ফুলের মত রং, মাথায় একটু খাটো - ছেলেদের সঙ্গে তন্ময় হয়ে মাথা ঝুঁকিয়ে যখন খোল বাজাতেন, বড় সুন্দর লাগত। যেখানেই "মায়ের" নামযজ্ঞ হোত, দিল্লী party র ডাক আসত।

বিভূদার কথা আর একটু না বলে পারছি না। তাঁর এমনই সুমধুর কণ্ঠ সঙ্গীত, সেই গলার ধারে কাছে কেউ যায় না। "মার" সামনে বসে যখন গাইতেন — "মা বনা রহে তেরা দরবার" তখন বুকের মধ্যে কি রকম করতে থাকত।

দিল্লীতে নাম চলার মত করতাল বাজিয়ে, দোহার দেবার লোকও অনেক ছিল। আমার মাইয়াও বেশী সময় ছেলেদের নামেই বসে থাকতেন। অনেক ভূমিকা হয়েছে — এবার নামযজ্ঞের কথা বলি।

গবলু-পাটনদের নূতন বাড়ীতে "মা" ছেলেমেয়ে নিয়ে এসেছেন - গৃহপ্রবেশ করলেন "মা"। ভোরবেলা নিউদিল্লী কালীবাড়ীর পুরোহিত, আমি এবং তুষার (আমাদের বলা ছিল) স্নান সেরে প্রস্তুত হয়েছিলাম। গবলু আমাদের নিয়ে গেল। আমরা ভোর ছটার আগেই পৌঁছে গেছি। সেখানে ডিসেম্বরের শীতে অনেকেই স্নান সেরেই বোধহয় উপস্থিত হয়েছেন। ছয়টার সময় "মা" এলেন — ধূপধূনা শঙ্খ-উলুধ্বনির মাঝে। সবার খুব আনন্দ। গবলুদের বাড়ীর সকলেই "মায়ের" একনিষ্ঠ ভক্ত। কাকাবাবু উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত হয়েও নিরভিমানী — শুধু জপ করতেন। কখনও তাঁকে "মায়ের" কাছে যেতে দেখি নি। অল্পদূরে দাঁড়িয়ে একদৃষ্টে "মায়ের" দিকে তাকিয়ে থাকতেন — ভিতরে বোধহয় জপ চলতো। তাঁর সম্বন্ধে হরেনদা "মা"কে বলতে শুনেছেন — "এই শরীরটার কাছে এলে বাবার (পাটনের বাবা) বাহ্যজ্ঞান থাকত না।"

এদিকে পুরোহিত মশায় পূজা করতে বসেছেন। "মা" সেখানে হাজির। পুরোহিত মশায় নিরীহ ভালমানুষ — একটি নূতন স্টীলের বড় বাটি পেয়ে তাতে নারায়ণকে বসিয়েছেন স্নান করাবেন বলে। "মা" দেখে বল্লেন, "ওতে বসিয়েছো কেন বাবা?" তিনি উত্তর দিলেন, "এটা স্টীলের পাত্র।" "মা" বল্লেন, "বাবা, স্টীল হল লোহা, ওতে চলবে না। কাঁসা বা পেতলের পাত্র নাও।" "মা" খানিক দাঁড়িয়ে পূজা দেখলেন। অনেকে এসে গেছেন- "মা" হলে গিয়ে বসলেন। পূজা শেষে প্রসাদ - তারপর খুব খাওয়া-দাওয়া। পাশের জমিতে বিরাট একটা প্যান্ডেল করা হয়েছে। — অনেক লোক এসেছেন। নূতন পাড়ার লোকও অনেক এসেছেন। কীর্ত্তন চলছে — লোকের আসা-যাওয়া যথারীতি চলছে। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের জ্যেষ্ঠা কন্যা এলেন "মাকে" দর্শন করতে। তিনি চমৎকার পালা গাইতেন। তিনি একবার সিমলায় এসে আমাদের অনেক পালা গান শুনিয়েছেন। তাঁর সঙ্গীত শিক্ষক সুবিখ্যাত

পালাগায়ক ভূপেন বসু মহাশয় খুলি সমেত এসেছিলেন। আমরা দোহার দিয়েছি। গবলুদের বাড়ীতে "মা" দুচার কথার পর তাঁকে একটি গান করতে বল্লেন। তিনি বললেন, "কোনও বাজনা এখন চলে না। খোল করতাল হারমোনিয়াম কিছুই চলবে না — আমি এমনিই গান করবো।" বিনা বাজনায় একটি দীর্ঘপদ কী চমৎকার গাইলেন। "মা" মহা খুশী — একটি মস্ত মালা তাঁকে পরিয়ে দিলেন। একটু পরেই সভা ভঙ্গ হল। আমরা বাড়ী রওনা দিলাম।

পরদিন গিয়ে শুনি সেই রাতেই অধিবাস হবে ও তারপরদিন নামযজ্ঞ। অল্প কয়েকমাস আগেই একটি বড়সড় অপারেশন হয়েছে - সে ব্যথা এখনও যায়নি। সারারাত নাচানাচি? ও বাবা চলবে না! আমি চুপচাপ বাড়ী চলে গেলুম। সন্ধ্যার আগে গাড়ী নিয়ে লোক এল আমাকে নিতে — "মা ডেকেছেন!" এযে আমার "মায়ের" ডাক! যেতেই হল।

"মা"র কাছে সটান গিয়ে বললুম — "আমার পেটে অপারেশন হয়েছে কিছুদিন আগে। আপনি ডেকেছেন — আমি কিছু জানি না।" "মা" হাসলেন। রাতে যেমন হয় - পেটের কথা কি মনে থাকে? চেঁচানো ঘোরা চলছে। "মা" ঘর থেকে বলে পাঠাচ্ছেন — "ওকে বসতে বল।"

পরদিন কি ব্যাপার হল, ঠিক বুঝতে পারা গেল না। "মা" বাড়ীর একজনকে মঞ্চের এক পাশে জপে বসিয়ে দিলেন - যতক্ষণ নাম চলবে একজন করে জপ করবে আর নিরাধার নাম চব্বিশ ঘন্টা করতে হবে। খুবই আনন্দের সঙ্গে নাম যজ্ঞের সমাপ্তি হল। "মা" মঞ্চের সামনে খানিক গড়াগড়ি দিলেন। একটু পরেই সদলবলে চলে গেলেন। আমরাও বাড়ী ...। "জয় মা"।

দিল্লী আশ্রম

এবারে দিল্লী আশ্রমে নামের কথা বলে শেষ করবো। দিল্লী আশ্রমে "মায়ের" উপস্থিতিতে বছরে দু'তিনবার নামযজ্ঞ হতই। তাছাড়া অখণ্ডনাম মাঝে মাঝেই হত। একবার "মা" বৃন্দাবন থেকে লোক আনিয়ে একমাস অখণ্ড নাম করিয়েছিলেন, কেন জানি না। আমরা প্রত্যেক রবিবারে সকলে মিলে গিয়ে নিজেরা গাইতুম।

দিল্লীতে নামযজ্ঞ হবে। "মা" যথারীতি ছেলেদের অধিবাসের পর আমার হাত ধরে নিয়ে গিয়ে মেয়েদের নাম আরম্ভ করিয়ে দিলেন। নাম শেষ করে আমি লোদী রোড চলে গেলাম, আমার ভাই ননী তখন সেখানে থাকত। রাতে আসেনি কেন তা জানার জন্য এবং স্নান সারার জন্য যাওয়া। গিয়ে দেখি ননীর দুতিন মাসের ছেলেটি খাচ্চে না, নড়ছেও না, চোখ বন্ধ করে পড়ে আছে — মুখের রং স্লেটের মত। অরুণা কান্নাকাটি করছে। ডাক্তার এসে বললো Child Specialist দেখান। সামান্য ওষুধ দিয়ে গেল।

আমার মন খুব খারাপ হয়ে গেল। আশ্রমে এসে শুনি "মা" বলছেন, "মেয়েটা স্নান করে কি পরবে? আমাকে একটা শাড়ী দাও।" মেয়েরা আমাকে বললো "মার কাছে যাও।" "মার" কাছে যেতেই "মা" বল্লেন "তুমি স্নান করে কি পরবে? এইটা পর।" আমি বললুম "আমার স্নান হয়ে গেছে — শাড়ী ছিল।" "মা" বললেন,

"এটা নাও। পরবে।" "মা" আমাকে চমৎকার সিল্কের মত দেখতে একখানি মিলের শাড়ী দিলেন। "মায়ের" হাতের প্রথম পাওয়া শাড়ী। কিছুদিন পরই দুর্গা পূজা - তখন পরব।"

সেদিন "মা" একভাবে ছেলেদের কীর্ত্তনে বসেছিলেন। আমরাও বসে আছি। চমৎকার নাম চলছে। হঠাৎ দেখি "মায়ের" মুখ লাল টক্ টক্ করছে মুখে ভূবন-ভোলানো হাসি। একটি হাত তুলে ছেলেদের উৎসাহ দিচ্ছেন। সারা শরীরে আনন্দ আর ধরছে না। সে এক অপরূপ ভাববিহ্বল দিব্য মূর্ত্তি। আমি "মাকে" ইশারা করলাম মণ্ডপে যেতে। "মা" হাসিমুখে আমাকে কাছে ডাকলেন। আমার চুল সবসময় খোলা থাকে। আমি যেতেই চুলের মুঠি ধরে আঁট করে একটা খোঁপা বেঁধে দিলেন। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে আমার শাড়ীটা আঁট করে পরিয়ে দিয়ে হাত ধরে বললেন, "আমার সঙ্গে চলো।" "মা" ছেলেদের মধ্যে মণ্ডপে যাওয়ায় ওরা তখন আনন্দে উন্মত্ত হয়ে কীর্ত্তন করছে। আমি লজ্জায় সঙ্কোচে 'না-না' করছি। বজ্রমুষ্ঠিতে আমার হাতখানি ধরে "মা" পরিক্রমা করতে লাগলেন। "মা" হাত ধরতেই চোখে জল এসে গেল। সংসারী মানুষ — এক সেকেণ্ডের জন্য মনে হোল ননীর ছেলেটার কিছু হল না ত? আমার বড় ছেলে খড়্গপুরে পড়ে তার কিছু হল না ত'? মুহূর্তের চিন্তা গেল — শরীরটা শোলার মত হালকা, বোধশূন্য, শুধু ধারা গড়িয়ে চলেছে — কেন যে জল পড়ছে তাও জানি না। আমাকে জড়িয়ে "মা" ঘুরছেন — অন্য হাতটি তুলে উৎসাহ দিচ্ছেন। শেষ পর্য্যন্ত "মা" কি করতেন জানি না...। হঠাৎ এক ভক্ত "মায়ের" সামনে ধপাস করে মাটিতে পড়ে গেল - চোখ বন্ধ, মাথা ঝাঁকাচ্ছে - অত বড় শরীর দিয়ে শুয়ে প্রদক্ষিণ করছে। সকলে ভয় পেয়েছে - 'মা' রয়েছেন। সকলে সরে গেল - 'মা' আমাকে জড়িয়ে ধরে মেয়েদের কাছে এসে দাঁড়ালেন। আমার ধারা বয়ে চলেছে। এইবাবে কতক্ষণ ছিলাম জানি না। কীর্ত্তন শেষে দিদি আমাকে বললেন, "তোর বাবা পরম ভক্ত ছিলেন। "মা" তোকে কৃপা করে দিলেন।" কৃপা বলে কৃপা. এ যে দুর্লভ কৃপা!! কতদিন যে আমার চোখ দিয়ে জল পড়েছে এই অকল্পনীয় দুর্লভ সৌভাগ্যে ...! কোন সুকৃতিতে "মা" এত কৃপা করলেন? আমি অতি সামান্য সংসারী মানুষ! সংসারী মানুষের যা স্বাভাবিক - রাগ, দুঃখ, অভিমান, লোভ সবই আছে আজও, এত বয়সেও - কিছু তফাৎ হয় নি। কিন্তু সেদিনের কথা ভাবলে আজও আশ্চর্য্য হয়ে যাই। মন নির্ম্মল আনন্দে ভরে যায়!

"জয়মা"!



অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে জানানো হচ্ছে যে শ্রীশ্রী মায়ের অতি পুরাতন ও একনিষ্ঠ ভক্ত শ্রীমতী সরমা মুখার্জী অকস্মাৎ শ্রীশ্রী মায়ের চরণে লীন হয়েছেন। এই তাঁর শেষ লেখা।

— সম্পাদক

মহাকুম্ভের বার্তা

মহাকালের কোলে মহাকুম্ভের বার্তা এল নূতন সহস্রাব্দির প্রারম্ভে। তারই সাড়া দিকে দিকে শুনিয়ে গেল নবজাগরণের নবচেতনায় উদ্‌বোধনের মন্ত্র। বিশ্বের বৃহত্তম এই জনসমাগম সুদৃঢ় ভারতীয় সংস্কৃতিও আধ্যাত্মিক ভাবতরঙ্গের এক বিরাট আলোকোজ্জ্বল চিত্রের ছাপ রেখে গেল সকলের হৃদয়ে চিরদিনের তরে।

এবারে গঙ্গাপ্রবাহ পরিবর্তিত হয়েছে। তাই গঙ্গার ওপারে ঝূঁসীর বিস্তৃত বেলাভূমিতে মহাকুম্ভের স্থান নিদ্ধারিত হয়েছে। সারা ভারতের সব সম্প্রদায়ের সাধু, সন্ত, মহন্ত একত্রিত হয়েছেন এই বিশেষক্ষণে পবিত্র স্নানের উদ্দেশ্যে। সকলের শিবির সারি সারি রচিত হয়েছে যথাস্থানে। ধ্বনিত হচ্ছে ক্ষণে ক্ষণে এই উদ্‌ঘোষ —

"সতীর্থরাজো জয়তি প্রয়াগঃ"

মহাকুম্ভের আদিপর্ব —

এই কুম্ভের আদি কোথায়? ইতিহাসের পৃষ্ঠায় আমরা দেখতে পাই যে কেউ বলছেন, "ভারতের স্বর্ণযুগে গুপ্তবংশের শাসনকালে মায়াপুরী হরিদ্বার, তীর্থরাজ প্রয়াগ, মহাকাল নগরী উজ্জয়িনী ও নাসিক — এই চারটি পুণ্যময় ধামে কুম্ভের স্থান নির্দিষ্ট হয়েছে। কেউ কেউ বলেন যে, কুম্ভের সূত্রপাত হয় সম্রাট হর্ষবর্দ্ধনের সময়। তিনি কুম্ভে নিজের সর্বস্ব দান করে ভগিনী রাজ্যশ্রীর পরিধেয় ধারণ করে রাজ্যে ফিরে আসতেন। আবার কেউ বলে থাকেন জগদগুরু আদি শংকরাচার্য্যই কুম্ভের প্রবর্ত্তনা করেছেন।

কুম্ভের আরম্ভ কিন্তু এরও বহুপূর্বে হয়েছে। বেদও পুরাণেও কুম্ভ উল্লিখিত হয়েছে। সমুদ্র মন্থনের সময় অমৃত কুম্ভের উৎপত্তির কথা বর্ণিত আছে। বিনতা ও সর্পজননী কদ্রুর কলহ-কাহিনী ও সর্বজনবিদিত। এই উপলক্ষ্যে নিজ জননীকে দাসত্ব হতে মুক্ত করার জন্য বিনতানন্দন গরুড় অমৃত কলস আনয়নের সময় যে চারটি স্থানে রেখেছিলেন, পরবর্তী যুগে সেই চারটি স্থানেই কুম্ভমেলা হয়ে আসছে। অবশ্য তিথি, নক্ষত্র, ক্ষণ, মুহূর্ত, রাশিও এর সঙ্গে জড়িত আছে। তাই গোস্বামী তুলসী দাসজী রামচরিত মানসে লিখেছেন —

"মাঘ মকর গত রবি যব হোই।
তীরথ পতিহি আবৈ সবকোই।
দেব দনুজ কিন্নর নরশ্রেণী
সাদর মজ্জহি সকল ত্রিবেণী।"

অর্থাৎ মাঘ মাসে সূর্য্য যখন মকর রাশিতে অবস্থান করে, তখনই দেব, দনুজ, কিন্নর, নর সকলে তীর্থরাজ প্রয়াগে এসে সাদরে ত্রিবেণীতে স্নান করেন।

সেই আদিযুগ হতে ধন-রত্ন- ঐশ্বর্য্য-সুখ-আরোগ্য-আত্মজ্ঞান-অমরত্ব প্রভৃতি মানবের বিবিধ আকাঙ্খার

সঙ্গে যুক্ত রয়েছে এই মহাকুম্ভ।

মানবজীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ উদ্দেশ্য আত্মজ্ঞান বা অমরত্ব কে বোঝানর জন্যই যেন মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিরা এই আধ্যাত্মিক মহাকুম্ভকে তুলে ধরেছেন আমাদের দৃষ্টি সম্মুখে। তাই এই শ্লোকটি উদ্ধৃ ত হয়েছে প্রয়াগে প্রকাশিত "তীর্থরাজ প্রয়াগে মহাকুম্ভ বিশেষাঙ্ক" পত্রিকায় —

"অন্তঃ শূন্যো বহিঃ শূন্যঃ শূন্যঃ কুম্ভইর্বানবে।

অন্তঃ পূর্ণো বহিঃ পূর্ণঃ 'পূর্ণঃ' কুম্ভইবার্নবে।।

অর্থাৎ যেমন শূন্য আকাশে পতিত একটি রিক্ত কুম্ভের বহির্ভিতরে শূন্যই দেখা যায়, আবার যদি জলে পরিপূর্ণ কুম্ভ সমুদ্রে নিমজ্জিত হয় তবে সেই কুম্ভটির বাইরে ভিতরে শুধু জলই থাকবে, তেমনই এই জগতের সর্বত্র এক আত্মাই বিরাজিত রয়েছেন।

সৎসঙ্গ ও আত্মতত্ত্বের অনুসন্ধানই কুম্ভ পর্বের প্রধান উদ্দেশ্য প্রমানিত হল।

শ্রীশ্রী মায়ের কুম্ভমেলার সঙ্গে বহুবর্ষ পূর্ব হতে সম্বন্ধ রয়েছে। ১৯২৭ সনে শ্রীশ্রী মা ভক্তবৃন্দ সহ কুম্ভমেলায় হরিদ্বারে এসেছিলেন। পুরাতন মাতৃভক্ত ডঃ পান্নালালজী I.C.S (Retd.) এর প্রচেষ্টায় ১৯৪৮ সনে সর্বপ্রথম এলাহাবাদে কুম্ভমেলায় শ্রীশ্রী মায়ের শিবির রচিত হয়েছিল। সেই হতে আজ অবধি প্রতি কুম্ভ মেলায় অব্যাহতভাবে এলাহাবাদে ও হরিদ্বারে (কনখলে আশ্রম হওয়ার পূর্ব পর্য্যন্ত) মায়ের শিবির রচিত হয়ে আসছে।

১৯৬২ সনে হরিদ্বারে পূর্ণকুম্ভের সময় সর্বপ্রথম নিরঞ্জনী আখাড়ার মহন্ত ও সাধুরা মাকে জলপূর্ণ রূপোর ঘট ও চাদর দিয়ে কুম্ভে বরণ করেন। সেবার নিরঞ্জনী আখাড়ার সাধুরা মাকে হাতির পিঠে রূপোর সুসজ্জিত সিংহাসনে বসিয়ে শোভাযাত্রা করে ছিলেন। মায়ের সেই রাজরাজেশ্বরী রূপ দর্শন করে হরিদ্বারের জনতা মুগ্ধ হয়েছিলেন। মহানিব্বানী আখাড়ার সঙ্গে যদিও মায়ের সম্বন্ধ বহু দিনের তবু শ্রী স্বামী মুক্তানন্দ গিরিজীর (দিদিমার) মহাপ্রয়াণের পর মহানিব্বানী আখাড়ার সঙ্গে সম্বন্ধ আরো ঘনিষ্ঠতর হয়ে ওঠে। মহানিব্বানী আখাড়াও মাকে কুম্ভের সময়ে নিজেদের শোভাযাত্রায় নিতেন।

যদিও লৌকিক দৃষ্টিতে শ্রীশ্রী মায়ের মণ্ডলেশ্বর বা মহামণ্ডলেশ্বরের মত কোন পদ ছিল না, তবু ভারতের সব সম্প্রদায়, আখাড়ার সন্ত, মহন্ত, আচার্য্য, মহামণ্ডলেশ্বর, শংকরাচার্য্য সকলেই মায়ের মহা মহিমমণ্ডিত বিশ্বজনীন মাতৃত্বের কাছে নতি স্বীকার করেছিলেন। মা যে সকলের জননী, বিশ্বজননী। "মা, আপ কুম্ভ কী জ্যোতি হ্যাঁয়", এই ছিল মায়ের চরণে সাধুদের স্বীকৃতি।

সকলেই মাকে কুম্ভের সময়ে নিজেদের শোভাযাত্রায় নিতে চাইতেন। কারণ এত ভক্ত শিষ্যের সংখ্যা গরিষ্ঠতা ও অন্য কারুর খুব একটা দেখা যেত না। শোভাযাত্রার এত বর্ণাঢ্যতা, বর্ণ বৈচিত্র্যই বা আর কার আছে? ছোট ছোট বালক বালিকা ব্রহ্মচারী ব্রহ্মচারিনীরা মাতৃ নামাঙ্কিত নামাবলী পরিহিত পতাকা হস্তে সারি সারি চলেছে। তারপর মায়ের রথের পুরোভাগে আশ্রমের সাধু ও সন্ন্যাসীবৃন্দ পদব্রজে চলেছেন। মায়ের রথের সঙ্গে বড় বড়

ব্রহ্মচারিণীরা চলেছেন। এরপর মায়ের গৃহীভক্ত মহিলারা লাল পাড় শাড়ী পরিহিতা নামবলী পরে সারি সারি চলেছেন। তারপর মার অগণিত গৃহীভক্তরা মাতৃনামাঙ্কিত হলুদ রুমাল মাথায় বেঁধে চলেছেন। বিভুদা, পুষ্পদি, ছবিদি, মণিদা, দাশুদাদের অপূর্ব ধুমকীর্তন মাইকে শ্রবণ করে সকলে মুগ্ধ হতেন। সর্বোপরি শেষনাগের অপূর্ব রজত সিংহাসনে উপবিষ্টা মায়ের ভুবনমোহিনী রূপ দর্শন করে কুম্ভের জনতা ধন্য হতেন। সারি সারি মহামণ্ডলেশ্বরদের সঙ্গে শ্বেত শুভ্র শুচিস্নিগ্ধ বসনভূষিতা শ্রীশ্রীমায়ের ভুবনভোলানো রূপ যে দেখেছে তারই হৃদয়ে ঐ মহনীয় রূপ চিরতরে অঙ্কিত হয়ে আছে। তাই কুম্ভমেলায় শাহী স্নানের শোভাযাত্রার শোভাবৃদ্ধি র জন্য সব আখাড়ার সাধুরাই মাকে নিজেদের সঙ্গে নিতে চাইতেন।

মায়ের অব্যক্তধামে প্রবেশের পরেও হরিদ্বার ও প্রয়াগে কয়েকবারের কুম্ভে মায়ের মধুর মনোহর ছবি নিয়ে নিরঞ্জনী ও মহানির্ব্বানী আখাড়ার সঙ্গে শ্রী শ্রী আনন্দময়ী সংঘের পক্ষ হতে শোভাযাত্রা বের হয়েছে।

গত ৩২ বছর ধরে ভারত সরকার প্রতিবার প্রয়াগ কুম্ভমেলায় শ্রীশ্রী মায়ের শিবিরের জন্য প্রয়োজন মত অতিবিশিষ্ট জমি, জল, লাইট সব বিনামূল্যে দিয়ে আসছে।

এবারেও প্রয়াগে সহস্রাব্দীর প্রথম মহাকুম্ভ উপলক্ষ্যে শ্রীশ্রী আনন্দময়ী সংঘের পক্ষ হতে শ্রীশ্রী মায়ের শিবির রচিত হয়েছে। সরকারের পক্ষ থেকে মেলার অধিকারী বিভাগ এবারেও মায়ের শিবিরের জন্য একটি বিস্তৃত জমি (প্রায় ১২০ ফুট × ২৮০ ফুট) গঙ্গার পূর্বদিকে প্রদান করেছিল। শঙ্করাচার্য্য মার্গে শাস্ত্রী পুল ও রেলওয়ে ব্রীজের মাঝখানে মায়ের শিবির রচিত হয়। এই স্থলটি ৬ নম্বর সেক্টরের অন্তর্গত ছিল। গঙ্গা প্রবাহ পরিবর্তিত হওয়ায় এবার সরকার দশেরও অধিক সংখ্যায় পন্টুন ব্রীজ তৈরী করিয়েছিল। শংকরাচার্য্য মার্গে আসার জন্য ৮ নম্বর ব্রীজটি ব্যবহৃত হত।

শ্রীশ্রী মায়ের শিবিরের ঠিক বিপরীত দিকে শ্রীমদ্‌ভক্তিবেদান্ত স্বামীর "ইন্টারন্যাশনাল শ্রীকৃষ্ণ কনসাস্‌নেস্ (ইস্কন)দের শিবির রচিত হয়েছিল। শঙ্করাচার্য্য মার্গে সব শংকরাচার্য্যদের প্রাসাদোপম শিবিরের দ্বারও খুবই দর্শনীয় হয়েছিল। রামকৃষ্ণ মিশনের শিবিরও কাছেই ছিল। মায়ের আশ্রমের বাঁদিকে শ্রীযোগানন্দ পরমহংসজীর শিবির ছিল। চতুর্দিক আলোয় আলোয় ঝলমল করছিল। শ্রীশ্রী মায়ের শিবির প্রতিবারের মতন এবারও সুন্দর ও সুষ্ঠুভাবে রচিত হয়েছিল। শ্রীশ্রীমায়ের কুঠিরটি খুবই সুন্দর হয়েছিল। ভিতরের দেওয়াল হস্তনির্মিত মাদুরের দ্বারা আবৃত। উপরে জরির কাজ করা শ্বেত চাঁদোয়া টাঙ্গানো, যাতে বড়বড় করে "সত্যম জ্ঞানম্ অনন্তম্ ব্রহ্ম" এই দিব্য মন্ত্রটি অঙ্কিত ছিল। মাঝে মাঝে জরির তারকা অঙ্কিত ছিল। কুটিরের দক্ষিণ ও পূর্ব দিকে দুটি দ্বার ছিল, যাতে মাদুরেরই পর্দা দেওয়া ছিল। কুটিরের বাইরে চতুর্দিক প্রায় দুই ফুট স্থান বাঁশের জালি দিয়ে সুন্দর বারান্দার মত করে নির্মিত করা হয়েছিল। এই বাঁশের কাজটি আগরতলার বাঁশের কারুকার্য্যময় শিল্পের কথা মনে করিয়ে দেয়। ঐ বাঁশের জালির বারান্দায় কয়েকটি সুন্দর ফুলের গামলা রাখা হয়। একদিকে তুলসী গাছও ছিল। মায়ের কুটিরের বাইরের দিকে দেওয়ালে একটি অতি সুন্দর ছোট মন্দিরের মত ঝোলান কুটির নির্মিত হয়েছিল। সেখানে মায়ের নয়নাভিরাম ছবি বিরাজিত ছিল। মায়ের আশ্রম শিবিরে প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গেই যাত্রীদের দৃষ্টি মায়ের

মনোহর ছবির দিকে সহজেই আকৃষ্ট হত। তাঁরা স্বতঃ-প্রণোদিত হয়ে মায়ের ছবির কাছে বসে কিছুক্ষণ মৌন প্রার্থনা জানিয়ে যেতেন।

আশ্রম শিবিরের ভিতরে প্রবেশ করেই বাঁদিকে মায়ের কুটিরের সামনে সৎসঙ্গের জন্য প্যাণ্ডেল রচিত হয়। ডানদিকে মায়ের বই ও ছবির স্টল ছিল। আশ্রম শিবিরের প্রবেশ দ্বার হতে সোজা ভোজনালয়ের রাস্তা চলে গেছে। ঐ রাস্তার দুধারে আশ্রমের সাধু ব্রহ্মচারীদের জন্য কুটিয়া, তাঁবু ইত্যাদি যেখানে যথারীতি মহিলা ও পুরুষ ভক্তদের জন্য পৃথক ব্যবস্থা ছিল। আশ্রমের ব্রহ্মচারিণীদের থাকার ব্যবস্থা পৃথকভাবে করা হয়েছিল। ভোজনালয় একদিকেই ছিল। স্নানাগার ও শৌচালয়েরও খুব সুন্দর ভাবে পৃথক পৃথক ব্যবস্থা ছিল।

আশ্রমের বরিষ্ঠ ব্রহ্মচারী শ্রদ্ধেয় পানুদার বিশেষ প্রচেষ্টায় গত ৮ই ডিসেম্বর আশ্রম শিবিরের জন্য জমির স্বীকৃতি প্রাপ্ত হয়। কনখল হতে আগত ব্রহ্মচারী জ্যোতির্ময়ানন্দজী, পুণার যোগেন ভাই এবং অক্লান্ত কর্মী ব্রহ্মচারী সুবোধভাই একমাসেরও অধিককাল এই প্রচণ্ড শীতে বালুচরে খোলামাঠে একটি তাঁবুতে বাস করে আপ্রাণ চেষ্টায় সকলের বাসযোগ্য এই মনোরম শিবিরটি গড়ে তোলেন। পরে ধবলচীনা হতে স্বামী নির্গুণানন্দজীও এসে এই কাজে সহযোগিতা করেন।

প্রায় এক মাস পূর্ব হতেই ব্রহ্মচারী পানুদা কাশী হতে প্রতি সপ্তাহে একবার, কখনও সপ্তাহে একাধিকবার এসে সকল ব্যবস্থাপনা পরিদর্শন করেছেন এবং আরো কি কি করণীয় তার নির্দেশ দিয়েছেন। এলাহাবাদের দানশীল ভক্ত শ্রী ভগবান আগরওয়ালজীর অতুলনীয় নিঃস্বার্থ সেবা ও অন্নপূর্ণা ভাণ্ডারের আয়োজন সত্যিই প্রশংসনীয়।

পৌষ পূর্ণিমার দিন প্রথম কুম্ভ স্নান। তার আগে প্রায় সব শিবিরেই শোভাযাত্রা করে কুম্ভ প্রবেশের অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়েছিল। কুম্ভপ্রবেশের অর্থ হল প্রয়াগে অবস্থিত সমস্ত আখাড়া হতে সব আচার্য্য, মহন্ত, মহামণ্ডলেশ্বরেরা সুসজ্জিত হাতী, ঘোড়া, রথ নিয়ে ব্যাণ্ড পার্টি ও নানাবিধ বাজনা সহ শোভাযাত্রা করে নিজের নিজের শিবিরে প্রবেশ করেন। ইতিপূর্বে শ্রীশ্রী মায়ের উপস্থিতিতে মহানিৰ্বানী আখাড়ার আমন্ত্রণে তাঁদের সঙ্গেই শোভাযাত্রা করে শ্রীশ্রী মায়ের কুম্ভে প্রবেশ হত।

আগামী সংখ্যায় মহাকুম্ভের বিস্তৃত বিবরণ দেবার চেষ্টা করা হবে।

(ক্রমশঃ)



আশ্রম-সংবাদ

১। কনখল —

দেবতাত্মা হিমালয়ের পাদদেশে অবস্থিত পবিত্র কনখলে শ্রীশ্রীমায়ের আশ্রমে গত ১৩ ই এপ্রিল, ২০০১ শ্রীশ্রী স্বামী মুক্তানন্দগিরিজীর সন্ন্যাস উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এই উপলক্ষ্যে গিরিজীর ষোড়শোপচারে পূজা ও সাধু ভাণ্ডারার আয়োজন করা হয়েছিল।

২৬ শে এপ্রিল অক্ষয় তৃতীয়ার পূণ্যতিথিতে একটি নূতন অতিথিভবন ও "শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী পুস্তকালয়" — সর্ব ধর্ম সম্বন্ধিত বিশিষ্ট গ্রন্থাগারের উদ্‌ঘাটন হয়। এই গ্রন্থাগারে শ্রীশ্রী মায়ের সমস্ত বই ও সর্বধর্মের গ্রন্থের সংগ্রহ সংরক্ষিত করার পরিকল্পনা।

২৮ শে এপ্রিল শ্রী শংকরজয়ন্তী উপলক্ষ্যে শংকরাচার্য্য হলে জগদগুরুশংকরাচার্য্যের ষোড়শোপচারে পূজা এবং বৈশাখী শুক্ল অষ্টমীতে ১লা মে বাবা ভোলানাথের তিরোধান তিথি উপলক্ষ্যে বাবা ভোলানাথের ষোড়শোপচারে বিশেষ পূজা ও সাধু ভাণ্ডারা অনুষ্ঠিত হয়।

২রা মে হতে ১০ই মে শ্রীশ্রী মায়ের ১০৬ তম শুভ জয়ন্তী মহোৎসব উপলক্ষ্যে পুণ্য জন্মদিনের দিন বিশেষ পূজা, ভোগ ও পুষ্পাঞ্জলি সম্পন্ন হয়।

২রা মে হতে ১০ই মে পর্য্যন্ত প্রতিদিন প্রাতে বৃন্দাবন হতে আগত স্বামী হরগোবিন্দজীর মণ্ডলী দ্বারা রাসলীলা এবং অপরাহ্নে প্রখ্যাত মহাত্মাদের বিদগ্ধ প্রবচনের আয়োজন করা হয়েছিল। শত চণ্ডী পাঠ, পূজা এবং হোম ও প্রতিদিন প্রাতে হত। ৭ ই মে বুদ্ধ পূর্ণিমার দিন স্থানীয় মন্দির সমূহে বিশেষ পূজা ও ১০৮ কুমারী পূজা, ভোজন, দরিদ্র নারায়ণ সেবা ও কুষ্ঠ হাসপাতালে রোগীদের প্রসাদ বিতরণ করা হয়।

আনন্দ জ্যোতি পীঠমে প্রতিদিন এক এক দেবতার মাতৃরূপে সহস্রার্চন পূজা করানো হয়। যেমন শ্রী গণেশজীর রুলী ও চাল দিয়ে;শ্রী গুরুর বেলী ও অন্য সুগন্ধিত পুষ্প দিয়ে — এইরূপে সূর্য্য, বিষ্ণু, শিব, দুর্গা, মা কালীর বস্ত্র, রুমাল, ফল, শুকনা ফল, মিষ্টি, দীপ ও দক্ষিণা দিয়ে প্রায় সকল দেবদেবীর সহস্রার্চন সুসম্পন্ন হয়। প্রতিদিন ষোড়শোপচারে পূজার পর আরতি ও পাদুকা অভিষেকও সম্পন্ন হত।

আগামী ৫ই জুলাই গুরুপূর্ণিমার দিন বিশেষ পূজা অনুষ্ঠিত হবে।

২। বারাণসী —

গত ৩০ শে মার্চ ষষ্ঠী হতে ৩রা এপ্রিল দশমী পর্যন্ত ৫৭ তম শ্রীশ্রী বাসন্তী পূজা চণ্ডী মণ্ডপে একই বেদীর উপর সুষ্ঠুভাবে সুসম্পন্ন হয়েছে। বাঁকুড়া হতে আগত ঢাকীদের ঢাকবাদনে পঞ্চমীর দিন থেকেই আশ্রম উৎসব মুখর হয়ে ওঠে। এবার বাসন্তী পূজা উপলক্ষ্যে কলকাতা, পাটনা, দিল্লী, প্রভৃতি স্থান হতে প্রচুর ভক্ত সমাগম হয়।

সম্পূর্ণ নবরাত্রিতে কনখলের মহানির্ব্বানী আখাড়ার বরিষ্ঠ মহন্ত স্বামী গিরিধর নারায়ণ পুরীজীর আশ্রমে উপস্থিতিতে সকলে বিশেষ প্রসন্নতা লাভ করেন।

১ লা এপ্রিল মহাষ্টমীর দিন আশ্রমের শ্রীশ্রী মা অন্নপূর্ণা মন্দিরে বিশেষ পূজা ও ভোগের আয়োজন করা হয়েছিল।

পূজার কয়দিন বিকালে দেবী ভাগবত পাঠ হত। নবমীর দিন কাশীর বিশ্রুত পণ্ডিত ডঃ বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয় দেবী মাহাত্ম্য সম্বন্ধে বিশদরূপে আলোচনা করেন।

প্রতিদিন সন্ধ্যা কীর্তনের পর কাশীর স্বনামধন্য সংগীত শিল্পী ও কন্যাপীঠের প্রাক্তন প্রধান অধ্যাপক স্বর্গীয় শ্রী ভাণ্ডারকরজীর পৌত্রী কুমারী রেবতী সাবলকর সুমধুর কণ্ঠে ভাবময় সংগীত পরিবেশন করে সকলকে মুগ্ধ করেন। এই উপলক্ষ্যে কন্যাপীঠের সংগীত অধ্যাপিকা কুমারী আরাধনা মিশ্র ও শ্রীমতী মনোরমা সরীন ও ভাবপূর্ণ সঙ্গীতের দ্বারা সকলকে আনন্দ দেন এবং সঙ্গত করেন কাশীর প্রসিদ্ধ তবলাবাদক পণ্ডিত ঈশ্বরলাল মিশ্র।

কাশীর বর্তমান মহারাজা শ্রী অনন্তনারায়ণ সিংহজী ও মহারাজ কুমারীরা প্রায়ই সন্ধ্যা আরতিতে যোগদান করতেন এবং দশমীর দিন প্রাতে দর্পণ বিসর্জণের সময়েও তাঁরা উপস্থিত ছিলেন।

২ রা এপ্রিল রামনবমীর দিন শ্রীরামের বিশেষ পূজার সময় স্বামী ভজনানন্দজীর (পুষ্পদির) মধুর ভজনে একটি ভাবপূর্ণ পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছিল। এই পুণ্যময় ক্ষণে বারাণসীর কমিশনার শ্রীমনোজকুমারজী উপস্থিত ছিলেন।

পরদিন ৩রা এপ্রিল সন্ধ্যায় প্রতিমা বিসর্জণের পর বয়োবৃদ্ধ মহন্ত শ্রী গিরিধরনারায়ণ পুরীজীর দ্বারা প্রসাদী মিষ্টি বিতরণের সঙ্গে উৎসব সমাপ্ত হয়।

গত ১৩ই এপ্রিল চৈত্র সংক্রান্তিতে শ্রীশ্রী স্বামী মুক্তানন্দ গিরিজীর সন্ন্যাস উৎসব উপলক্ষ্যে ষোড়শোপচারে পূজা ও সাধু ভাণ্ডারা সম্পন্ন হয়।

১৪ই এপ্রিল নববর্ষের দিন মায়ের মন্দিরে মার ষোড়শোপচারে পূজার আয়োজন হয়েছিল। ২৬ শে এপ্রিল অক্ষয় তৃতীয়ার পূণ্যতিথিতে আনন্দজ্যোতি মন্দিরের প্রতিষ্ঠা উপলক্ষ্যে শ্রীশ্রী মা, গোপালজী, যোগমায়া ও গিরিজীর ষোড়শোপচারে পূজা, কীর্তন ও সাধু ভাণ্ডারা সুসম্পন্ন হয়েছিল।

১লা মে বাবা ভোলানাথের তিরোধান তিথি উপলক্ষ্যে বাবা ভোলানাথের ষোড়শোপচারে পূজা হয়েছে।

২রা মে শ্রীশ্রী মার জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে সকাল থেকেই পূজার আয়োজন আরম্ভ হয়। মায়ের মন্দিরে চণ্ডীর ঘট বসল। পূজারী শ্রী ভোলানাথ ভট্টাচার্য্য চণ্ডীর পূজা করে চণ্ডীপাঠ আরম্ভ করলেন। ভোগ হল। রাত্রিবেলা মন্দির সাজানো আরম্ভ হয়। ঠিক ভোর ৩টার সময়ে পবিত্র ব্রাহ্মমুহূর্তে মায়ের আবির্ভাবের পূণ্য ক্ষণে শঙ্খ বেজে উঠল। পূজার আসনে বসে ব্রহ্মচাররিণী জয়া ভট্টাচার্য্য পূজা আরম্ভ করেন। যথা সময়ে কীর্তন, ধ্যান, বেদ পাঠও পূজা শেষে কুমারী পূজাও আরতির পর ঊষা কীর্তন আরম্ভ হয়।

৩রা মে মধ্যাহ্নে পূজা, ভোগ ও আরতির পর ৪৮ জন সন্ন্যাসীকে ভোজন, বস্ত্র ও দক্ষিণা সহ আপ্যায়িত করা হয়।

৩রা হতে ১১ ই মে পর্য্যন্ত প্রতিদিন সকালে মঙ্গল আরতি, উষা কীর্তন, মায়ের বিশেষ পূজা, বেদপাঠ, গীতা ও চণ্ডী পাঠ, ভোগ এবং বিকালে পাঠ ও সন্ধ্যায় মায়ের আরতি, সান্ধ্য কীর্তন, ভজন প্রভৃতি সব কন্যাপীঠের ব্রহ্মচারিনীরাই সুন্দরভাবে সম্পন্ন করেছে। ঐ সঙ্গে চণ্ডীমন্ডপে অখণ্ড জপ চলত।

১০ ই মে মায়ের তিথিপূজার দিন সন্ধ্যাবেলায় ১১ জন ব্রহ্মচারিণী মাতৃ নামাঙ্কিত নামাবলী পরে মায়ের

আরতি করে। সেই সময়ের দৃশ্য বিশেষ দর্শনীয় হয়েছিল।

দুপুরে চণ্ডীপাঠের পর হোম এবং চণ্ডী পাঠের পূর্ণাহুতি হয়।

এদিন রাত্রিবেলা বেলী ফুলের মালা দিয়ে মন্দিরের ভিতরে খুব সুন্দর করে সাজানো হয়। বাইরে মন্দিরের মুখ্য দ্বারও নানা রকম ফুলের মালা ও আমপাতা দিয়ে এবং দরজার সামনে রঙ্গোলী দিয়ে খুব সুন্দর সাজানো হয়েছিল। রঙ্গোলীর মাঝখানে বিরাট প্রদীপে মায়ের জন্মবর্ষ হিসাবে ১০৬টি দীপ জ্বালানো হয়। পূজার সময়ে মায়ের মন্দিরের মনোরম সাজে সকলেই আনন্দিত।

ঠিক ৩টার সময়ে ব্রাহ্ম মুহূর্তে শ্রীশ্রী মায়ের আবির্ভাবের পুণ্য ক্ষণে পূজা আরম্ভ হয়। পূজার সময়ে এক বিশেষভাবের সৃষ্টি হয়েছিল। যথারীতি কীর্তন, ধ্যান, বেদপাঠ ইত্যাদিও হয়। পূজান্তে সকলে মায়ের চরণে অঞ্জলি দিলেন।

পরদিন সকালে পূজার পর মাতা আনন্দময়ী হাসপাতালে রোগীদের ফল ও বাতাসা বিতরণ করা হয়। এদিকে রাজভোগের আয়োজন হতে লাগল। কন্যাপীঠের মেয়েদের দ্বারা বানানো নানারকমের মিষ্ঠি, মা যা যা খেতেন এবং অন্য বহুবিধ ব্যঞ্জন রান্না করে ১২টার মধ্যে মায়ের ভোগ দেওয়া হয়। ভোগের সময়ও ১০৬টি দীপ জ্বালানো হয়। কীর্তন, ভোগারতির পর সকলে প্রসাদ নিলেন। কোন একজন বিশিষ্ট পুরাতন মাতৃভক্ত বললেন, "অন্যত্রও মায়ের পূজা হয়। কিন্তু কাশীতে মা ভোগ নিতে আসেন।"

উৎসবের সময় প্রায় সকলেরই মায়ের সাক্ষাৎ উপস্থিতির অনুভূতি হয়েছিল।

১ লা জুন গঙ্গদশহরা উপলক্ষ্যে মা গঙ্গার বিশেষ পূজা হয়। আগামী ৫ই জুলাই গুরুপূর্ণিমা উপলক্ষ্যে শ্রীশ্রী মায়ের ও শ্রীশ্রী গিরিজীর বিশেষ পূজা অনুষ্ঠিত হবে।

৩। *আগরতলা* —

ত্রিপুরার রাজধানী আগরতলার সুরম্য পরিবেশে অবস্থিত আশ্রমে শ্রীশ্রী মায়ের শুভ আবির্ভাব মহোৎসব সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই উপলক্ষ্যে ২রা মে সকাল ৯টা থেকে শ্রীশ্রীমায়ের বিশেষ পূজা অনুষ্ঠিত হয় এবং সন্ধ্যায় আশ্রমের নাট মন্দিরে সৎসঙ্গের আয়োজন করা হয়েছিল।

১০ই মে সন্ধ্যায় মায়ের মন্দিরে সন্ধ্যারতি মাধ্যমে শ্রীশ্রী মায়ের আবাহন এবং রাত্রি ১২টা থেকে নাট মন্দিরে ভজন কীর্তনের আয়োজন করা হয়েছিল। রাত্রি ৩টা হতে মন্দিরে শ্রীশ্রীমায়ের বিশেষ পূজা আরম্ভ হয় এবং নাট মন্দিরে প্রভাতী অনুষ্ঠানে স্থানীয় অনেক ভক্ত যোগদান করেন। ভোর ৫টা হতে সন্ধ্যা ৬টা পর্য্যন্ত নাট মন্দিরে উদয়াস্ত কীর্তনের আয়োজন করা হয়। দ্বিপ্রহরে মাতৃপূজা ও ভোগের পর ভক্তদের প্রসাদ বিতরণ করা হয়। দরিদ্রনারায়ণদেরও বস্ত্র বিতরণ করা হয়েছে।

৪। *আগরপাড়া* —

গত ডিসেম্বর মাসের শেষে গঙ্গাতটে আগরপাড়া আশ্রমে বার্ষিক "নামযজ্ঞ" অনুষ্ঠান সুচারুরূপে সম্পন্ন হয়েছিল। এই উপলক্ষ্যে বহুভক্তের সমাবেশ হয় এবং সকলকে অন্নপ্রসাদ বিতরণ করা হয়েছিল।

আশ্রমের মনোরম পরিবেশে শ্রীশ্রী সরস্বতী পূজা, শিবরাত্রি ব্রত ও দোল পূর্ণিমা উৎসব এবং চৈত্র সংক্রান্তিতে

স্বামী মুক্তানন্দগিরিজীর সন্ন্যাস উৎসব সুন্দরভাবে অনুষ্ঠিত হয়েছে। ব্রহ্মচারী নির্বাণানন্দজীর উপস্থিতিতে গত জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী মাসে বহুভক্ত আশ্রমে দীক্ষা লাভ করেন।

শ্রীশ্রী মায়ের জন্মোৎসব এবং বুদ্ধ পূর্ণিমাতে ধ্যানপীঠে মাতৃমূর্তি প্রতিষ্ঠা দিবস আদি বিভিন্ন অনুষ্ঠান সুচারু রূপে সম্পন্ন হয়। ১০ই মে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার নির্বাচন থাকা সত্ত্বেও শ্রীশ্রীমার জন্মতিথি পূজা উপলক্ষ্যে রাত্রে বহুভক্তের সমাগম হয়। স্থানীয় শিল্পীরা বিশেষ করে গীতশ্রী ছবি বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি এবং পরিশেষে শ্রীতন্ময়ানন্দ মহারাজের ভজন কীর্তনে আশ্রম পরিবেশ মুখরিত হয়ে ওঠে। ১০ই ও ১১ই মে প্রাতে স্বামী নির্মলানন্দজীর সুললিত মাতৃকথায় ভক্তরা বিশেষ আনন্দ লাভ করেন। প্রায় ১২০০ ভক্তরা অন্নপ্রসাদ গ্রহণ করেন।

৫। উত্তরকাশী —

প্রাকৃতিক সুষমায় মণ্ডিত হিমালয়ের অভ্যন্তরে অবস্থিত সুদূর উত্তরকাশী আশ্রমেও শ্রীশ্রী মায়ের শুভ জয়ন্তী মহোৎসব উপলক্ষ্যে ১০ ই মে বিকাল হতে ভজন-কীর্তন আরম্ভ হয়ে রাত ২টো অবধি চলে। পরে শ্রীশ্রী মার পূজা আরম্ভ হয়। কুমারী পূজা, হোমও হয়।

পরদিন সকাল ৯টা হতে সাধু ভাণ্ডারা আরম্ভ হয় এবং তারপর ভক্তদের প্রসাদ বিতরণ করা হয়।

৬। জামশেদপুর

জামশেদপুরে শ্রীশ্রীমায়ের আশ্রমে ১৩ই এপ্রিল শ্রীশ্রী ১০৮ স্বামী মুক্তানন্দ গিরিজী মহারাজের সন্ন্যাস উৎসব উপলক্ষ্যে গিরিজীর বিশেষ পূজা, বিকালে সান্ধ্য নাম কীর্তন ও আরতি হয়। তারপর সমবেত ভক্তবৃন্দের ভক্তিমূলক গান ও ভজন পরিবেশন করা হয়।

গত ২৬ শে এপ্রিল অক্ষয় তৃতীয়ার পুণ্যলগ্নে মূর্তি প্রতিষ্ঠা উপলক্ষ্যে সকালে শ্রীশ্রীমায়ের বিশেষ পূজা, ভোগ ও আরতি হয়। এই উপলক্ষ্যে ভজন, কীর্তন আদিও হয়।

১লা মে বাবা ভোলানাথের তিরোধান তিথি উপলক্ষ্যে বাবা ভোলানাথের বিশেষ পূজা, সান্ধ্যনাম কীর্তন, আরতি, ভজন প্রভৃতি হয়েছিল।

২রা মে শ্রীশ্রী মায়ের শুভ জন্মদিবসে শ্রীশ্রীমায়ের বিশেষ পূজা, নাম কীর্তন, আরতি ও মাতৃনাম গান প্রভৃতি হয়। ১০ ই মে শ্রীশ্রীমায়ের আবির্ভাব তিথি উপলক্ষ্যে সন্ধ্যা বেলা সান্ধ্য নাম কীর্তন ও আরতির পর অধিবাস, পূজা ও আরতি হয়। ১১ই মে প্রাতে শ্রীশ্রীমায়ের বিশেষ পূজা ও মঙ্গলারতি হয়। সূর্য্যোদয় হতে সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত অখণ্ড 'জয়মা' নাম কীর্তন হয়। স্থানীয় বহু শিল্পী ও সমবেত ভক্তবৃন্দ কীর্তন, ভজন, ভক্তিমূলক গান প্রভৃতি পরিবেশন করেন। মধ্যাহ্নে দরিদ্র নারায়ণ সেবা ও প্রসাদ বিতরণ করা হয়। অখণ্ড নাম কীর্তন, সান্ধ্য কীর্তন আরতি ও প্রণাম মন্ত্রের সঙ্গে উৎসবের পূর্ণাহুতি হয়।

৭। ডিব্রুগড় (আসাম) —

ভারতের পূর্বোত্তর অঞ্চলে আসামে অবস্থিত শ্রীশ্রী মায়ের একমাত্র এই আশ্রমে মায়ের শুভ জন্মজয়ন্তী উপলক্ষ্যে ২রা মে হতে ১০ই মে পর্য্যন্ত প্রতিদিন প্রাতে শ্রীশ্রীমায়ের পূজা, সম্পূর্ণ চণ্ডী পাঠ, সম্পূর্ণ গীতা পাঠ, মধ্যাহ্নে পূজা, আরতি এবং সন্ধ্যায় আরতি ও কীর্তন হয়েছে।

১০ই মে সন্ধ্যা হতে মাতৃ লীলা দর্শন, মাতৃপ্রসঙ্গ আলোচনা, ভজন ও সমবেত মাতৃ নাম গান চলতে থাকে। মায়ের শুভ জন্মতিথি লগ্নে শেষ রাত্রি ৩টায় বিশেষ পূজা, হোম, পুষ্পাঞ্জলির পর সকলকে ফল ও মিষ্টি বিতরণ করা হয়। পরদিন প্রাতে মায়ের পূজা ও গীতা চণ্ডীপাঠ এবং মধ্যাহ্নে ভোগ, আরতি ও কীর্তনের পর প্রসাদ বিতরণ করা হয়।

৮। তারাপীঠ —

ভারতের একটি সুপ্রসিদ্ধ শক্তিপীঠ তারাপীঠে শ্রীশ্রীমায়ের আশ্রমে গত ২৪ শে মাঘ, ১৪০৭ (ইং ৭ই ফেব্রুয়ারী, ২০০১) পূণ্য মাঘী পূর্ণিমা তিথিতে শ্রীশ্রী মায়ের ষোড়শোপচারে পূজা ও বাৎসরিক উৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই উৎসব উপলক্ষ্যে ৭ ই সন্ধ্যাবেলায় অধিবাস ও আরতির পর স্বামী নির্মলানন্দজী সৎসঙ্গ করেন এবং মাতৃ উপদেশাবলী আলোচিত হয়। পরে সমবেত ভক্তদের ভক্তিগীতি পরিবেশনের পর বিখ্যাত কীর্তনীয়া শ্রীমতী অনিতা মুখোপাধ্যায় লীলা কীর্তন পরিবেশন করেন। স্থানীয় ও বহিরাগত অনেক ভক্তবৃন্দের সমাগম হয়।

পরদিন প্রাতে স্থানীয় মন্দির সমূহে পূজা, নগরভ্রমণ, কীর্তন এবং শিব মন্দিরে বেদ পাঠ ও রুদ্রাভিষেক এবং মধ্যাহ্নে সাধু ভাণ্ডারা ও নরনারায়ণের সেবার আয়োজন করা হয়েছিল। সন্ধ্যায় ভক্তিগীতি ও সৎসঙ্গ পর মিলনোৎসবের সমাপ্তি হয়।

৯। দেরাদুন —

দেরাদুনে কল্যাণবনে রাম মন্দিরে গত ১লা এপ্রিল 'গীতা সৎসঙ্গ' অনুষ্ঠিত হয়। সৎসঙ্গের পরে সকলে প্রসাদ গ্রহণ করেন।

২রা এপ্রিল রাম নবমীর দিন রাম মন্দিরে শ্রীরামচন্দ্রের বিশেষ পূজা ও অখণ্ড রামায়ণ পাঠ হয়। সেদিন প্রায় ৫০০ জন ভক্ত প্রসাদ গ্রহণ করেন।

২রা মে হতে ১১ই মে পর্যন্ত কিশণপুর আশ্রমে শ্রীশ্রীমায়ের জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে মায়ের বিশেষ পূজা, কীর্তন, ভজন, প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়েছে।

১০। পুণা —

স্বাস্থ্যকর জলবায়ুর জন্য প্রসিদ্ধ পুণা শহরে অবস্থিত শ্রীশ্রীমায়ের আশ্রমেও শ্রীশ্রী মায়ের শুভ জয়ন্তী মহোৎসব সুন্দরভাবে উদ্‌যাপিত হয়েছে। এই উপলক্ষ্যে ২রা মে ভোর ৩টায় শ্রীশ্রীমায়ের বিশেষ পূজা এবং পরদিন মধ্যাহ্নে ভোগ, আরতি ও প্রসাদ বিতরণ ও দরিদ্রনারায়ণ সেবা হয়।

১১ ই মে ভোর ৩টায় ও শ্রীশ্রী মায়ের বিশেষ পূজা পুনরায় অনুষ্ঠিত হয়। সেদিন সন্ধ্যা থেকে আরতি সান্ধ্য কীর্তন, ভিডিয়ো প্রদর্শন এবং ৩টায় শ্রীশ্রী মায়ের বিশেষ পূজা অনুষ্ঠিত হয়। প্রাতে গীতা, চণ্ডী পাঠ, সৎসঙ্গ , কীর্তন, হোম, মধ্যাহ্নে ভোগ আরতি, মহাপ্রসাদ গ্রহণ ও দরিদ্রনারায়ণ সেবা হয়।

১১। ভোপাল —

মনোরম তালের (সরোবরের) জন্য বিশেষ দর্শনীয় নগরী ভোপালে অবস্থিত মায়ের আশ্রমে গত ২রা মে হতে ১১ই মে শ্রী শ্রী মায়ের শুভ জয়ন্তী মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই উপলক্ষ্যে শ্রীশ্রী মায়ের বিশেষ পূজা,

ভজন, কীর্তন ও প্রসাদ বিতরণ করা হয়।

৩রা মে ১০৮ কুমারী পূজা হয়। ১০ ই মে রাত্রি ৩টায় শ্রীশ্রী মায়ের বিশেষ তিথি পূজা, ভজন, কীর্তন প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়। পরদিন সকলে প্রসাদ গ্রহণ করেন।

১২। *ভীমপুরা —*

গুজরাটের ভূকম্প পীড়িত জনতার করুণকাহিনী বিশ্ববাসীকে স্তব্ধ করে দিয়েছে। অসংখ্য জনতা অকস্মাৎ কালের করাল করলে পতিত হয়। এই প্রাকৃতিক বিপর্য্যয়ে প্রয়াত জ্ঞাত ও অজ্ঞাত শত শত লোকের সদ্‌গতির জন্য গত ৬ই ফেব্রুয়ারী আশ্রমের পক্ষ হতে নর্মদার তটে সামূহিক রূপে তর্পণের আয়োজন করা হয়েছিল।

শ্রীশ্রী মায়ের শুভ জন্ম জয়ন্তী মহোৎসব উপলক্ষ্যে ১১ ই মে ভোর ৩টার সময় শ্রীশ্রী মায়ের বিশেষ পূজা অনুষ্ঠিত হয়। পরদিন ভোগ, আরতি, হোম প্রভৃতির পরে সকলে প্রসাদ গ্রহণ করেন।

১৩। *রাঁচী —*

প্রতি বৎসরের মত এবারও রাঁচী আশ্রমে শ্রীশ্রী ১০৮ স্বামী মুক্তানন্দগিরিজীর সন্ন্যাস উৎসব উপলক্ষে ১৩ই এপ্রিল গিরিজীর বিশেষ পূজা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

শ্রীশ্রী মায়ের শুভ জন্মোৎসব ২রা মে ভোর ৩টায় শ্রীশ্রী মায়ের বিশেষ পূজা হয়। ১০ই মে প্রাতঃ ৫টা হতে রাত্রি ৩টা পর্য্যন্ত অখণ্ড জপ, চণ্ডীপাঠ ও আশ্রমস্থ সকল মন্দিরে বিশেষ পূজা দেওয়া হয়। হাসপাতালে রোগীদের প্রসাদ ও বিতরণ করা হয়। রাত্রি ৯ টা হতে ভোর ৩টা পর্যন্ত ভজন, কীর্তন এবং তারপর শ্রীশ্রীমায়ের বিশেষ পূজা, কুমারী পূজা, হোম আদি ভালভাবে হয়। পরদিন প্রাতে ১০টা হতে ১ টা পর্য্যন্ত গীতা ও চণ্ডী পাঠ, সৎসঙ্গ, প্রবচন ও কীর্তন হয়। ভোগ আরতির পর প্রসাদ বিতরণ ও দরিদ্রনারায়ণ সেবা হয়।



বিশেষ ঃ শ্রীশ্রী মায়ের বিভিন্ন আশ্রমেই বৎসরে নানা উৎসবাদি সর্বদা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে বিভিন্ন আশ্রমের কর্ত্তৃপক্ষরা নিয়মিতভাবে বিবরণ আদি আমাদের না পাঠানোর জন্য পত্রিকায় যথাযথভাবে বিবরণ প্রকাশে আমরা অসমর্থ। স্থানীয় সকল ভক্তবৃন্দের নিকট তাই আমরা ক্ষমাপ্রার্থী।

— সম্পাদক

শ্রদ্ধাঞ্জলি

রেণুকা মুখার্জ্জী —

মাতৃচরণাশ্রিতা মাতৃলীলা সহচারিণী মাতৃপাদপদ্মরেণুসমা রেণুকা মুখার্জ্জী এলাহাবাদে স্বীয় বাসভবনে গত ৩০ শে মে, ২০০১ সজ্ঞানে মাতৃনাম জপ করতে করতে মাতৃচরণে চিরতরে লীন হয়েছেন।

শ্রীশ্রীমায়ের দুর্নিবার আকর্ষণে অনেক সম্ভ্রান্ত পরিবারের কিশোর কিশোরীরা নিজ পরিবারের স্নেহডোর ছিন্ন করে শ্রীশ্রী মায়ের স্নেহসুশীতল চরণপ্রান্তে এসে উপনীত হন এবং পরে শ্রীশ্রী মায়ের একান্ত লীলা পার্ষদ রূপে চিহ্নিত হন। এঁদের মধ্যে রেণুদি ছিলেন অনন্যা, শ্রীশ্রীমায়ের স্নেহধন্যা কন্যা।

রেণুদি স্বীয় জনক, জননী, ভ্রাতা, ভগিনী সহ বেরেলীতে ১৯৩৭ সনে সর্বপ্রথম মায়ের দর্শন লাভে ধন্য হন। নীরজনাথ মুখোপাধ্যায়, মায়ের নিষ্ঠাবান ভক্ত স্বনামধন্য ডিস্ট্রিক্ট জজের জ্যেষ্ঠা কন্যা ছিলেন রেণুদি। রেণুদির মা সুকবিয়ত্রী, ধীর, স্থির, অসামান্যা ভক্তিমতী মহিলা ছিলেন। এই পরিবারের সকলেই ছিলেন শ্রদ্ধেয় ভাইজী ও। বাবা ভোলানাথের বিশেষ কৃপাপাত্র।

অল্পবয়স হতেই শ্রীশ্রীমায়ের বিশেষ খেয়াল ও ভাইজী ও বাবা ভোলানাথের নির্দেশে রেণুদি মায়ের সেবায় লেগে যান। সেবার কাজে তাঁর বিশেষ রুচি ও দক্ষতা ছিল.

কাশীতে আশ্রম তখন সদ্য নির্মিত হচ্ছে। ১৯৪৪ সনের গোড়ার দিকের কথা। রেণুদি তখন মাতৃনির্দেশে আরোও কয়েকজন ব্রহ্মচারিণী সহ আশ্রমে বাস করতেন। নিজের জপ, ধ্যান ও প্রয়োজনানুসারে গুরুপ্রিয়া দিদির সঙ্গে ভোগপাক ও আশ্রমের যাবতীয় কাজে সহযোগিতা করতেন। কাশীর নতুন আশ্রমে ১৯৪৫ সনে কন্যাপীঠ আসার পর তিনি কন্যাপীঠের মেয়েদের দেখাশোনা ও অধ্যাপনার ভার গ্রহণ করেন।

কাশীতে ১৯৪৭-৫০ সনে অখণ্ড সাবিত্রী মহাযজ্ঞের সময় রেণুদি যজ্ঞের নানা সেবায় — যজ্ঞমণ্ডপ সাজানো, পতাকা ইত্যাদিতে চিত্রাঙ্কন ও সূচীশিল্পের কাজ প্রভৃতিতে বিশেষ ব্যাপৃত হয়ে পড়েন। অতিথি সেবার কাজেও তিনি অতিশয় নিপুণ ছিলেন।

শৈশব হতেই রেণুদির চিত্রাঙ্কনে বিশেষ দক্ষতা ছিল। তাঁর অঙ্কিত হর-পার্ব্বতীর চিত্র বিশেষ খ্যাতি লাভ করে। আজও কন্যাপীঠে শ্রীশ্রীমায়ের ঘরে ধ্যানরত ভগবান বুদ্ধ ও ক্ষীর হাতে প্রণতা সুজাতার চিত্র মায়ের ঘরের শোভাবৃদ্ধি করছে।

দীর্ঘদিন রেণুদি কন্যাপীঠের সেবায় ব্রতী ছিলেন। ১৯৫৪ সনে শ্রদ্ধেয়া গুরুপ্রিয়াদিদি অসুস্থ হওয়ার পর হতে মাতৃনির্দেশে তিনি দিদির সেবার ভার গ্রহণ করেন, কখনও স্বামী পরমানন্দজীরও খাওয়া দাওয়া দেখতেন। সুযোগমত মায়ের সঙ্গে সঙ্গে থেকে অতিথি সেবাতেও ব্রতী হতেন।

পরবর্তীকালে শারীরিক অসুস্থতার জন্য রেণুদি এলাহাবাদে নিজেদের বাসভবনে নিজস্ব জপ, ধ্যান ও নিজের মায়েরও সেবা নিয়েই ছিলেন।

এলাহাবাদের এই বাসভবনেরও একটি স্বতন্ত্র ইতিহাস আছে। শ্রীশ্রী মায়ের আশ্রমের সঙ্গে এই বাড়ীর এক অক্ষুণ্ণ সম্বন্ধ ছিল। বাগানের মধ্যে স্বতন্ত্র রূপে শ্রীশ্রী মায়ের অবস্থানের জন্য একটি স্বতন্ত্র বাড়ী বানানো হয়

এবং চারপাশের সুবিস্তৃত জমিতে ফল, ফুল, তরকারী ইত্যাদির প্রচুর গাছ লাগানো হয়। রেণুদি নিজের মায়ের সেবার পর অবসর সময়ে এই বাগানের দেখাশুনা করতেন।

শ্রীশ্রীমায়ের এইখানে বহুবার পদার্পন হয়েছে। বিশেষত প্রয়াগে কুম্ভের পূর্বে ও পরে মা এখানে এসে বিশ্রাম করতেন। তখন সম্পূর্ণ বাড়ীটিই আশ্রমে পরিণত হত। আশ্রমবাসীরাও মায়ের সঙ্গে এসে এই বাড়ীতেই বাস করতেন। তখন রেণুদি ও পরিবারের সকলেই শ্রীশ্রীমা ও আশ্রমবাসীদের সেবাযত্নে তৎপর হয়ে উঠতেন। এই বাড়ীতে ১৯৬১ সনে শ্রীশ্রী মায়ের জন্মোৎসবও অনুষ্ঠিত হয়। তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহেরুজী ও শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী মাতৃদর্শনে এই বাড়ীতেই আসেন।

কাশীর কন্যাপীঠের মেয়েরাও গ্রীষ্মাবকাশে একবার একমাস এই বাড়ীতে থেকে গিয়েছে। রেণুদি সকলের খাওয়া দাওয়া, খোঁজ খবর, আদর আপ্যায়ন ইত্যাদি এবং সম্পূর্ণ বাড়ীর তত্ত্বাবধান শেষ নিঃশ্বাস অবধি করে গেছেন।

অল্প কিছুদিন আগের কথা। ধূপকাঠি জ্বালিয়ে রেণুদি জপ করছেন। ধূপ কাঠির আগুন নিভাতে ভুলে গেছেন। এদিকে কি করে বেকায়দায় কাপড়ে আগুন লেগে গেছে, রেণুদি বুঝতে পারেননি। যখন বুঝেছেন তখন অনেক দেবরী হয়ে গেছে। শরীরের অনেক অংশই পুরে গেছে। সঙ্গে সঙ্গে রেণুদিকে হাসপাতালে ভর্ত্তি করা হয়। হাসপাতাল থেকে কিছুটা সুস্থ হয়ে রেণুদি বাড়ী ফিরে আসেন। তার কয়েকদিন পরেই ৩০ শে মে রাত সাড়ে নটা নাগাদ জপ করতে করতে মায়ের চরণরেণু মাতৃচরণে চিরতরে লীন হন। কাশীতে কন্যাপীঠের মেয়েরা সংবাদ পাওয়ার পরই গীতা পাঠ ও কীর্তন আরম্ভ করে দেয়। কন্যাপীঠের কয়েকজন পরদিন ভোরে এলাহাবাদ রওনা হয়ে যায়। তখনও রেণুদির শরীর রাখা ছিল। মেয়েরা রেণুদিকে প্রসাদী মালা, চন্দন, ভস্ম, নামাবলী ইত্যাদি দিয়ে সাজিয়ে কীর্তন করে।

একটি শুদ্ধ পবিত্র জীবনের মহাযাত্রা এইরূপে পূর্ণ হল। রেণুদির একমাত্র কনিষ্ঠা ভগিনী বীথিকা মুখার্জী (বীথুদির) মুখে শোনা যায় যে রেণুদির গুপ্তভাবে সন্ন্যাসও হয়েছিল। তাই সাধুদের প্রথা ানুসারে ১৬ দিনের দিন রেণুদির জন্য কাশী আশ্রমে মহাধূমধামে শিবপূজা, কীর্তন ও ১৬ জন সাধুকে বস্ত্র, উত্তরীয়, আসন, রুদ্রাক্ষের মালা, ফল ও দক্ষিণা সহ বিশেষ পরিতৃপ্তি সহকারে ভোজন করানো হয়। সব কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়।

আমরা রেণুদিকে লেখা তাঁর নিজের মায়ের একটি কবিতা দিয়েই তাঁকে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পন করছি—

"মায়ের শরণ যে নিয়েছে
তারত ভয় কেটে গেছে।
জন্মমৃত্যু কি ভয় তারে
দেখাবে আর ঘুরে ফিরে।
জয় মা জয় মা জয় মা বলে
ঝাঁপ দাও ঐ অভয় কোলে।
"ভয় নাই, মোর চরণ রেণু"
বলে মাত দাঁড়িয়ে আছে।।"



শোক-সংবাদ

ডাঃ রসময় গাঙ্গুলী —

শ্রীশ্রীমায়ের পুরাতন ভক্ত অবসরপ্রাপ্ত ব্রিগেডিয়ার ডাঃ রসময় গাঙ্গুলী গত ১৪ই ফেব্রুয়ারী, ২০০১ সনে কলকাতায় ৮৩ বৎসর বয়সে সজ্ঞানে অমৃতধামে প্রয়াণ করেছেন।

ডাঃ গাঙ্গুলী কলকাতা মেডিকেল কলেজের অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র ছিলেন। তিনি সেখান হতে স্বর্ণপদক লাভ করেন এবং পরে ডাক্তার হিসাবে ভারতের সেনা বিভাগে কার্য্যভার গ্রহণ করেন। দেশবিদেশে তাঁর ডাক্তার হিসাবে যথেষ্ট সুনাম ছিল। বহু পুরস্কারে তিনি পুরস্কৃত হন। নিজের সহৃদয়পূর্ণ ব্যবহারের জন্য তিনি রোগীদের ও সকলের বিশেষ প্রিয় ছিলেন। তিনি পুণা আর্মি মেডিকেল কলেজের সার্জারী বিভাগের বিভাগাধ্যক্ষ রূপে অবসরগ্রহণ করেন এবং পরে পুণার "মেডিকেল ফাউন্ডেশন হসপিটালের" ডাইরেক্টর রূপেও নিযুক্ত ছিলেন।

আমরা তারঁ স্বর্গত আত্মার উর্দ্ধগতি কামনা করি। শ্রীশ্রী মায়ের চরণে প্রার্থনা জানাই তাঁর শোকসন্তপ্ত স্ত্রী ও পুত্রকন্যাদের শান্তি ও সান্ত্বনা লাভের জন্য।

শ্রীমতী সরমা মুখার্জ্জী —

দিল্লীর অতি পুরাতন ভক্ত কীর্তন-প্রেমী সরমাদি অল্প কিছুদিন হয় দিল্লীতে দেহরক্ষা করেছেন সংবাদ পাওয়া গিয়েছে। বিস্তৃত বিবরণ এখন পাওয়া যায়নি। আশা করা যায় আগামী সংখ্যাতে তাঁর সম্বন্ধে বিস্তারিত প্রকাশ করা সম্ভব হবে।



আগামী উৎসব সমূহ

(জুলাই — অক্টোবর, ২০০১)

১.	গুরু পূর্ণিমা	—	৫ ই জুলাই
২.	স্বামী মুক্তানন্দ গিরিজীর তিরোধান তিথি	—	২৭ শে জুলাই
৩.	স্বামী মৌনানন্দজী (ভাইজীর) তিরোধান তিথি	—	৩১ শে জুলাই
৪.	ঝুলন উৎসব	—	৩০ শে জুলাই হইতে ৩রা আগস্ট
৫.	জন্মাষ্ঠমী উৎসব	—	১১ই আগস্ট
৬.	দিদি গুরুপ্রিয়ার তিরোধান তিথি	—	২৫ শে আগষ্ট
৭.	ভাগবৎ জয়ন্তী	—	২৩ শে হইতে ৩০ শে আগষ্ট
৮.	স্বামী অখণ্ডানন্দজীর তিরোধান তিথি	—	২৪ শে সেপ্টেম্বর
৯.	শ্রীশ্রী শারদীয়া দুর্গাপূজা	—	২২ শে অক্টোবর হইতে ২৬ শে অক্টোবর

* * *

আবশ্যক সূচনা

অমৃতবার্তার সকল গ্রাহক / গ্রাহিকাদের বিশেষভাবে জানানো হচ্ছে যাঁরা বর্তমান বছরের চাঁদার টাকা এখনও পাঠাননি তাঁরা অবিলম্বে যদি টাকা না পাঠান তবে তাঁদের নিকট আর পত্রিকা পাঠান সম্ভব না।

বাৎসরিক চাঁদার টাকা না পাওয়া সত্ত্বেও সকলের কাছেই গত জানুয়ারী ও এপ্রিল সংখ্যা পাঠানো হয়েছে। আশা করি মাতৃভক্ত গ্রাহক / গ্রাহিকারা অবিলম্বে বর্তমান বছরের জন্য ৬০/- টাকা পাঠিয়ে নিয়মিত পত্রিকা পাঠাবার কাজে সহযোগিতা করবেন।

— কার্য্যকরী সম্পাদক

প্রখ্যাত সাহিত্যিক ডঃ বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য্য দ্বারা লিখিত কয়েকটি অমূল্য পুস্তক —

আনন্দময়ী মায়ের কথা — শ্রীশ্রী মার জন্ম শতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে প্রকাশিত অসংখ্য চিত্র সম্বলিত বিস্তারিত জীবন আলেখ্য। ভারতের রাষ্ট্রপতি মাননীয় ডঃ শঙ্করদয়াল শর্মার ভূমিকা সহ এক অনন্য-সাধারণ গ্রন্থ। রেক্সিন বাঁধাই। প্রকাশক — শ্রীশ্রী আনন্দময়ী সংঘ, কনখল, হরিদ্বার - ২৪৯ ৪০৮, মূল্য - ৩৫০/-টাকা।

গল্পে মা আনন্দময়ী বাণী — গল্পে ও কথায় শ্রীশ্রী মায়ের অমূল্য উপদেশ এবং এই মহাজীবনের বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে আলোচনা ও সংক্ষিপ্ত জীবনী সহ। প্রকাশক - ডি. এম. লাইব্রেরী, ৩২, বিধান সরণী, কলকাতা-৬। দুই খণ্ডে প্রকাশিত। বোর্ড বাঁধাই। মূল্য২৫/-টাকা ও ৪০/-টাকা।

অমৃতের আহ্বান — শ্রীশ্রী মায়ের বিশিষ্ট কিছু বাণীর বিষদ আলোচনা সহ অপূর্ব গ্রন্থ। প্রকাশিকা — শ্রীশ্রী মা আনন্দময়ী সৎসঙ্গ সম্মিলনীর পক্ষে শ্রীমতী অঞ্জলি ভট্টাচার্য্য। এ-বি ১৭৫, সল্টলেক, কলকাতা - ৬৪, সুন্দর প্রচ্ছদপট সহ বোর্ড বাঁধাই। মূল্য - ৫০/-টাকা।

তিন মায়ের কথা — মা সারদা, মা আনন্দময়ী ও শ্রী অরবিন্দ আশ্রমের "মাদারের" অমৃত-জীবনের বিভিন্ন দিক ও তাঁদের সাদৃশ্য সম্পর্কে এক অভিনব পুস্তক। প্রকাশক —সাহিত্য বিহার, ১ বি, মহেন্দ্র শ্রীমানী স্ট্রীট, কলকাতা-৯, বোর্ড বাঁধাই। মূল্য ৩৫/- টাকা। প্রাপ্তি স্থান ঃ সাহিত্য - বিহার ও ওরিয়েন্টাল বুক কোম্পানী। ৫৬ সূর্য্য সেন স্ট্রীট, কলকাতা - ৯।

প্রাপ্তিস্থান ঃ উপরোক্ত সব কয়টি পুস্তকই কলকাতায় স্থানীয় বিভিন্ন প্রকাশক অথবা শ্রীমতী অঞ্জলি ভট্টাচার্য্য, এ-বি ১৭৫, সল্টলেক, কলকাতা - ৬৪ এই ঠিকানায় উপলব্ধ।

❈ Branch Ashrams ❈

15. NEW DELHI : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, Kalkaji, New Delhi-110019 (Tel : 011-6826813)

16. PUNE : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, Ganesh Khind Road, Pune-411007, (Tel : 020-5537835)

17. PURI : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, Swargadwar, Puri-752001, Orissa.

18. RAJGIR : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, P.O. Rajgir, Nalanda-803116, Bihar (Tel : 06112-55362)

19. RANCHI : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, Main Road, P.O. Ranchi-834001, Bihar (Tel : 0651-312082)

20. TARAPEETH : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, P.O. Chandipur-Tarapeeth, Birbhum-731233, W.B.

21. UTTARKASHI : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, Kali Mandir, P.O. Uttarkashi-249193,

22. VARANASI : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, Bhadaini, Varanasi-221001, U.P. (Tel : 0542-310054+311794)

23. VINDHYACHAL : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, Ashtabhuja Hill, P.O. Vindhyachal, Mirzapur-231307, (Tel : 05442-42343)

24. VRINDAVAN : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, P.O. Vrindavan, Mathura-281121 U.P. (Tel: 0565-442024)

IN BANGLADESH :

1. DHAKA : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, 14, Siddheshwari Lane, Dhaka-17 (Tel : 405266)

2. KHEORA : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, P.O. Kheora, Via-Kasba, Brahmanbaria.



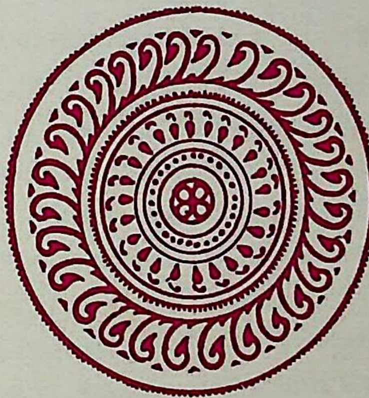
REGISTERED WITH THE REGISTRAR OF NEWSPAPERS
FOR INDIA AS NO. 65438/97



रत्ना ऑफसेट्स लिमिटेड कमच्छा, वाराणसी, फोन-३९२८२०

মা আনন্দময়ী

অমৃত বার্তা



VOL.-5 OCTOBER, 2001 NO. 4

SHREE SHREE ANANDAMAYEE SANGHA

❄ Branch Ashrams ❄

1. AGARPARA : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, P. O. Kamarhati, Calcutta-700058 (Tel : 033-5531208)
2. AGARTALA : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, Palace Compound, P.O. Agartala-799001. West Tripura (Tel : 0381-208618)
3. ALMORA : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, Patal Devi, P.O. Almora-263602, (Tel : 05962-33120)
4. ALMORA : Shree Shree Ma Anaudamayee Ashram, P.O. Dhaul-China, Almora-263881, (Tel : 05962-62013)
5. BHIMPURA : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, Bhimpura, P.O. Chandod, Baroda-391105, (Tel : 02663-833208
6. BHOPAL : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, P. O. Bairagarh, Bhopal-462030, M.P. (Tel : 0755-521227)
7. DEHRADUN : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, Kishenpur, P.O. Rajpur, Dehradun-248009 (Phone : 0135-734271)
8. DEHRADUN : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, Kalyanvan, 176, Rajpur Road, P.O. Rajpur, Dehradun-248009, (Phone : 0135-734471)
9. DEHRADUN : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram. P.O. Raipur Ordnance Factory, Dehradun-248010
10. DEHRADUN : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, 47/A Jakhan, P.O. Rajpur, Dehradun,
11. JAMSHEDPUR : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, Near Bhatia Park, Kadma, Jamshedpur-831005, Bihar
12. KANKHAL : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, P.O. Kankhal, Hardwar-249408, (Tel : 0133-416575)
13. KEDARNATH : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, Near Himlok, P.O. Kedarnath, Chamoli-246445,
14. NAIMISHARANYA : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, Puran Mandir, P.O. Naimisharanya, Sitapur-261402, U.P.

মা আনন্দময়ী — অমৃতবার্তা

শ্রীশ্রী মা আনন্দময়ীর দিব্য জীবন

ও

অমূল্যবাণী সম্বলিত ত্রৈমাসিক পত্রিকা

বর্ষ-৫ অক্টোবর, ২০০১ সংখ্যা-৪

❋

❋

বার্ষিক চাঁদা (ডাক ব্যয়সহ)

ভারতে - ৬০/- টাকা

বিদেশে - ১২ ডলার অথবা ৪৫০/- টাকা

প্রতি সংখ্যা - ২০/- টাকা

মুখ্য নিয়মাবলী

❋ ত্রৈমাসিক পত্রিকা বাংলা, হিন্দী, গুজরাতী ও ইংরাজী এই চার ভাষায় পৃথক পৃথকভাবে বৎসরে চারবার জানুয়ারী, এপ্রিল, জুলাই এবং অক্টোবর মাসে প্রকাশিত হইয়া থাকে। পত্রিকার বর্ষ জানুয়ারী সংখ্যা হইতে আরম্ভ হয়।

❋ প্রধানতঃ শ্রী শ্রী মায়ের দিব্য জীবন ও অমূল্যবাণী বিষয়ক প্রবন্ধাদি প্রকাশনই এই পত্রিকার মুখ্য উদ্দেশ্য। অবশ্য দেশ-কাল-ধর্ম্ম ও সম্প্রদায় নির্বিশেষে যে কোন আধ্যাত্মিক বা দার্শনিক হৃদয়গ্রাহী প্রবন্ধ এবং বিশিষ্ট মহাপুরুষদের জীবনী ও উপদেশ সম্বলিত লেখা সাদরে গৃহীত হইবে। নিতান্ত ব্যক্তিগত অনুভব ব্যতীত শ্রী শ্রী মায়ের দিব্যলীলা বিষয়ক লেখাও শ্রী শ্রীমায়ের অগণিত ভক্তবৃন্দের নিকট হইতে আশা করা যাইবে।

❋ প্রতিটি লেখা সাদা কাগজের এক পৃষ্ঠায় সুস্পষ্ঠ অক্ষরে লিখিত থাকা বিশেষ আবশ্যক। কোনও কারণবশতঃ লেখা পত্রিকায় প্রকাশিত না হইলে লেখকের নিকট ফেরৎ পাঠান অসুবিধাজনক।

❋ অগ্রিম বার্ষিক চাঁদা কেবলমাত্র মনি অর্ডার বা ডিমান্ড ড্রাফ্ট দ্বারা **"Shree Shree Anandamayee Sangha - Publication A/C"** এই নামে পাঠাইবার নিয়ম।

❋ পত্রিকা সম্পর্কিত যোগাযোগ নিম্নলিখিত ঠিকানায় করিতে হইবে —

Managing Editor,
Ma Anandamayee - Amrit Varta
Mata Anandamayee Ashram
Bhadaini, Varanasi - 221 001



পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিবার নিয়ম ঃ-
সম্পূর্ণ পৃষ্ঠা — ২০০০/- বাৎসরিক
অর্দ্ধেক পৃষ্ঠা — ১০০০/- ”
১/৪ পৃষ্ঠা — ৫০০/- ”

বিজ্ঞাপনের বিষয়বস্তু সহ অগ্রিম টাকা উপরোক্ত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

শ্রীশ্রী আনন্দময়ী সংঘের পক্ষে মুদ্রক ও প্রকাশক শ্রী পানু ব্রহ্মচারী দ্বারা শ্রী শ্রী আনন্দময়ী সংঘ, ভাদাইনী, বারাণসী - ২২১ ০০১ উঃপ্রদেশ হইতে প্রকাশিত এবং রত্না প্রিন্টিং ওয়ার্কস, বি ২১/৪২ কামাচ্ছা, বারাণসী - ১০ হইতে মুদ্রিত। সম্পাদক — শ্রী পানু ব্রহ্মচারী।

সূচী পত্র



প্রকাশন সূচী

শ্রীশ্রী আনন্দময়ী সংঘ দ্বারা প্রকাশিত শ্রীশ্রী মায়ের সম্পর্কে বাংলায় নিম্নলিখিত পুস্তক সমূহ শ্রীশ্রী মায়ের বিভিন্ন আশ্রমে উপলব্ধ আছে।

Pictorial Biography of Ma—শ্রীশ্রী মায়ের সমগ্র জীবন লেখা ও রেখায় উপস্থাপিত এক অনন্যসাধারণ গ্রন্থ। অতি উচ্চমানের কাগজে অসংখ্য চিত্র সহ মুদ্রিত। রেক্সিন বাঁধাই। বাংলা সংস্করণ। মূল্য ৩৫০/- টাকা।

আনন্দ-জ্যোতি (শতবার্ষিকী স্মারক)—এক গৌরবগরিম সংকলন। মায়ের দিব্য জীবনের ঘটনাপঞ্জী (১৮৯৬-১৯৮২), মায়ের বাণীর সুনির্ব্বাচিত শত উদ্ধৃতি। মাতৃ আশ্রমগুলি ও মাতৃ-প্রতিষ্ঠিত সংস্থাগুলির অসংখ্য চিত্র সম্বলিত বিবৃতিমূলক ইতিহাস, বহু বিশিষ্ট লেখকের লেখনী নি:সৃত স্মৃতিচারণা, প্রখ্যাত মহাত্মাবৃন্দ ও বিশেষ গৌরবান্বিত ব্যক্তিবর্গের বিশেষ সন্দেশ ও সম্মাননা, সর্বোপরি মায়ের বিরল আলোক চিত্রের বহু সংখ্যক সমাবেশ। অতি উচ্চমানের কাগজে মুদ্রিত। মূল্য ১০০/- টাকা।

মাতৃ দর্শন—শ্রদ্ধেয় শ্রী জ্যোতিষ চন্দ্র রায় (ভাইজী) রচিত এক অতুলনীয় পুস্তক। মূল্য ৩০/- টাকা।

শ্রীশ্রী মা আনন্দময়ী—শ্রদ্ধেয়া গুরুপ্রিয়া দেবী দ্বারা লিখিত শ্রীশ্রী মায়ের অপূর্ব লীলা কথা ও ভ্রমণ কাহিনীর অনবদ্য বিবরণ। পণ্ডিত প্রবর পদ্মবিভূষণ ডা. গোপীনাথ কবিরাজ কর্ত্তৃত লিখিত বিশেষ ভূমিকা সহ প্রথম ভাগ পুনর্মুদ্রিত। মূল্য ৩০/- টাকা।

সদ্‌বাণী—শ্রদ্ধেয় শ্রী জ্যোতিষ চন্দ্র রায় দ্বারা সঙ্কলিত শ্রীশ্রী মায়ের অপূর্ব্ব উপদেশ সংগ্রহ। মূল্য ১৫/- টাকা।

শ্রীশ্রী মা আনন্দময়ী প্রসঙ্গ—শ্রীশ্রী মায়ের অতি পুরাতন ভক্ত শ্রী অমূল্য কুমার দত্তগুপ্ত কর্ত্তৃক শ্রীশ্রী মায়ের লীলা কাহিনী ও কথোপকথনের সুললিত ভাষায় লিখিত অপূর্ব্ব গ্রন্থ। প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ পুনর্মুদ্রিত। প্রতি ভাগের মূল্য ৩০/- টাকা।

মাতৃবাণী—শ্রীশ্রী মায়ের অমূল্য বাণীর সঙ্কলন। পকেট সাইজ। মূল্য ৫/- টাকা।

বিশ্বজননী শ্রীশ্রী মা—মায়ের সংক্ষিপ্ত জীবনী সহ শত উপদেশ। সুললিত ভাষায় লেখা হাতে রাখার মত ছোট একখানি বই। ড: গীতা ব্যানার্জ্জী প্রণীত। মূল্য ১৫/- টাকা।

শ্রী গুরু ও দীক্ষা—মাতৃভক্ত শ্রী তাপস কুমার সোম কর্ত্তৃক সংকলিত শ্রীশ্রী মায়ের মুখ-নি:সৃত গুরু ও দীক্ষা সম্বন্ধে নানা প্রসঙ্গ। মূল্য ২৫/- টাকা।



মাতৃ-বাণী

স্বরূপ জ্ঞান যেখানে, সেখানে নানা জ্ঞান অথবা ক্রম কোথায়? সেখানে একমাত্র জ্ঞান স্বরূপই। ক্রম অর্থাৎ বিষয় থেকে দূরে গিয়ে শুধু ভগবদুন্মুখ হওয়া। ভগবৎ প্রাপ্তি হয়নি, কিন্তু এই পথের পথিক হতে ভাল লাগছে।

যে ধারায় চলছ—তা হল ধ্যান, ধারণা ও সমাধি। এই প্রত্যেকটি স্থিতির অনুভবও অনন্ত। এখানে মন রয়েছে, তাই অনুভব হচ্ছে। সর্বাবস্থায় অনুভবের ও জ্ঞানের ইচ্ছা হয়।

যেখানে ব্যক্তিত্ববোধ, সেখানেই সুখদুঃখের অনুভব। স্ত্রী, পতি, পুত্র, কন্যা আদি সম্পূর্ণ সংসার নিজের উপর নিয়ে যে আসক্তিতে ডুবে থাকে, সে যখন কঠিন রোগগ্রস্ত হয়, তখন ভীষণ দুঃখ জ্বালায় ছটপট করে; স্ত্রী, পতি, পুত্র, কন্যার দিকে দৃষ্টি দেওয়ার তখন আর তার অবসর কোথায়? তখন তার কাছে এই মোহ বন্ধন প্রধান নয়। দেহের উপর যে মোহ তাই তার কাছে তখন প্রধান হয়। স্বয়ং আছেন তাই সব কিছু। এই দিকে এই কথা নিয়েই জীবের আবাগমনের কথা ওঠে।

ইষ্ট যেমন স্বয়ং নাশ ও তেমন স্বয়ংই, নষ্টও তিনি স্বয়ং। যেখানে একমাত্র স্বয়ং শব্দ থেকে যায়, সেখানে কার সঙ্গ? এই জন্যই নিঃসঙ্গ অসঙ্গের কথা বলা হয়ে থাকে। ছদ্মবেশী যাকে বলা হয়, ছদ্মবেশটাই বা কি? তিনিই তো।

যাকে জগত বল, জগত মানে গতি, আর যে বদ্ধ, সেই জীব। বল না "যত্র জীবস্তত্র শিব: যত্র নারী তত্র গৌরী" যেখানে গতাগতির প্রশ্ন থাকে না, বন্ধনের প্রশ্ন থাকে না, তাকেই তো নিত্য বলে থাকে।

দেখ এই যে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড, তুমি বলবে এক আত্মা। আবার তিনি সাকার রূপে ও "স্ব" আকার রূপে আছেন। "স্ব" অর্থাৎ যিনি নিত্য বর্তমান। তিনিই আকার রূপে আছেন। তাঁর

মধ্যে কি বর্তমান ? অক্রিয়া। অক্রিয়া কি ? ভগবৎ কর্মই কর্ম। আর সব অকর্ম। তোমরা জগত দৃষ্টিতে বল না ক্রিয়ার সেখানে প্রশ্ন থাকে না। সেইটি কি ? "স্ব" ক্রিয়া অর্থাৎ স্বয়ং ক্রিয়া রূপেতে বর্তমান। স্বয়ং আকারে আছেন, এই জন্যই সাকার বলা হয়। স্বয়ং গুণ রূপেতে, তাই সগুণ বলা হয়, ঈশ্বর, ঈশ্বরের যেখানে প্রকাশ, স্বয়ং ক্রিয়মাণ অকর্তা হয়েও তিনিই সেই সত্য স্বরূপ।

তুমি নিত্য মুক্ত। কারণ কর্ম সর্বদাই মুক্ত, সে বাঁধতে পারে না। সংসারেও যদি কাউকে দড়ি দিয়ে বাঁধ, তা পচে পড়ে যাবে। যদি লোহা অথবা সোনার শিকল দিয়েও বাঁধ তাও একদিন ভেঙ্গে যাবে, নষ্ট হয়ে যাবে। এমন কোন জাগতিক বন্ধন আছে যা দিয়ে বাঁধলে কখনও তা ভাঙ্গবে না, নষ্ট হবে না ? সাময়িক বন্ধনে শুধু হাহাকার হয়ে থাকে, মনের বন্ধন এই রূপই হয়। কারণ মন এক জায়গায় বন্ধনে থাকতে পারে না।

মন চঞ্চল বালকের মত। তার খারাপ ভালর বিচার নেই। শুধু আনন্দই তার লক্ষ্য। ক্ষণিক আনন্দে সে তৃপ্ত হয় না, তাই সে চঞ্চল। কিন্তু যতক্ষণ না সে সেই পরম তত্ত্বের খোঁজ পায় ততক্ষণ তার বিশ্রাম কোথায় ? সমাহিত আত্মস্থ। আপনাতে আপনি।

তুমি মুক্ত তাই তুমি বুঝতে পারছ। মুক্তি চাওয়াই তোমার স্বভাব। অতএব কর্মরূপেতে কারুর ভাগ্যে যদি তিনি প্রকট হন, তবে কর্ম ত্যাগ হয়ে যায়।

গতির অবরোধ মৃত্যুর পথ। শুধু তার জন্যই মানুষ নানা উপায় অবলম্বন করে। যা ত্যাগ হয়ে যায়, তাই ত্যাগ করণীয়।

গুরু শক্তিতেই সব হয়। গুরুকরণ কর। আবার সব নাম তাঁরই নাম। সবরূপ তাঁরই রূপ। একটা কিছু বেছে নাও। তাঁর নাম নেই, রূপও নেই, তিনি অনামী ও নিরাকার। "কিছুই নেই" আবার "আছেও"। এইটি ভগবানেই সম্ভব। যতক্ষণ গুরুপ্রাপ্তি না হয়, যে রূপ ভাল লাগে, যে নাম ভাল লাগে, তাই কর। নিত্য প্রার্থনা কর তুমি আমার সদ্গুরু রূপে প্রকট হও।



শ্রীশ্রী মা আনন্দময়ী প্রসঙ্গ

—*শ্রী অমূল্য কুমার দত্তগুপ্ত*

যোগক্রিয়ার ফলে শ্রীশ্রীমায়ের দেহে বিভিন্ন পরিবর্ত্তন

আর একদিনের ঘটনা ডা: পান্নালাল মাকে পড়িয়া শুনাইলেন, মা ও ভোলানাথ একদিন রাত্রিতে এক বিছানায় শুইয়া আছেন, এমন সময় মায়ের হাতখানা ভোলানাথের গায়ের উপর পড়িল। উহার স্পর্শে ভোলানাথ চমকিয়া উঠিলেন। কারণ ঐ হাত এত মোটা ও শক্ত ছিল যে উহা যে মায়ের হাত হইতে পারে তাহা তিনি বিশ্বাস করিলেন না। তিনি মনে করিলেন বোধহয় কোন চোর ঘরে প্রবেশ করিয়া তাঁহাকে স্পর্শ করিয়াছে। ইহা পাঠ করিয়া ডা: পান্নালাল জিজ্ঞাসা করিলেন, "মা, কোমল শরীর কি এই ভাবে স্থূল ও শক্ত হইতে পারে?"

মা—"হাঁ, পারে। কেবল শক্ত কেন, কখন কখন এদেহের হাত পায়ের সমস্ত গাঁটগুলি আলগা হইয়া যাইত। এমন কি আঙ্গুলের গাঁটগুলি আলগা হইয়া ঝুলিতে থাকিত। ইহা দেখিয়া ভোলানাথ ভয়ে আড়ষ্ট হইয়া যাইত। সে ভাবিত, এই ভাবে যখন শরীরের সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ আলগা হইয়া যাইতেছে, তখন বুঝি মৃত্যু হইতে আর বেশি বিলম্ব নাই। সাধনের ফলে যে এরূপ হইতে পারে ইহা সে কোন পুঁথিপুস্তকে পড়ে নাই বা কাহারও কাছে শোনেও নাই। আবার কখন কখন ভোলানাথ দেখিতে পাইত যে এ দেহ লাল হইয়া উঠিয়াছে। এ লাল রং সাধারণ লাল রং নয়। একেবারে রক্তবর্ণ। দেখিয়া মনে হইত শরীরের সমস্ত লোমকূপ দিয়া দেহের সমস্ত রক্ত যেন তখনই ফুটিয়া বাহির হইবে। এ সব দেখিয়া তাহার পক্ষে ভয় পাওয়া খুবই স্বাভাবিক।"

"আবার কখনও কখনও শরীরের সমস্ত লোম খাড়া হইয়া উঠিত। কেবল গায়ের লোম নয়, মাথার চুল পর্য্যন্ত খাড়া হইয়া উঠিত। তোমাদের দিদিমা হাত দিয়া চাপিয়া ঐগুলিকে পাট পাট করিয়া দিতে চেষ্টা করিত, কিন্তু পারিত না। এইভাবে চুল খাড়া হইলে লোকের নাকি মৃত্যু হয়, এই সব বিষয় চিন্তা করিয়া তোমাদের দিদিমাও ভয়ে অস্থির হইত।"

এই সকল কথার সময় দিদিমাও উপস্থিত ছিলেন। তাঁহাকে এই সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি এ সমস্তই সত্য বলিয়া স্বীকার করিলেন।

মা আবার ডা: পান্নালালকে বলিতে লাগিলেন, "তুমি শরীর শক্ত হইয়া যাওয়ার কথা বলিলে না? গোপীবাবা দুইজন মহাপুরুষের কথা বলিয়াছিল। উহাদের মধ্যে একজনকে তলোয়ার দিয়া আঘাত করিলে দেখা গেল যে তাঁহার শরীরে কোনো আঘাতই লাগিল না। দ্বিতীয়জনকে ঐরূপ করিলে দেখা গেল যে তাহার শরীরের ভিতর দিয়া তলোয়ার খানি চলিয়া গেল। কিন্তু

শরীরের কিছুই হইল না। এই অবস্থায় কাহাকে তুমি বড় বলিবে? আবার অন্য একজনের নিকট দুই মহাপুরুষের গল্প শুনিয়াছিলাম। তাহাদের মধ্যে একজন সিংহের উপর চড়িয়া একটা বিষাক্ত সাপকে চাবুক হিসাবে ব্যবহার করিতে করিতে অপর মহাত্মার নিকট উপস্থিত হইলেন। ঐ মহাত্মা একটা দেওয়ালের উপর বসিয়া ছিলেন। প্রথম মহাপুরুষকে ঐভাবে আসিতে দেখিয়া তিনি দেওয়ালকে চলিতে আদেশ দিলেন। ঐ আদেশমত দেওয়ালও চলিতে আরম্ভ করিল। এখানেও শক্তির খেলা দেখিতে পাইতেছ। এই শক্তির প্রকাশ যে কোন একটা উপলক্ষ্য লইয়া হইতে পারে। আবার কোন উপলক্ষ্য না লইয়াও হইতে পারে।"

কাশী আশ্রম, ভাগবত জয়ন্তী—২০শে ভাদ্র, শুক্রবার (ইং ৫/৯/১৯৫২)

গত ১২ই ভাদ্র হইতে ভাগবৎ জয়ন্তী আরম্ভ হইয়া গতকল্য শেষ হইয়াছে। এবার ভাগবৎ পাঠ করিয়াছেন চিত্তবাবু এবং ব্যাখ্যা করিয়াছেন বাটু দাদা। ভাগবৎ জয়ন্তীর মধ্যেই মা গোপাল দাদার আহ্বানে এলাহাবাদে গিয়া তিনরাত্রি কাটাইয়া আসিয়াছেন। গত ১৬ই ভাদ্র ভোরবেলা মা মোটরে রওনা হইয়া গিয়াছিলেন এবং গতকল্য সকাল বেলা ৮টার সময় কাশী ফিরিয়া আসিয়াছেন।

এ দেশের লোকেরা ভাগবৎ পাঠ এবং উহার ব্যাখ্যা খুব শ্রদ্ধার সহিত শ্রবণ করিয়া থাকে এবং যেদিন পাঠ শেষ হয় সেদিন শ্রোতারা সাধ্যানুসারে ফল, মিষ্টি, মালা, কাপড়, জামা, টাকা পয়সা প্রভৃতি দান করে। চলিত ভাষায় উহাকে ভাগবতের উপর ফুল, ফল 'চড়ান' বলে। গতকল্যও ভাগবৎ পাঠান্তে দলে দলে নেপালী এবং পশ্চিমী স্ত্রীলোকেরা নানা প্রকার ফল ও মিষ্টি পরাতে পরাতে সাজাইয়া আনিয়া ভাগবতের উপর চড়াইয়াছিল। বাঙালীদের মধ্যে অধিকাংশই টাকা দিয়া প্রণাম করিয়াছিল। শ্রীশ্রী মা এই সময় হলঘরে ছিলেন। তিনি কিছুক্ষণ এই দৃশ্য দেখিয়া শেষে নিজেই ভাগবতের কাছে গিয়া উহা মস্তকদ্বারা স্পর্শ করিয়া আমাদিগকে বলিলেন, "সকলেই ভাগবতের উপর ফল, মিষ্টি চড়াইতেছে। আমি আর কি চড়াইব? আমি আমার মাথাটাই চড়াইয়া আসিলাম।" এই সময় মায়ের হাতে কতকগুলি তুলসীপত্র দেখিতে পাইলাম, মা সকলকেই একটি করিয়া তুলসী পত্র দিলেন।

অভয়ের এক ভ্রাতা ইতিমধ্যে আত্মহত্যা করিয়া মরিয়াছে। শ্রীশ্রী মায়ের নির্দেশে তাহার পিতামাতাও ভাগবৎ জয়ন্তী উৎসবে অংশ গ্রহণ করিয়া খুব নিষ্ঠার সহিত ভাগবৎ শ্রবণ করিয়াছেন। আজ ভাগবৎ পূজা ও যজ্ঞ শেষ হইল। এই উপলক্ষ্যে কয়েকজন ব্রাহ্মণ ও সাধুকে ভোজন করান হইল। আমরাও আশ্রমে প্রসাদ পাইলাম।

রাত্রিতে মৌনের পর ডা: পান্নালাল স্বামী যোগানন্দজী লিখিত একটি ইংরেজি বহি হইতে শ্রীশ্রীমায়ের সম্বন্ধে কিছু পড়িয়া শুনাইলেন। স্বামী যোগানন্দজী মার্কিন দেশে সুপরিচিত। ঐখানে তাঁহার আশ্রম আছে। রাঁচিতেও তাঁহার আশ্রম আছে। তিনি মাকে রাঁচির আশ্রমে লইয়া গিয়াছিলেন। ঐ সময় মায়ের সহিত যে সকল কথাবার্তা হইয়াছিল তাহা তিনি ঐ পুস্তকে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

স্বামীজী যাহা লিখিয়াছেন উহার সমস্তটাই তাঁহার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হইতে নহে অনেক কথা তিনি অপরের মুখে শুনিয়াও লিখিয়াছেন। সেইজন্য তাঁহার লিখিত বিবরণ আংশিক ভাবে সত্য হইলেও উহার অধিকাংশই কাল্পনিক। বাবা ভোলানাথ সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন উহার কোনই ভিত্তি নাই। শ্রীশ্রী মাও এই অভিমত ব্যক্ত করিলেন।

নিশিকান্ত মিত্র মহাশয়ের নাতির কর্ণমূল আরোগ্য করা

ঐ ইংরেজি পুস্তক পাঠ শেষ হইলে ডা: পান্নালাল তাঁহার স্বরচিত পুস্তক হইতে পাঠ করিতে লাগিলেন। মা নিশিবাবুর নাতির কর্ণমূল কি ভাবে ভাল করিয়াছিলেন সেই ঘটনাটি পাঠ করিলেন। উহা উপলক্ষ্য করিয়া মা বলিতে লাগিলেন, "নিশিবাবু যখন তাহার নাতির কর্ণমূল দেখাইবার জন্য এ দেহকে তাহার বাসায় লইয়া গেল তখন দেখা গেল যে শিশুর কানটি অসম্ভবরূপে ফুলিয়া গিয়াছে। আমি ঐ ছেলের মাকে চুপিচুপি বলিলাম যে সে যেন সন্ধ্যার পর বাহিরে বাগানে গিয়া অন্ধকারের মধ্যে মাটি হইতে ঘাস, পাতা বা মাটি, যাহা হাতের কাছে পাইবে তাহা তুলিয়া আনিয়া উহা বাটিয়া ছেলের কানে প্রলেপ দেয়, সে তাহাই করিয়াছিল। উহার ফলে ছেলের কানে যে যন্ত্রণা ছিল এবং যাহার জন্য সে সর্ব্বদাই কান্নাকাটি করিত উহা চলিয়া গেল। কিন্তু ফোড়াটি যেমন ছিল তেমনই রহিয়া গেল। এদিকে উহাদের আত্মীয়স্বজন বলিতে লাগিল যে ঐ কর্ণমূল যদি শীঘ্র ডাক্তার দ্বারা অপারেশন না করা হয় তবে ভীষণ অবস্থা হইবে। এমনকি ঐ কান দিয়া মাথার ঘিলু পর্য্যন্ত পচিয়া বাহির হইতে পারে। তখনই নাকি কান দিয়া পচা গন্ধ বাহির হইতেছিল। কিন্তু নিশিবাবু কাহারও কথা না শুনিয়া এ দেহের উপরই নির্ভর করিয়া রহিল। তাহার বিশ্বাসকে বলিহারি দিতেই হয়। এইভাবে দুইদিন গেলে এ দেহ শাহবাগের মধ্যে বেড়াইতে বেড়াইতে একটা গ্রামোফোনের পিন পাইল এবং উহা দিয়া হাতের পাতার পিঠের দিকের কতকটা অংশ চিড়িয়া ফেলিল। যে দিন ঐরূপ করা হইল সেইদিনই ছেলেটির কর্ণমূল ফাটিয়া গেল। উহা আর অপারেশন করিতে হইল না। "পিন দিয়া মা হাতের যে স্থানটি কাটিয়া ফেলিয়াছিলেন উহা আমাদিগকে দেখাইলেন। ইহার পর প্যারীবানুদের মোকদ্দমা জিতাইবার জন্য মা তাঁহার হাতের যে অংশটি জ্বালাইয়া দিয়াছিলেন তাহাও দেখাইলেন। এই সকল দেখাইয়া বলিলেন, "কাহারও কিছু করিতে হইলেই যে এ দেহের উপর সর্ব্বদা আঘাত দিতে হইবে এমন কোন কথা নহে, খেয়াল দ্বারাও তাহাদের অভীষ্ট সিদ্ধ করিয়া দেওয়া যায়।"

সাধন অবস্থায় মা কি ধ্যান করিতেন

ইহার পর ডা: পান্নালাল মায়ের সমাধি ইত্যাদি বিভিন্ন অবস্থার কথা পাঠ করিতে লাগিলেন। এইরূপ পাঠ করিতে করিতে তিনি মাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মা, সাধন করিতে বসিয়া কেহ হয়ত ধনুর্ধারী শ্রীরামচন্দ্রের মূর্ত্তি ধ্যান করে, কেহ হয়ত অহং ব্রহ্মাস্মি এরূপও ধ্যান করে, আপনি যখন সাধন করিতেন তখন কি ধ্যান করিতেন ?"

মা — (হাসিয়া) "গিতাজী, তুমি এদেহের সহিত এতদিন সঙ্গ করিয়াও শেষে এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে ? যদি তৎজ্ঞানে থাকা যায় তবে দ্বিতীয় কিছু চিন্তা করিবার অবসর কোথায় ?"

মায়ের কথা শুনিয়া ডা: পান্নালাল কতকটা অপ্রস্তুত হইয়া গেলেন।

মা — (ডা: পান্নালালকে) "আমি ধ্যান করিতাম নাকি ?"

ডা: পান্নালাল তাঁহার পুস্তক হইতে শ্রীশ্রী মায়ের ধ্যানস্থ এক ফটো দেখাইয়া মাকে বলিলেন, "এই ফটো হইতেই বুঝা যায় যে আপনি ধ্যান করিতেন।"

মা — (হাসিয়া) "আচ্ছা, তবে শুন। সেদিন এখানে যে রাসলীলা হইয়া গেল উহার মধ্যেও কিন্তু লক্ষ্য করিবার একটা চমৎকার বিষয় ছিল। তোমরা দেখিয়াছ যে শ্রীকৃষ্ণকে নাচ শিখাইতে গিয়া যখন দেখা গেল যে তিনি ঠিকভাবে নাচিতে পারিতেছেন না তখন তাঁহাকে গালাগালি দেওয়া হইলে তিনি কাঁদিতে আরম্ভ করিলেন। শ্রীকৃষ্ণের এগুলি কি ?"

ডা: পান্নালাল — "এগুলি শ্রীকৃষ্ণের লীলা।"

মা — "আবার দেখ, গোপীদের মাখন চুরি করিয়া খাইলে গোপীরা যখন শ্রীকৃষ্ণকে চোর বলিয়া গালি দিল, তখন তিনি উত্তর করিলেন, "আমি চুরি করিলাম কি রূপে ? আমি ত নিজের ঘরের মাখনই খাইয়াছি।" তাই দেখিতেছ যে শ্রীকৃষ্ণের কাছে দ্বিতীয় কিছু নাই বলিয়া তিনি তাঁহার কাজটাকে দোষনীয় বলিয়া মনে করিলেন না।"

"সমুদ্রে কত তরঙ্গ ওঠে, তখন মনে হয় তরঙ্গগুলি জল হইতে আলাদা; কিন্তু যাদের নিকট তরঙ্গ জল বই আর কিছু নয় তাহার নিকট জল এবং তরঙ্গ হইতে ফাঁক কোথায় ? জগতে তোমরা বিভিন্ন অবস্থার লোক দেখিতেছ, কেহ হয়ত সংসার নিয়া মত্ত আছে, কেহ আবার ভগবানের দিকে যাইতে চেষ্টা করিতেছে। ইহারাই বা কে ? ইহারাও ত তিনিই। এইজন্য বলা হয় সৃষ্টি তাঁহারই লীলা। তিনিই তাঁহাকে লইয়া খেলা করিতেছেন। সমস্ত সৃষ্টিটাই ভগবানের হাসি। সৃষ্টি সম্বন্ধে যাহা বলা হইল এ দেহের সাধনাকেও ঐভাবে ধরিয়া লইতে পার। এ দেহ যে সাধনা করিয়াছে উহা আর কিছুই নয় — এ দেহ শুধু এ দেহকে লইয়া খেলা করিয়াছে। রাত্রি ১১টা বাজিয়াছে কাজেই আজ আর বিস্তার করিয়া বলিবার সময় নাই।"

ডা: পান্নালাল। (খুকুনী দিদিকে) দিদি, আমার প্রশ্নের জবাব আমি ত পাইয়া গেলামই।

খুকুনী দিদি। হাঁ।

(ক্রমশ:)



'শৃণ্বন্তু বিশ্বে'

(শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী বাণী)

—শ্রী কালীপ্রসাদ রায়চৌধুরী

(১)

মানব সভ্যতার কোন উষা লগ্নে সমগ্র বিশ্ববাসিকে মৃত্যুর রাজ্য থেকে অমৃতরাজ্যের সন্ধান দিয়ে ব্রহ্মজ্ঞ বৈদিক ঋষি ঘোষণা করেছিলেন—হে অমৃতের সন্তানগন শোন, আমি তোমাদের অমরত্বের সন্ধান দিচ্ছি অতএব এগিয়ে চলো, নির্ভয়ে, তোমরা মৃত্যুহীন। তেমনি কলির ত্রিতাপদগ্ধ দুর্বল মানুষকেও পরম অভয় দিয়ে জগজ্জননী শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী ঘোষণা করেছেন: 'এই শরীরটার কাছে যারা এসেছে তাদের আর পতন নেই।' 'যারা মনেও করেছে তাদেরও।' এ যেন শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেই উক্তিরই প্রতিধ্বনি—

সর্ব্ব ধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ ॥১৮/৬৬

সকল ধর্ম এবং অধর্ম পরিত্যাগ করে একমাত্র আমার ভক্তির দ্বারাই সব হয়ে যাবে, এই দৃঢ় বিশ্বাস নিয়ে আমারই শরণাগত হও। তাহলে আমি তোমাকে সব পাপ থেকে মুক্ত করব, শোক করো না। এই একই অভয়বাণী মায়ের মুখ থেকেও শোনা গেল।

অনেকেই বলে থাকেন, শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ীকে জানা ও বোঝার জন্য তেমন স্থিতি চাই। সেই স্থিতি না হলে নাকি মাকে জানা বা বোঝা যায় না। কিন্তু আমার মনে হয় সাধনার দ্বারা এমন কোন স্থিতি আয়ত্ত করা সম্ভব না যা দ্বারা 'মা' কে তা জানা যায়? মা নিজেই বলেছেন। "আরে না বুঝালে কে বুঝবে?" মা দয়া করে কারো কাছে ধরা না দিলে কোন জীবের পক্ষে তাঁকে ধরা সম্ভব নয়। এমন কি সাধনার দ্বারাও নয়। রাঁচীতে এক সৎসঙ্গে জনৈক ভক্ত প্রশ্ন করেন: সাধনার দ্বারা ভগবানকে পাওয়া যায় কি না? এই প্রশ্নের উত্তরে মা স্পষ্ট করেই বললেন: "না। সাধনার দ্বারাই যদি ভগবানকে পাওয়া যেত তবে ত তিনি সাধনার অধীন হয়ে পড়েন। তিনি স্বয়ং প্রকাশ বস্তু। সাধনার দ্বারা অজ্ঞানের আবরণ মুক্ত হলেই তুমি তাঁকে দেখতে পাবে। সাধনার কাজ আবরণ সরান।" [শ্রীশ্রী মা আনন্দময়ী-গুরুপ্রিয়া। ১৫ খণ্ড, ৩৫ পৃ]

প্রশ্ন হতে পারে অজ্ঞান বা অবিদ্যা বলতে কি বোঝায়? সংক্ষেপে বলা যায় ভেদজ্ঞান ও কর্ত্তৃত্বাভিজ্ঞানই হল অবিদ্যা বা অজ্ঞান। এই দুটি থাকা পর্যন্ত জীবের সংসার লীলা বন্ধ হয় না, ফলে মুক্তি বা মাতৃপদ লাভও সম্ভব হয় না। ভেদজ্ঞান বলতে বুঝি জীব ও ঈশ্বরে ভেদ। এই বিশ্বাসে দৃঢ় থেকে নানা ভাবে মজে থাকা। আর কর্ত্তৃত্বাভিমান বলতে বোঝায় ঈশ্বর

নয় আমিই কর্ত্তা। অর্থাৎ আমার স্ত্রী আমার পুত্রকন্যা, আমার বাড়ি ইত্যাদি বোধ। এই দুইয়ের প্রভাবেই জীব বার-বার দুঃখময় সংসারের আবর্তনে ঘুরপাক খায়। সাধনার দ্বারা এই অনাদি অজ্ঞান আবরণ না সরালে সংসারের হাত থেকে রেহাই নেই, মাতৃপদ লাভের আশা নেই। এ দুটি সরাতে পারলেই শুধু হবে না — তার সঙ্গে চাই গুরুর অহেতুকী কৃপা। কেননা সেই অজ্ঞাত দুরধিগম্য জগতের বিপদসঙ্কুল পথে (খুরস্য ধারানিশিতা দূরত্যয়া) শ্রীগুরুর চরণ ছাড়া পার হওয়ার অন্য কোন পথ নেই। কাজেই আমাদের মতে সংসারী জীবের একমাত্র ভরসা ঐ মাতৃচরণ। শাস্ত্র যেখানে বলছেন — "স বেত্তি বিশ্বং সর্ব্বজ্ঞস্তং ন জানাতি কশ্চন।" তিনি সর্ব্বজ্ঞ, তিনি বিশ্বের সকলই জানেন, অথচ তাহাকে কোন ব্যক্তি জানে না, সেখানে আমাদের মত অসহায় জীবের উপায় কি ?

উপায়টি কি তা মা নিজেই বলে দিয়েছেন। কোন এক সৎসঙ্গে জনৈক ভক্ত মাকে প্রশ্ন করলেন : মা আমরা ভগবানকে কি করিয়া পাইব ?

মা : তাঁহার জন্য কাঁদিলেই তাঁহাকে পাওয়া যায় ?

ভক্ত : আমার ত কান্নাই আসে না।

মা : যাঁহারা কাঁদে তাঁদের সঙ্গ কর।

এক কথায় 'মা' কে পাইবার জন্য যাঁরা 'মা' 'মা' বলে কাঁদেন তাঁদের সঙ্গ করা। অর্থাৎ সৎসঙ্গ করা।

মহাসাধক মহামহোপাধ্যায় গোপীনাথ কবিরাজ মহাশয় একটি মূল্যবান কথা বলেছেন যে সন্তানের পক্ষে 'মা'কে জানা সম্ভব না বা তার প্রয়োজনও নেই। সন্তানের কাছে 'মা' 'মা'-ই। এর বেশি জানা সন্তানের আবশ্যকতাই নেই। মহাসাধক সিদ্ধ পুরুষ ত্রিবেণী পুরীজী, বাবা সীতারাম দাস ওঁংকার নাথ; শ্রীশ্রী রাম ঠাকুর; শ্রী বালানন্দ ব্রহ্মচারী মহারাজ প্রভৃতি তাঁদের দিব্যদৃষ্টিতে মাকে, "মা হলেন সেই যিনি অবতারদের ধারণ করেন", 'জগদম্বা' 'জগদ্ধাত্রি' 'অন্নপূর্ণা' ইত্যাদি যে কোন উপাধিতে ভূষিত করুন না কেন, আমাদের মতে অবোধ সন্তানদের কাছে 'মা' 'মা'-ই। অন্য কোন রূপে, অন্য কোন নামে, আমার 'মা'কে দেখতে বা পেতে চাই না। কাজেই মাকে মা বলে ডেকে তাঁর অমৃতবাণী ও উপদেশ নিষ্ঠার সঙ্গে অক্ষরে অক্ষরে পালনের মধ্যেই আমাদের মতো অবোধ সন্তানদের পরম মঙ্গল, পরম কল্যাণ নিহিত, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। তাইতো প্রতিবছর প্রতিদিন হাজারো সন্তান ছুটে গেছেন মায়ের চরণ দর্শনের আশা নিয়ে মায়ের কাছে। মাতৃসঙ্গ ও সৎসঙ্গে মা কে পাওয়ার আশা নিয়ে।

১৩৪৬ সনের শ্রাবণ মাস। মা তখন মোরাদাবাদ, বেরেলী, লক্ষ্ণৌ, ফয়জাবাদ, বর্দ্ধমান হয়ে কোলকাতা এসেছেন। কোলকাতা এসে বিরলা মন্দিরে উঠলেন। খবর পেয়ে নানাস্থান থেকে ভক্তরা ছুটে এলেন। সান্ধ্যকীর্ত্তনের পর কথা উঠল : মা'র সঙ্গ করেও লোকের বিশেষ পরিবর্ত্তন দেখা যায় না কেন ?

মা হেসে বললেন: সঙ্গ করা হয় কই? কাছে আসিলেই কি বিশেষ সঙ্গ করা হয় বা ২/৪টি কথা শুনিলেই কি সঙ্গ করা হয়? সেই রকম ত মশা মাছিও করিতেছে। [শ্রীশ্রী মা আনন্দময়ী-গুরুপ্রিয়া। ৭ম পূর্বাদ্ধ। ২২১ পৃ]

কথাগুলো পড়ে চম্‌কে উঠলাম। কি সর্বনেশে কথা। দেশ বিদেশের ভক্তবৃন্দ হাজার হাজার টাকা খরচা করে মা'র শ্রীচরণ দর্শনের আশায় প্রতিদিন আসেন, মার সৎসঙ্গে বসেন, এ সবই কি তাহলে অর্থহীন। প্রকৃত মাতৃসঙ্গ নয়? তাহলে যাঁরা বছরে দু-একবার মা'র চরণ দর্শনের আশা নিয়ে বছরে দুবছরে একবার গেছেন তাঁদের ক্ষেত্রে তাহলে কি হবে? তাহলে মা যে বলেছিলেন "এই শরীরটার কাছে যাঁরা এসেছে তাঁদের আর পতন নেই"—"যাঁরা মনেও করেছে তাঁদেরও" এসব কথা কি অর্থহীন? মনে প্রশ্ন এলো—"মায়ের কাছে যাওয়া" বা "মাতৃসঙ্গ করা" বলতে কি বোঝায়? "মাকে মনে করা বা সৎসঙ্গ করাই বা কি?

মা বলেন, সৎ-এর সঙ্গই সৎসঙ্গ। 'সৎ' বলতে কি বোঝায়? সৎ বলতে বোঝায় অবিনাশী নিত্যবস্তু অর্থাৎ যে বস্তুর কখনও বিনাশ হয় না। সেই এক ও অদ্বিতীয় অবিনাশী বস্তু হল ভগবান বা ব্রহ্ম বা স্ব অথবা মা। মা নিজেই বলেছেন, "সৎসঙ্গ কি? না 'স্ব' মানে সেই ভগবান, সচ্চিদানন্দস্বরূপ, আত্মস্বরূপ যা বল। 'স্ব' এর সঙ্গ, স্ব-অঙ্গ অর্থাৎ স্ব-ই একমাত্র স্বয়ং কিনা। 'স্ব' অঙ্গ মানে সর্ব অঙ্গই যে ভগবানের নিত্য প্রকাশিত। যে সঙ্গ করা হওয়ার জন্য। সেই জন্যই বলা হয় স্ব-অঙ্গ কর, মানে সৎ সঙ্গ কর—স্ব-অঙ্গ-হওয়ার জন্য।" [শ্রীশ্রী মা আনন্দময়ী, গুরুপ্রিয়া-১০ম পৃ ১১৩]। মায়ের কথায় ভগবান বা ব্রহ্ম বা স্ব বা আত্মা বা মা সমার্থক এবং এঁদের সঙ্গ করাই সৎসঙ্গ। এই সঙ্গ করা কেন না ব্রহ্মময় আত্মময় বা মা-ময় হওয়ার জন্য। কিন্তু এর অর্থ আমাদের মতো জীবস্বভাব বিশিষ্ট সাধারণ লোকের পক্ষে বোঝা সম্ভব না এবং না বোঝার দরুণ তা অনুসরণ করার আগ্রহই আসে না। কারণ বোঝা মানেই জানা; আর জানা মানেই জ্ঞান। আবার জ্ঞান যেখানে আনন্দও সেখানে এবং আনন্দই কর্ম প্রেরণার উৎস। মা জানতেন তাঁর সন্তানদের এই দুর্বলতার কথা—"সকলেত এই শরীরের সব কথা ধরে কাজ করতে পারে না। আর না বুঝালে কে বুঝবে?"

যে সৎসঙ্গের আসরে মা বলেছিলেন, "সৎ সঙ্গ করা হয় কই? ..... সেই রকম ত মশা মাছিও করিতেছে।" সেই একই আসরে উপস্থিত মাতৃগত প্রাণ শ্রদ্ধেয় সন্ন্যাসী নারায়ণ স্বামীজী সাধারণ ভক্তদের হয়ে মাকে প্রশ্ন করেন—'মা, তাহা হইলে ঠিকঠিক কি ভাবে তোমার সঙ্গ করা হইবে?' উত্তরে মা বললেন—'এই শরীরের কথা ছেড়ে দাও। মহাত্মার সঙ্গ করা-মহাপুরুষের সঙ্গ করার অর্থ হইতেছে তাঁহার নিকট হইতে যাহা শুনিয়াছ তাহা যথাযথভাবে পালন করা। যেমন দেখনা, গরু একবারে খুব করে পেটভরে খেয়ে নেয় তারপর একটু একটু করে চিবিয়ে চিবিয়ে জাবর কাটে, এইরূপ যাহা শোনা যায়, সেগুলি হজম করিতে চেষ্টা করা।' [শ্রীশ্রী মা আনন্দময়ী-গুরুপ্রিয়া, ১৩ ভাগ, ২৪৮ পৃ]

মা'র কথার অর্থ অত্যন্ত পরিষ্কার। মা বলেছেন যে সৎসঙ্গ আসরে বসে মায়ের মুখের বাণী ও উপদেশ বা অন্যান্য মহাপুরুষদের প্রবচনাদি যা শোনা হয় তা মনে গেঁথে নিয়ে অনবরত

চিন্তন, সেই অনুসারে চলা ও নিজ জীবনে তা প্রতিষ্ঠা করা — তবেই সৎসঙ্গ প্রকৃত সৎসঙ্গ বা মাতৃসঙ্গ হয় এবং মাতৃসঙ্গ লাভের সার্থকতা উপলব্ধি করা সম্ভব — তবেই মা বা ভগবান বা ব্রহ্ম বা আত্মা বা স্বরূপ এক কথায় মা'র সাক্ষাৎ লাভ করে মা-ময় হওয়া সম্ভব। কিন্তু আমরা কি সত্যিই সেই ভাব নিয়ে সৎসঙ্গ বা মাতৃসঙ্গ করতে গেছি? নিজ নিজ বুকে হাত দিয়ে এ প্রশ্নটি নিজেকে করা আজ সবারই উচিত। আমরা অধিকাংশই সাংসারিক নানা ময়লা মাথায় নিয়ে মা-রূপ দর্পণের সামনে গেছি এবং ঐ দর্পণে প্রতিবিম্বিত আমার অনুরূপ ভাবের সাড়া পেয়ে মহানন্দে চলে এসেছি। মহাভাবময়ী মা যে সর্বভাবের ধারক আবার ভাবাতীতও বটে। মা বলতেন: "যখন তোমরা যে ভাবটা সামনে ধর, তখন এই শরীরটা তদ্ভাবাপন্ন হইয়া যায়, ভক্তিযোগের কথা বল, কর্ম্মযোগের কথা বল, জ্ঞানযোগের কথা বল, জাগতিক যে ভাবের কথাই বল, সেই ভাবের সঙ্গেই এ শরীরটা যোগ দিয়া যায় — কথায় ও শারীরিক আকৃতিতেও সেই ভাব ফুটিয়া ওঠে, তাই তোমরা দেখ মা'র এক এক সময় এক এক ভাব। আসলে তোমরা যে ভাব সম্মুখে আন সেই ভাবেই ভাবান্বিত দেখ।" [শ্রীশ্রী মা আনন্দময়ী-গুরুপ্রিয়া, ৬ষ্ঠ ভাগ ১৫ পৃ]

সর্বভাবময়ী মাকে 'মা' বলে আকড়ে ধরতে গিয়ে নিজের ক্ষুদ্র আমিত্বের সংস্কার মাতৃপদে বিসর্জন দিতে পারিনি তাই করুণাময়ী জগজ্জননী মা ধরা দিতে এলেও আমরা ধরতে পারিনি। মা কতভাবে ধরা দিতে চেয়েছেন তা কি আমরা একবারও দেখবার চেষ্টা করেছি? মা পরিষ্কার করে বলেছেন: 'আরে মা কি শুধু এইটুকু? মা যে জগৎমাতা। এই শরীরটাই কি শুধু মা? সর্বরূপই যে মা তা জান না? যা কিছু তাঁরই রূপ।' আমরা কি প্রতিটি বস্তুতে, জগতের প্রতিরূপে মাতৃসত্তা দেখার চেষ্টা করেছি? আমি তো আমার ক্ষুদ্র আমিত্বের বন্ধন কেটে বিশাল মাতৃবক্ষে স্থান নিতে চাই নি। আমরা বদ্ধজীব তাই বন্ধের প্রতিই আমার আকর্ষণ। তাই আমার হৃদয়াসনে যেখানে আমিত্বের পূর্ণ আসন সেখানে মা-এর আসনপাতার ঠাঁই কোথায়? তিনিই আমার একমাত্র অবলম্বন, পরমাত্মীয়, পরমাশ্রয়, মা ছাড়া আমার যে আর কেউ নেই, এমন কি আমার 'আমি' টিও নেই, মা-ই যে আমার একমাত্র গতি; এই ভাব নিয়ে আমরা ক'জনে মাতৃচরণে আশ্রয় নিতে গেছি? আসলে সংসারকে আষ্টে-পৃষ্ঠে জড়িয়ে বাড়তি কিছু পাওয়ার বৈশ্য মনোবৃত্তি দ্বারা তাড়িত হয়ে মা'র কাছে গেছি — তাই মায়ের কৃপা ধারণ করার স্থান কোথায়? হৃদয় পাত্রটিতো পূর্বেই সাংসারিক বাসনায় পূর্ণ; কাজেই মায়ের কৃপা অঝোরে ঝরে পড়লেও আমার পাত্রটি বাসনায় পূর্ণ থাকায় তা সংগ্রহ করতে পাড়িনি। সব না দিলে কি সব পাওয়া যায়? কাজেই আমরাও যার পাত্রে যতটুকু স্থান ছিল ততটুকু নিয়ে অতৃপ্ত হয়েছি — আজও হচ্ছি। মা কতদিন কতভাবে বলেছেন পাত্রটিকে উল্টে না ধরে সিধে করে ধরতে। কিন্তু আমরা তা করিনি — তাই পূর্ণ আনন্দ বা তৃপ্তিও পাইনি। একদিন কথায়-কথায় গুরুপ্রিয়াদিদি বলেছিলেন: 'মা সব নিতে চাহিতেছেন।' সঙ্গে সঙ্গে মা হেসে বললেন: "দেয় কে? নিজেদের সব ঠিক রাখিয়া যাহা বাঁচে তাহা হইতেও সামান্য একটু দেয় কিনা সন্দেহ।" [শ্রীশ্রী মা আনন্দময়ী-গুরুপ্রিয়া, ৬ষ্ঠ ভাগ ৩ পৃ]।

মায়ের এই কথাটি কি সম্পূর্ণ সত্য নয়? আমরা সারাদিন চব্বিশ ঘণ্টা সাংসারিক কাজে এমন মজে থাকি যে মাকে স্মরণ মনন করার জন্য হয়ত পাঁচ দশ মিনিট সময়ও ব্যয় করতে পারি না, অথচ মাতৃকৃপা পরিপূর্ণভাবে পেতে ইচ্ছুক। শাস্ত্রে আছে—

পুণ্যস্য ফলমিচ্ছন্তি পুণ্যং নেচ্ছন্তি মানবাঃ
ন পাপ ফলমিচ্ছন্তি পাপং কুর্বন্তি যত্নতঃ। [তৈত্তেরিয়—ব্রহ্মবল্লি ৯/১]

অর্থাৎ লোকে পুণ্যফল পেতে ইচ্ছা করে কিন্তু পুণ্যকর্ম অনুষ্ঠান করতে চায় না। এদিকে পাপের ফল ভোগ করতে ইচ্ছে করে না বটে কিন্তু যত্নপূর্বক পাপের অনুষ্ঠান করে।

আমরাও তেমনি মায়ের উপদেশ অনুসারে নিজেদের মাতৃকৃপা লাভের যোগ্য করে গড়ে না তুলেই ব্যবসায়ী বুদ্ধি (মা বলতেন "দোকানদারী বুদ্ধি") নিয়ে মায়ের কাছে গেছি নিজেদের বাসনা কামনা চরিতার্থ করার প্রয়াসে। তাইতো মা 'মশা' ও 'মাছি'র সঙ্গ করার সঙ্গে আমাদের মাতৃসঙ্গকে উল্লেখ করেছেন। এই দুটি কীটের উল্লেখ করে মা আমাদের বোঝাতে চেয়েছেন—প্রকৃত সৎসঙ্গ কি এবং সৎসঙ্গে যোগ দিতে হয়ে কি ভাবে? মশা ও মাছি এই দুটি কীটই তাদের ভোগলালসার পাশবিক আকাঙ্ক্ষা নিয়েই মানুষের শরীরে বসে। মশার উদ্দেশ্য মানব রক্ত পান করে উদরপূরণ, আর মাছি তৃপ্ত হয় মানব শরীরের রস পান করে। এক কথায় তারা তাদের জাগতিক ভোগবাসনা তৃপ্ত করতেই মানুষের সঙ্গ নেয়। আমরাও তেমনি সংসারের অজস্র কামনা বাসনা নিয়ে মায়ের সঙ্গ করেছি। প্রকৃত পরমার্থ কামনা করে ক'জন গেছি? দ্বিতীয়ত: মশা ও মাছির মন বা বিবেক নামক পদার্থটিই নেই; ফলে শুভাশুভ বিষয় বিচার বা বিবেচনা করার ক্ষমতাই নেই—একমাত্র ভোগেন্দ্রিয় দ্বারা তাড়িত হয়ে কর্মে প্রবৃত্ত হয়—(যেমন আহার, নিদ্রা, মৈথুন)। এ সবই মৃত্যুমুখী কর্ম। আর মানুষ মা বলেছেন—"দুর্লভ মানুষ জন্ম পেয়েছ, বৃথা একটি মুহূর্তও যেন না যায়। গাছপালা, পশুপাখী কয়েকদিন জীবিত থেকে নতুন গাছপালা, পশুপাখী সৃষ্টি করে সংসার থেকে বিদায় নেয়। তোমরাও যদি কেবল তাই-ই করলে তবে আর প্রভেদ রইল কি? যাতে আর return ticket (রিটার্ন টিকিট) কাটতে না হয় তার জন্য চেষ্টা কর সকলে।" [শ্রীশ্রী মা আনন্দময়ী-গুরুপ্রিয়া, ১৪ ভাগ ৯৯ পৃ]।

একবার মাকে নৈনিতালে এক মেমসাহেব প্রশ্ন করেছিলেন: এই যে পশুপাখি, গাছপালা, ইহাদের মধ্যে যে চৈতন্যসত্ত্বা আছে এবং মানুষের মধ্যে যে চৈতন্যসত্ত্বা আছে তাহা কি অভিন্ন? মা বললেন: "অভিন্নইত। সবইত তাঁর মধ্যে; তিনিই তাঁকে নিয়েই। মনুষ্য জন্ম যে শ্রেষ্ঠ, যেমন শিশুরূপী মুর্খ মানুষকেও শিক্ষার ফলে বিদ্বান করা যায়—কিন্তু গাছ বা পশুকে তদ্রূপ করা যায় না। মনুষ্যের মধ্য দিয়াই ভগবানের বিশেষ প্রকাশ হয়।" সেই বিশেষ প্রকাশ কি? মানুষ বিবেকের অধিকারী এবং বিচারযুক্ত পৌরুষ প্রযত্ন সহকারে ব্রহ্ম বা আত্মার সাক্ষাৎ লাভ করতে পারে কিন্তু মানুষ ছাড়া অন্য কারো পক্ষেই তা সম্ভব না। পৌরুষ প্রযত্ন বলতে বুঝব, 'যে কোন উপায়ে অবশ্যই ইহা সম্পাদন করব এই প্রকার নির্বন্ধ বা জিদ; আর বিবেক শব্দের অর্থ বিভাগ পূর্বক নিশ্চয় করা অর্থাৎ বস্তুর গুণদোষাদি বিচার পূর্বক হেয় হইতে উপাদেয় বস্তু পৃথক করে নিশ্চয় করা। ভগবানের সেই বিশেষ প্রকাশটি আমরা 'ভাইজী'র মধ্যে হতে দেখেছি;

যিনি মাতৃচরণে নিজের স্বাতন্ত্র্যবোধ সম্পূর্ণ বিসর্জন দিয়ে সেই পরম চরম স্থিতিলাভ করে বলতে পেরেছিলেন, "মা ও আমি এক; বাবা ও আমি এক; আমরা সবাই এক। এক ছাড়া কিছুই নেই।" 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম' বা 'একমেবাদ্বিতীয়ম' বোধে প্রতিষ্ঠিত হয়ে তিনি মৃত্যুর রাজ্যকে জয় করে অমৃতের রাজ্যে অক্ষয় আসন লাভ করেন। এইখানেই মানবেতর সৃষ্টি সমূহের সঙ্গে মানুষের পার্থক্য। কাজেই মনকে ঈশ্বর মুখী না করে বিষয় মুখী করে চালনা করা যে আসলে মনুষ্য বৃত্তি নয় এটা মায়ের কথায় পরিষ্কার ভাবে ফুটে উঠেছে। সেই বিষয় চিন্তাগ্রস্থ মন নিয়ে মাতৃসঙ্গ বা সৎসঙ্গ আসরে বসে আমাদের ভগবদমুখী অনুকূল ক্রিয়া পুষ্ট হতে পারে নি। সৎসঙ্গে বসে সৎকথা শুনেছি কিন্তু হৃদয়ে ধারণ করতে পারিনি। মা বলতেন, "শোনা তখনই হয় যখন কর্মেতে প্রকাশ পায়।" যে হেতু আমাদের ঠিক ঠিক শোনা হয়নি তাই কর্মে তার প্রকাশ ঘটেনি বলে তার ফলও লাভ করতে পারিনি। সৎসঙ্গে বসে আমাদের উপদেশ শোনা প্রসঙ্গে মা একদিন বলেছিলেন: "এক কান দিয়া শুনিবে আর এক কান দিয়া বাহির হইয়া যাইবে। কাজেই প্রকৃত শোনাও হয় না।" কিন্তু কেন এমন হয়? মা বলেছেন, "মন কেন ভগবানের দিকে থাকে না, তাহার কারণ এই যে মন বহির্মুখ হইয়া গিয়াছে।" শাস্ত্রও বলেন: পরাঞ্চিখানি ব্যতৃণাৎ স্বয়ম্ভূ-তস্য পরাং পশ্যতি নান্তরাত্ম: (কঠো:৪/১)। ঈশ্বর ইন্দ্রিয়গুলিকে বর্হিমুখ করেই সৃষ্টি করেছেন তাই সে বাইরের বস্তুই দেখে, অন্তরাত্মা বা ভগবানের সাক্ষাৎ লাভ করে না। তাঁহার রসে রসময় হওয়ার জন্য মনটার অবনতি (অর্থাৎ জাগতিক) রসের দিকে গতি না হতে পারে সে জন্য কেবল উন্মুখ। এক ব্রহ্মমুখী অনুকূল ক্রিয়া। কারণ হিসাবে মা বলেছেন: "মন ফাঁক পেলেই তাঁহার নিম্নগতির যে মৃত্যুর দিকের ক্রিয়া সেই সব সে করবেই।" আমরা বিষয়ী লোকেরা ঈশ্বর চিন্তায় মনকে ব্যস্ত না রেখে বিষয় চিন্তায় অর্থাৎ মৃত্যুর দিকের ক্রিয়ায় অধিক সক্রিয় রাখি বলে মা আমাদের মনকে বনের সঙ্গে তুলনা করেছেন। "বন কি? মনই বন। যাহা আছে তাই। তোরা আছিস ত, তোদের মন আছে, কাজেই বন আছে। সেই বনে বাস করা আর কি?"

বন যেমন হিংস্র শ্বাপদ সঙ্কুল, প্রতিমুহূর্তে যেখানে মৃত্যুর সম্ভাবনা, ভয়, বিঘ্ন, দুশ্চিন্তা ইত্যাদি ওৎ পেতে বসে আছে তেমনি আমাদের মনেও হিংসা, দ্বেষ, ক্রোধ, লালসা, কুটিলতা ইত্যাদি নানা ভগবৎ বিরোধি ভাব হিংস্র পশুর মতো সব সময় ক্রিয়াশীল থেকে আমাদের বুদ্ধি-বিবেককে নাশ করে প্রতিমুহূর্তে আমাদের মৃত্যুর দিকে ঠেলে নিয়ে চলেছে। আমরা সাংসারিক আনন্দ, শোক-দুঃখ-পূর্ণ সংসারকেই জীবনের চরম পরম লক্ষ্যরূপে গ্রহণ করে শোকদুঃখহীন সৎস্বরূপ আনন্দস্বরূপ পরমাত্মা, ভগবান বা মাকেই ভূলে বসে থাকি। প্রতিদিন প্রতিমুহূর্ত সংসার যন্ত্রনায় ফটফট্ করেও উটের মতো কাঁটার ঝোঁপকেই পরম উপাদেয় মনে করে মজে আছি। কেন আমাদের অমর মুখী গতি না হয়ে মৃত্যুমুখী বা সংসারমুখী গতি হয়? এ সব কিছুর মূলেই মন। মনই মানুষকে সংসাররূপ বনে বারে বারে নিক্ষেপ করে।

(ক্রমশ:)



তান্ত্রিক সংস্কৃতি

— মহামহোপাধ্যায় গোপীনাথ কবিরাজ

(অনুবাদক—স্বামী জগদীশ্বরানন্দ)

এই বিশাল ভারতীয় সংস্কৃতির বিশ্লেষণ করলে প্রতীত হবে ইহার বিভিন্ন অংশ আছে এবং বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গরূপে বিভিন্ন বিভাগ আছে। সন্দেহ নেই ইহাতে বৈদিক সাধনাই প্রধান, কিন্তু ইহাও মনে রাখতে হবে ভিন্ন-ভিন্ন সময়ে এই ধারাতেও নূতন নূতন বিবর্ত্তন হয়েছে। ধর্মশাস্ত্র, নীতিশাস্ত্র, ইতিহাস, পুরাণাদির আলোচনাতে তথা ভারতীয় সমাজের আন্তরিক পরিচয় মিললে উপযুক্ত তথ্যের স্পষ্ট জ্ঞান হবে। বৈদিক ধারায় প্রাধান্য হলেও ইহাতে সন্দেহ নেই যে ইহাতেও বিভিন্ন ধারার সংমিশ্রণ হয়েছে। এইসব ধারার ভিতর যদি ব্যাপক দৃষ্টিতে দেখা যায় তাহলে জানা যাবে তন্ত্রের ধারাই প্রথম এবং প্রধান। এই ধারায় বহু দিক আছে, যার মধ্যে এক বৈদিক ধারার অনুকূল ছিল। আগামী দিনের গবেষকগণ এই তথ্যের নিরুপণ করবেন যে বৈদিক ধারায় যে উপাসনার দিক আছে, উহা অবিভাজ্যরূপে বহু অংশে তান্ত্রিক ধারার সঙ্গে মিলিত হয়ে আছে এবং বহু তান্ত্রিক বিষয় অতি প্রাচীনকাল থেকে পরম্পরাক্রমে চলে আসছিল। উপনিষদ আদিতে যে সমস্ত বিদ্যার পরিচয় মেলে যেমন — সংবর্গ, উদ্‌গীথ, উপকোশল, ভূমা, দহর, পর্য্যঙ্ক, আদি, এই সমস্ত গুপ্তবিদ্যা ইহারই অন্তর্গত। বেদের রহস্য অংশেও এইসব রহস্যবিদ্যার পরিজ্ঞানের আভাস মেলে। এ পর্য্যন্ত বলা যায় বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ডও অধ্যাত্মবিদ্যারই বাহ্যরূপ, যা নিম্ন অধিকারীর জন্য উপযোগী মানা হয়। এইসব অধ্যাত্মবিদ্যার রহস্যজ্ঞান যদি কখনও হয়ে যায়, তাহলে বুঝা যাবে মুলভূত বৈদিক তথা তান্ত্রিক অথবা আগমিক জ্ঞানে বিশেষ ভেদ নেই।

এখানে প্রসঙ্গত: একটি কথার উল্লেখ আবশ্যক যে সাধারণ দৃষ্টিতে ইহা বুঝতে না পারা যেতে পারে, তথাপি ইহা সত্য যে বেদ এবং তন্ত্রের নিগুঢ় রূপ একই প্রকারের। দুইই অক্ষরাত্মক, অর্থাৎ শব্দাত্মক জ্ঞানবিশেষ। এই শব্দ লৌকিক নয়, দিব্য এবং অপৌরুষেয়। মন্ত্রদ্রষ্টাগণ ইহা পেয়ে সর্বজ্ঞত্ব লাভ করতেন; তাঁরা শেষে আত্মসাক্ষাৎকার দ্বারা আপন জীবন সফল করতেন।

পুরাকল্পে লিখা আছে—

"যাং সুক্ষ্মাং বিদ্যাং অতীন্দ্রিয়াং বাচম্ ঋষয়ঃ সাক্ষাৎকৃত ধর্মাণঃ মন্ত্রদৃশঃ পশ্যন্তি তাম্ অসাক্ষাৎকৃতধর্মাভ্য প্রতিবেদয়িষ্যমানা বিল্মং সমামনন্তি, স্বপ্রবৃত্তমিব দৃষ্টশ্রুতানুভুতম্ আচিখ্যাসন্তে।"

নিরুক্ত প্রভৃতি গ্রন্থের আলোচনায় প্রতীত হয় ঋষিগণ সাক্ষাৎকৃতধর্মা ছিলেন এবং তাঁরা সেই সমস্ত সাধারণ মানুষকে তাঁদের উপদেশ দ্বারা মন্ত্রদান করতেন যাঁরা অসাক্ষাৎকৃতধর্মা ছিলেন।

সাক্ষাৎকৃতধর্মা হওয়ার দরুণ ঋষিগণ বস্তুতঃ শক্তিশালী ছিলেন, অতএব তাঁরা কারও উপদেশ শ্রবণ ক'রে ঋষিত্ব লাভ করতেন না; প্রত্যুত তাঁরা স্বয়ং বেদান্ত দর্শন করতেন। এই অভিপ্রায়ে তাঁদেরকে মন্ত্রদ্রষ্টা বলা হতো। মন্ত্রার্থজ্ঞানের মুখ্য উপায় প্রতিভাস, ইহাকেই প্রাতিভ অথবা অনৌপদেশিক জ্ঞান বলা হয়। এই বিষয়ে বলা হয়—

গুরোস্তু মৌনং ব্যাখ্যানং শিষ্যস্তু ছিন্নসংশয়াঃ।

গুরু শব্দে এখানে অর্ন্তগুরু অথবা অন্তর্যামী বুঝতে হবে। এইরকম উত্তম অধিকারীদের 'দৃষ্টার্ষি' বলা হয়। শক্তির মন্দতার দরুণ মধ্যম অধিকারী ইহা থেকে অবর বা নিকৃষ্ট বুঝায়। এদের পরিচয় 'শ্রুতর্ষি' নামে মেলে। উত্তম অধিকারীর দর্শন মিলত উপদেশ-নিরপেক্ষ হয়ে এবং মধ্যম অধিকারীর পক্ষে তা ছিল শ্রবণ-প্রাপ্ত অথবা উপেদশ-সাপেক্ষ। প্রথম জ্ঞানের নাম আর্ষজ্ঞান এবং দ্বিতীয়ের নাম ঔপদেশিক জ্ঞান। মনুসংহিতায় লেখা আছে—

আর্ষধর্মোপদেশং চ বেদশাস্ত্রাবিরোধিনা।
যস্তর্কেণানুসন্ধত্তে স ধর্মং বেদ বেতরঃ।।

কিন্তু সাধারণ অধিকারীর যে জ্ঞান হয়, উহা সৎতর্কের দ্বারা। সৎতর্কের অভিপ্রায় বেদশাস্ত্রের অবিরোধী তর্কের দ্বারা অনুসন্ধান। আগমশাস্ত্রে (ত্রিপুরা রহস্য তথা ত্রিক দার্শনিক সাহিত্য) সৎতর্ককে বিশেষরূপে মহিমান্বিত করা হয়েছে। বৈদিক সাহিত্যেও ইহা লিখিত মেলে যে ঋষিগণ যখন অন্তর্হিত হতে লাগলেন তখন তর্কের উপরই জ্ঞানের ভার দেওয়া হল। সব সাধারণ জিজ্ঞাসুগণই অবর-কোটির, আমরা সবাই এই কোটির। এই প্রকারের জিজ্ঞাসুর জন্য সৎতর্কই অবলম্বনীয়।

তন্ত্রশাস্ত্র অনুসারে তন্ত্রের মূল আধারের কোন গ্রন্থ নেই—ইহা অপৌরুষেয় জ্ঞানবিশেষ। এই জ্ঞানের নামই আগম। এই জ্ঞানাত্মক আগম শব্দরূপে অবতরণ করে। তন্ত্রমতে পরাবাক্ই অখণ্ড আগম। পশ্যন্তী অবস্থায় ইহা স্বয়ং বেদ্যরূপে প্রকাশিত হয় এবং আপন প্রকাশ নিজের সাথেই রাখে। ইহাই সাক্ষাৎকারের অবস্থা এবং এখানে দ্বিতীয় অথবা অপরের দ্বারা জ্ঞানসঞ্চার করার কোন প্রশ্ন ওঠে না। ঐ জ্ঞান মধ্যমায় অবতীর্ণ হয়ে শব্দের আকার ধারণ করে। এই শব্দ চিন্তাত্মক। এই ভূমিতে গুরু-শিষ্যভাবের উদয় হয়। ফলতঃ জ্ঞান এক আধার থেকে অপর আধারে সঞ্চারিত হয়। বিভিন্ন শাস্ত্র এবং গুরু-পরম্পরার প্রাকট্য মধ্যমা ভূমিতে হয়। বৈখরীতে এই জ্ঞান অথবা শব্দ যখন স্থূলরূপ ধারণ করে, তখন উহা অন্যের ইন্দ্রিয়ের বিষয় হয়।

উপরোক্ত সংক্ষিপ্ত বিবরণে প্রতীত হবে যে বেদ এবং তন্ত্রের মৌলিক দৃষ্টি একই। যদিও বেদ এক, কিন্তু বিভক্ত হয়ে ত্রয়ী অথবা চতুর্বিধ হয়, শেষ পর্যন্ত উহা অনন্ত। 'বেদা অনন্তাঃ' ইহাও বেদেরই বাণী। আগমের স্থিতিও ঠিক এই প্রকারের। অবশ্যই তন্ত্রের আরও এক দিক আছে, যাহাতে উহার বৈদিক আদর্শ থেকে কিছু কিছু অংশে পার্থক্য প্রতীত হয় এবং ঐ কারণে তান্ত্রিক সাধনার বৈশিষ্ট্যও বুঝতে পারা যায়। যাই হোক, এই সমস্ত মিলে তা ভারতীয় সংস্কৃতির অঙ্গীভূত হয়ে গেছে। যেমন বৃহৎ জলধারা সকল মিলে নদীর রূপ ধারণ করে এবং শেষে

মহাসমুদ্রে বিলীন হয়ে যায়; তেমনি বৈদিক-তান্ত্রিক আদি অন্যান্য সংস্কৃতির ধারা সকল ভারতীয় সংস্কৃতিতে আশ্রয়-লাভ করে এবং উহাকে বিশাল থেকে বিশালতম করে তোলে। ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে ভারতীয় সংস্কৃতির বিচার করলে প্রতীত হয় প্রাচীনকাল থেকেই বৈদিক তথা তান্ত্রিক সাধনধারাতে পরস্পর ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রয়েছে; একথাও যেমন সত্য, তেমনি ইহাও সত্য দুইয়েতে অংশতঃ বৈলক্ষণ্যও আছে। অতি প্রাচীনকাল থেকেই শিষ্টজনের দ্বারা তন্ত্রের সমাদরের অসংখ্য প্রমাণ উপলব্ধ হয়। এইরকম প্রসিদ্ধি আছে, বহু সংখ্যক দেবতাও তান্ত্রিক সাধনার দ্বারা সিদ্ধি লাভ করতেন। তান্ত্রিক সাধনার পরম আদর্শ ছিল — শক্তিসাধনা, যার লক্ষ্য ছিল — মহাশক্তি জগদম্বাকে মাতৃরূপে উপাসনা অথবা শিবোপাসনা। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, ইন্দ্র, স্কন্দ, বীরভদ্র, লক্ষ্মীশ্বর, মহাকাল, কাম অথবা মন্মথ — এঁরা সবাই শ্রীমাতার উপাসক ছিলেন। প্রসিদ্ধ ঋষিদের মধ্যে কেহ কেহ তান্ত্রিক মার্গের উপাসক ছিলেন এবং কেহ কেহ তান্ত্রিক উপাসনার প্রবর্ত্তকও ছিলেন। ব্রহ্ম যামলে বহু সংখ্যক ঋষিদের নাম উল্লেখ আছে, যাঁরা শিবজ্ঞানের প্রবর্ত্তক ছিলেন; তাঁদের মধ্যে উশনা, বৃহস্পতি, দধীচি, সনৎকুমার, নকুলেশ আদি উল্লেখ্য। জয়দ্রথযামলে মঙ্গলাষ্টক প্রকরণে তন্ত্র-প্রবর্ত্তক বহু ঋষির নাম আছে, যেমন দুর্বাসা, সনক, কশ্যপ, সংবর্ত, বিশ্বামিত্র, গালব, গৌতম, যাজ্ঞবল্ক্য, শাতাতপ, আপস্তম্ব, কাত্যায়ন, ভৃগু আদি।

সর্বপ্রথম দুর্বাসার নাম উল্লেখনীয়। তান্ত্রিক সাহিত্যে 'ক্রোধভট্টারক' নামে এর পরিচয় মেলে। প্রসিদ্ধি অনুসারে ইনি শ্রীকৃষ্ণকে চৌষট্টি অদ্বৈতাগম পড়িয়েছিলেন। ইহাও কিংবদন্তী আছে কলিযুগে দুর্বাসাই আগমকে প্রকাশ করেছিলেন। নেপালি দরবার গ্রন্থাগারে সুরক্ষিত মহিম্নস্রোতের এক পুঁথিতে এঁর সম্বন্ধে লেখা আছে — 'সর্বাসামুপনিষদাং দুর্বাসা জয়তি দেশিকঃ প্রথমঃ।' জয়দ্রথযামল নামক আগম অনুসারেও তন্ত্রের প্রবর্ত্তক ঋষিদের মধ্যে দুর্বাসার নাম প্রথম। ইহা বিচারণীয়, দুর্বাসার ধারা কি ছিল? প্রসিদ্ধি আছে ব্রহ্মযামলানুসারী সব তন্ত্রের ভিতর দুর্বাসাই প্রথম। এই কথা দরবার গ্রন্থাগারে উপলব্ধ পিঙ্গলাগমে পিঙ্গলামত প্রসঙ্গে উল্লিখিত আছে। অর্দ্ধচন্দ্রকলাবিদ্যার ভিতরও দুর্বাসার মত উল্লিখিত আছে। চন্দ্রকলাবিদ্যায় কৌল তথা সোম (কাপালিক) মতের সংমিশ্রণ আছে। প্রাচীনকালে এই বিদ্যায় চারবর্ণের অধিকার ছিল, কিন্তু বিশেষ এই ছিল ত্রৈবর্ণিক লোক দক্ষিণমার্গে অনুষ্ঠান করতেন এবং অন্য লোক বামমার্গে।

দুর্বাসা শ্রীমাতার উপাসক ছিলেন। শ্রীমাতার দ্বাদশবিধ উপাসকের মধ্যে তাঁরও এক নাম ছিল। শোনা যায়, তাঁর উপাস্য ষড়ক্ষরীবিদ্যা ছিল (দ্রষ্টব্য ত্রিপুরাতাপিনী উপনিষদ্-টীকা)। কারও কারও মতে তিনি ত্রয়োদশাক্ষরীবিদ্যার উপাসক ছিলেন। সৌন্দর্য্য-লহরীর টীকায় কৈবল্যাশ্রম এই বিদ্যাকে আদি মতের অনুসারে উদ্ধারও করেছেন। দুর্বাসা সম্প্রদায় এই সময় লুপ্তপ্রায়।

যতদূর মনে আছে সম্ভবতঃ ১৯২৮ খৃষ্টাব্দে এক প্রাচীন গ্রন্থাগারে কৌলসূত্রের এক খণ্ড প্রতিলিপি পেয়েছিলাম, উহার মুখবন্ধে লেখা আছে —

"ষড়্‌দর্শনাতিরিক্তোৎর্থে সূত্রধারো ভুবং শ্রিতরুদ্রাবতারো দুর্বাসা স্তূয়তে স্পর্শকামধুক্।"

এই গ্রন্থ দুর্বাসার কৌলবিজ্ঞান-বিষয়ক ছিল। নিম্নলিখিত গ্রন্থে দুর্বাসার চর্চা আছে —

(১) ত্রিপুরাসুন্দরী (দেবী) মহিম্নঃস্তোত্র টীকায় নিত্যানন্দ নাথ বলেছেন—
"সকলাগমাচার্যচক্রবর্ত্তী সাক্ষাৎ শিবএব অনুসুয়াগর্ভসম্ভূতঃ
ক্রোধভট্টারকাখ্যো দুর্বাসা মহামুনিঃ।"

(২) ললিতাস্তব-রত্ন।

(৩) পরশিব-মহিম্নঃস্তোত্র অথবা পরশম্ভু-স্তুতি।

দুর্বাসা শ্রীবিদ্যা তথা পরমশিবের উপাসক ছিলেন। কালীসুধানিধি গ্রন্থে ইহা জানতে পারা যায়, তিনি কালীরও উপাসক ছিলেন।

প্রসঙ্গতঃ এই সময় অগস্ত্য সম্বন্ধে কিছু বলা হচ্ছে। ইনি বৈদিক ঋষি ছিলেন। তাঁর সম্বন্ধে পাঞ্চরাত্র তথা শাক্তাগমেও আলোচনা আছে। এই প্রসিদ্ধ ঋষির বিবরণ পুরাণ, রামায়ণ মহাভারতাদি প্রায় সব প্রাচীন গ্রন্থে পাওয়া যায়। বিদর্ভরাজের কন্যা লোপমুদ্রা তাঁর ধর্মপত্নী ছিলেন, তাঁর চর্চা প্রায় সর্বত্র দেখা যায়, তিনিও অগস্ত্যের মত বৈদিক দেবতা ছিলেন। রামায়ণের অরণ্যকাণ্ডে সুতীক্ষ্ণ মুনি ভগবান রামচন্দ্রকে গোদাবরী তটস্থিত অগস্ত্য আশ্রমের পথ দেখিয়েছিলেন। অগস্ত্য শ্রীরামচন্দ্রকে বৈষ্ণব ধনু, ব্রহ্মদণ্ড নামক শাস্ত্র (বাণ), অক্ষয়তুনীর এবং খর্গ দিয়েছিলেন। বিন্ধ্য পর্বতের সঙ্গে অগস্ত্যের সম্বন্ধ প্রায় সর্ববিদিত। দক্ষিণদিকের সাথে অগস্ত্যের বিশেষরূপে সম্বন্ধ প্রতীত হয়। ইহাও প্রসিদ্ধ যে দক্ষিণ ভারতীয়দের মধ্যে এক বিশিষ্ট প্রকারের সংস্কৃতিরও প্রসার তিনি করেছিলেন। ৪ অধ্যায় এবং ৩০২ সূত্রের শক্তিসূত্র তাঁরই রচনা। ইহার অতিরিক্ত তাঁর গ্রন্থের মধ্যে শ্রীবিদ্যা ভাষ্যও আছে; ইহাতে ২য় গ্রীব থেকে প্রাপ্ত পঞ্চদশী বিদ্যার ব্যাখ্যা আছে। অগস্ত্য এবং লোপমুদ্রা উভয়েই শ্রীবিদ্যার উপাসক ছিলেন। প্রসিদ্ধি আছে ব্রহ্মসূত্রের উপরও ঋষি অগস্ত্য এক টীকা লিখেছিলেন। কিংবদন্তী অনুসারে শ্রীপতি পণ্ডিতের শ্রীকরভাষ্য তাঁরই মতানুসারী। ত্রিপুরা রহস্যের মাহাত্ম্য খণ্ড থেকে জানা যায় অগস্ত্য উচ্চকোটির বৈদিক ঋষি হয়েও মেরুস্থিত শ্রীমাতাকে দর্শন করার জন্য যখন উৎসুক হয়েছিলেন তখন দর্শন থেকে বঞ্চিত এইজন্য হয়েছিলেন যে তখন পর্যন্ত তাঁর তান্ত্রিক দীক্ষা হয়নি; ফলতঃ শ্রীমাতার দর্শন উপযোগী বিশুদ্ধ শাক্তদেহও প্রাপ্ত ছিলেন না। শেষে পরাশক্তির নিগূঢ় উপাসনার নিমিত্ত অধিকার লাভের জন্য দেবী-মাহাত্ম্য শ্রবণের পর তিনি শাক্তদীক্ষা পান। উপাসনার প্রভাবে পতি-পত্নী দুজনেই সিদ্ধিলাভ করেন। পরে এই সিদ্ধির এতটা মহত্ত্ব স্বীকার করা হয়েছে যে এঁরা দুজনেই গুরুমণ্ডলে উত্তম স্থান পেয়েছিলেন। মানসোল্লাস অনুসারে শ্রীবিদ্যার মুখ্য উপাসকের মাঝখানে অগস্ত্য এবং লোপমুদ্রা দুইয়েরই স্থান আছে।

দত্তাত্রেয়ও শ্রীবিদ্যার এক শ্রেষ্ঠ উপাসক ছিলেন। দুর্বাসার মতন তিনিও অনুসূয়ার গর্ভ থেকে সমুদ্ভূত ছিলেন। প্রসিদ্ধি অনুসারে ইনি শিষ্যের হিতসাধনের জন্য শ্রীবিদ্যার উপাসনার্থ 'শ্রীদত্ত-সংহিতা' নামক এক বিশাল গ্রন্থের রচনা করেছিলেন। পরে পরশুরাম উহা অধ্যয়ন করে পঞ্চাশ খণ্ডে এক সূত্র-গ্রন্থের রচনা করেছিলেন। বলা হয় এঁর পরে শিষ্য সুমেধা দত্ত-সংহিতা এবং পরশুরাম সূত্রের সারাংশ নিয়ে ত্রিপুরা-রহস্যের রচনা করেছিলেন। ইহাও প্রসিদ্ধি আছে

যে দত্তাত্রেয় মহাবিদ্যা মহাকালিকার উপাসক ছিলেন।

এই প্রসঙ্গে শিব-ভক্ত নন্দিকেশ্বরের কথাও স্মরণে আসে। তিনিও শ্রীবিদ্যার উপাসক ছিলেন। জ্ঞানার্ণবে তাঁর উপাসিত বিদ্যার উদ্ধারও করা হয়েছে। তাঁর রচিত গ্রন্থ কাশিকা। ইহা ছোট কারিকাত্মক গ্রন্থ। এই গ্রন্থের উপর উপমন্যুর টীকা আছে। নন্দীকেশ্বরও ষট্‌ত্রিংশৎ-তত্ত্ববাদী ছিলেন। তিনি পরমশিবকে তত্ত্বাতীত এবং বিশ্বকে ৩৬ তত্ত্বের দ্বারা রচিত বলে মানতেন। পরন্তু তাঁর দ্বারা তত্ত্বের পরিগণনায় প্রচলিত ধারা থেকে কিছু বৈলক্ষণ্য ছিল। ইহাতে সাংখ্যসম্মত পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব তো আছেই, তারপরে শিবশক্তি, ঈশ্বর, প্রাণাদি-পঞ্চক তথা গুণত্রয়ও মানা হয়েছে। এখানে প্রধান এবং গুণত্রয় পৃথক পৃথক মানা হয়েছে। কেহ কেহ বলেন 'অকারঃ সর্ববর্ণাগ্রখ্যঃ প্রকাশঃ পরম শিবঃ।' এই কারিকা নন্দিকেশ্বর কারিকার অন্তর্গত। কোন কোন গ্রন্থে লেখা পাওয়া যায় দুর্বাসা মুনি শ্রীনন্দিকেশ্বরেরই শিষ্য ছিলেন। ইহাও শুনা যায় বীর শৈবাচার্য প্রভুদেবের বচনের কন্নড় ভাষার টীকাকার দুর্বাসার-সম্প্রদায়ের অন্তর্গত ছিলেন।

(ক্রমশ :)



মায়ের চরণ

— *শ্রীমতী মীরা রুদ্র*

মায়ের চরণ ধরে থাকবো পড়ে
মনে আছে এই তো আশা।
দয়া কোরে রেখ মাগো একটুখানি ভালোবাসা।
তুমি আমায় বাসো ভালো
মনে মনে জানি
তবুও কেন কাঙাল হয়ে
মনের কথা না মানি ?
দূরে থেকে দেখে তোমায়
নয়ন না মোর ভরে
কাছে এসে দাঁড়াও মাগো
দেখি দুচোখ ভ'রে।
হৃদয় আমার তোমার আলোয়
শুভ্র জ্যোতির ঢেউয়ে
বিকশিত পদ্মসম উঠলো জেগে
তোমার পানে চেয়ে চেয়ে।
হলাম আমি ধন্য যে আজ তোমার করুণা পেয়ে।

ভিক্ষু আমি

— 'আনন্দস্বরূপা'

প্রণমি তোমারে মাত:
ভিক্ষু আমি আসিয়াছি তব দ্বারে।
পার্থিব সম্পদ চাহিনাকো মাগো,
আসিয়াছি কৃপা ভিক্ষা তরে।।
জন্ম জন্মান্তর ভিক্ষা বৃত্তি করিতেছি
তোমারই দুয়ারে।
অপার করুণায় পাইয়াছি তব দয়া
অহৈতুকি কৃপা লভি ধন্য আমি।।
ভিক্ষু আমি.........
সূর্যের ষড়মণ্ডল ভেদ করি
যেথা তুমি বিরাজিত অপার মহিমায়,
দেব ঋষিগণ যেথা ভূমানন্দে করিতেছে পান অমৃতের স্বাদ।
ভিক্ষু আমি.........
সেই অমৃতের লাগি মাগো।
আসা যাওয়া, যথাসনে সম অধিকার লাগি ভাগাভাগি,
সম্পদ বন্ধন, ব্যর্থ বেদনার জ্বালা সহে নাকো আর।
তব কৃপা লাগি ব্যাকুলিত প্রাণ।।
ভিক্ষু আমি.........
দিনশেষে সর্ব অধিকার দিয়াগো অঞ্জলি,
শুধু মাগি অমৃতের স্বাদ
সাধন ভজন হীন অতি অভাজন তব দ্বারে
ভিক্ষু আমি তব কৃপা লাগি
চাহি মাগো অমৃতের স্বাদ
ফিরায়ে দিওনা মাত: কর আশীর্ব্বাদ।
ভূমানন্দে লভি যেন অমৃতের অব্যর্থ আস্বাদ
এরই তরে ভিক্ষু আমি।।
প্রণমি চরণে মাত:।।

মাকে মনে পড়ে

—*স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজ*

।। মা ।।

মা কথাটি আনন্দের। পরমানন্দের। পরম শান্তির। যে ভাষাতেই হউক শিশুর অধরে যে কথাটি প্রথম আসে তা হলো 'মা'। ব্যতিক্রম থাকতেই পারে। তবে তার পরিসংখ্যান এতোই কম, যা ধরা ছোঁওয়ার বাইরে।

"খোকা মাকে শুধায় ডেকে, 'এলেম আমি কোথা থেকে
কোনখেনে তুই কুড়িয়ে পেলি আমারে?'
মা শুনে কয় হেসে কেঁদে, খোকারে তার বুকে বেঁধে-
'ইচ্ছা হয়ে ছিলি মনের মাঝারে।"

[শিশু, জন্মকথা-রবীন্দ্রনাথ]

মায়ের এই ইচ্ছার ধন হলো তাঁর সন্তান। সূর্য্যের প্রথম আলোতে যেমন শতদল বিকশিত হয়, তেমনি সন্তানের মুখশ্রীর প্রথম দেখাতেই নারীর সমস্ত জীবনের চাওয়া-পাওয়ার ধন মাতৃত্ব বিকশিত হয়। যাঁকে সে সমস্ত জীবনের সবকিছু দিয়ে কিনে নিতে পারে। আর এজন্যই মাকে আমাদের সমাজ জীবনে সবচেয়ে উঁচু স্থান দেওয়া হয়েছে। যেখানে বাবা বা অন্যান্য সম্বন্ধ বুঝাবার জন্য কাব্য বা ততোধিক ব্যবহৃত হয়, সে ক্ষেত্রে মার জন্য ব্যবহৃত হয় শুধুমাত্র দুটি অক্ষর - 'মা'। ম+আ = 'মা' এ অক্ষর তুলনা বিহীন। ব্রহ্মের বাচক বা বীজমন্ত্র যেমন 'ওঁ' তেমনি 'মা' অক্ষরটিও একটি বীজমন্ত্র সম, যা স্নেহ, দয়া, মায়া প্রভৃতি অনেক কিছুর দ্যোতক। পৌরাণিক কথা—শ্রীকৃষ্ণের পরিমাপ হবে। একদিকে শ্রীকৃষ্ণ। অন্যদিকে অপরিমেয় দ্রব্য সম্ভার। কিন্তু সমান আর হয় না। সমান হলো একটি তুলসী পত্রে শুধুমাত্র 'কৃষ্ণ' নাম লিখে স্থাপন করার পর। মায়ের ক্ষেত্রেও, মায়ের পরিমাপ শুধু মা'ই। অন্য কিছুই নয়। আর এজন্যই শাস্ত্রীয় উক্তি, 'মাতৃদেবো ভব।' 'পিতৃদেবো ভব, আচার্যদেবো অতিথি দেবো ভব, দেবদেবো ভব' বলা হলো পরে। কারণ একটাই - মা তুলনা বিহীন। অতুলনীয়। কথাও আছে— 'সব ঋণ শোধ হয়, শোধ হয় না শুধু মাতৃ ঋণ।' আরো বলা হয়— 'কুপুত্র যদি বা জন্মে, কুমাতা কদাপি নয়।' মা তাঁর স্নেহের আচলখানি দিয়ে জন্মলগ্ন হতে সন্তানকে সুখে-দুঃখে, রোগে-শোকে, সন্তাপে-বিপদে সব সময় ঢেকে রাখেন।

"সন্ধ্যার আঁধারে শূন্য বিধবার ঘরে
একটি মলিন দীপ শয়নশিয়রে
একা শোকাতুরা নারী।"

[কথা, বিসর্জন-রবীন্দ্রনাথ]

একটি ছোট্ট আখ্যায়িকায়ও মাতৃস্নেহের মূর্ত রূপটি সুন্দর করে ফুটে উঠছে। যুবক পুত্র। মাতৃভক্ত। আবার প্রেয়সীর প্রতিও বিশেষ অনুরক্ত। প্রেয়সী বললো — একজনকে বেছে নাও। যদি আমাকে চাও, মায়ের শির কেটে এনে দাও। দারুণ সমস্যা। ছেলে মাতৃশিরই কাটলো। প্রেয়সীর কাছে নিয়ে চললো। ঘরে ঢুকতে গিয়ে দরজায় বাধা পেলো। খণ্ডিত শির তক্ষনি বলে উঠলো — বাছা! লাগেনি তো তোর? এই হলো মা। এই হলো মাতৃস্নেহ।

পরশুরাম মাতৃহন্তা। অঙ্গদ মাতৃহন্তা। কিন্তু ইতিহাসের পাতায় আজো বোধহয় এমন কোনো দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া যাবে না যে, কোনো প্রতিষ্ঠিতা জননী তাঁর সন্তানকে নিধন করেছেন। গঙ্গা? কারণ অন্য। শকুন্তলা ও প্রমদ্বরা নিশ্চয় মাতৃ-ত্যাজিত। কিন্তু অবস্থানুরূপে। মাতৃ মনোবেদনা সেখানেও নিভৃতে নীরবে কেঁদে মরেনি একথা কে বলতে পারে? আর কর্ণের জন্য কুন্তীর মনোবেদনা তো চিরকালের বিবশ মাতৃ-হৃদয়ের মনোবেদনা।

"ত্যাগ করেছিনু তোরে,
সেই অভিশাপে পঞ্চপুত্র বক্ষ করে
তবু মোর চিত্ত পুত্রহীন; তবু হায়,
তোরই লাগি বিশ্ব-মাঝে বাহু মোর ধায়,
খুঁজিয়া বেড়ায় তোরে। বঞ্চিত যে ছেলে
তারি তরে চিত্ত মোর দীপ্ত দীপ জ্বেলে
আপনারে দগ্ধ করি করিছে আরতি
বিশ্বদেবতার।"

[কর্ণকুন্তি সংবাদ-রবীন্দ্রনাথ]

সন্তানের জন্য জননীর আত্মত্যাগের প্রাত্যহিক চিত্র তো আছেই। প্রত্যেক মহৎ জনদের বড় হয়ে উঠার পিছনেও তাঁদের জননীদের অবদান ও আত্মত্যাগের কাহিনীও কম নেই।

দেবকী শ্রীকৃষ্ণের জন্মদাত্রী। কতোই না দিন কেটেছে তাঁর কংসের কারাগারে। যশোদা গোপালকে পেলেন। তাঁর হৃদয় বাৎসল্য রসে ভরে উঠলো। কাব্য, সাহিত্যের পাতায় হাজারো ঘটনায় তার স্থান হলো। কিন্তু দেবকী? তার পরিচিতি শুধুই 'দেবকীপরমানন্দে।'

শ্রীরামচন্দ্রের মা কৌশল্যা। পুত্রের রাজ্যাভিষেক হবে। প্রত্যেক মাই তাঁর সন্তানের শ্রী ও সমৃদ্ধি চায়। কৌশল্যাও নিশ্চয় চেয়েছিলেন। ঠিক সেই সময়েই রামচন্দ্র চলে গেলেন বনে। পিতৃসত্য পালন করে রাম রামায়ণের মর্য্যাদা পুরুষ। কিন্তু কৌশল্যা কি পেলেন? আদর্শ মাতা। কিন্তু রামের চোদ্দ বছরের বনবাস কালে তাঁর হৃদয় কি কখনোই বিদীর্ণ হয়ে যায়নি? নিঝুম রাতের নিভৃত নিরালায় তাঁর চোখের জলে রাজপ্রাসাদের কঠিন পাষাণ যে কতোদিন ভিজে গেছে তার খবর কে রাখে?

কুন্তীর দ্বাদশ বর্ষ বনবাস ? এক বৎসর অজ্ঞাত বাস ? দ্যুতক্রীড়ায় ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির পরাজিত। পঞ্চপাণ্ডব ও দ্রৌপদী দ্যূতক্রীড়ার পণ। তাঁরা বনে চললেন। কুন্তীও সে পথই বেছে নিলেন। শুধু মা বলেই তো ? সন্তানের জন্য মায়ের উজ্জ্বল মহিমা।

আচার্য শংকর, শ্রীচৈতন্য ও এমনি আরো অনেকের জননীদের জীবন কাহিনীও তো তাই। ত্যাগ আর তিতিক্ষাই তো তাঁদের জীবন চিত্র। আর এজন্যই মা বিশ্ববন্দিতা। বিশ্বনন্দিতা। সবকিছু থেকে আলাদা। সব থেকে বৃহৎ। সব থেকে মহৎ। সর্ব দেবদেবী। সর্ব তীর্থ সার। একবার কার্তিক ও গণেশকে বিশ্ব পরিক্রমার কথা বলা হলো। কার্তিক বের হয়ে গেলেন তাঁর ময়ূরকে বাহন করে। গণেশ মাকে পরিক্রমা করে, প্রণতি জানিয়ে পরিক্রমা সমাপন করলো। তাৎপর্য মা'ই বিশ্বের মূর্ত প্রতীক। সর্বতীর্থ সার।

কথিত আছে — 'জননীজন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরিয়সী।' বেদ আমাদের আকর ধর্মগ্রন্থ। যাগযজ্ঞের কথা সেখানেই বেশি করে বলা হয়েছে। উদ্দেশ্য অভীষ্ট সিদ্ধি। স্বর্গপ্রাপ্তি। স্বর্গ জরামরণ রহিত। দুঃখ বিবর্জিত। সুখের আগার। আমাদের আদর্শ ও উপাস্য দেবতাদের আবাসস্থল। তা থেকে আমাদের জনমানসে গড়ে উঠেছে যুগ যুগ ধরে স্বর্গের এক সুখচ্ছবি। স্বর্গসুখ। প্রকৃত তাৎপর্য যাই হউক, স্বর্গই আমাদের সর্বশেষ কাম্য। তা থেকেই এসেছে 'স্বর্গপ্রাপ্তি', 'স্বর্গারোহণ' কথাগুলো। কিন্তু জননীকে এখানে তুলে ধরা হয়েছে তারচেয়েও বড় করে। জননীর শ্রেষ্ঠ মূল্যবোধ।

প্রার্থনা মন্ত্রে উক্ত হয় — 'ত্বমেব মাতা চ পিতা ত্বমেব।' বলা হয় — 'মাতাপিতা ভয়ত্রাতা জননী জনতারিণী'। উপাস্যকে আমরা মাতৃসম করে পেতে চাই। কারণ জাগতিক মা যেমন আমাদের একান্ত কাছের, একান্ত আপনার ও স্নেহ-মমতার উজ্জ্বল প্রতিমা, উপাস্যও হয়ে উঠুন তাই। রূপান্তরিত হউন প্রিয়তে। আর মাতৃ-সাধনার মূল উৎসও কিন্তু এখানেই। প্রিয়বোধ থেকেই, স্নেহ-মমতা ও কোমলতার ভাবনা থেকেই মন্দিরে মন্দিরে মাতৃ-প্রতিমা গড়া। 'তোমারি প্রতিমা গড়ি মন্দিরে মন্দিরে।' মাতৃরূপেণ সংস্থিতা।

একালের ভজন — 'মা হি কাশী, মা হি মক্কা, মা সে বড়কর তীরথ নহি কোই।' কাব্য, সাহিত্যে ফুটে উঠেছে মায়ের এমনি আরো কতোই না ছবি।

মধুর আমার মায়ের হাসি
চাঁদের মুখে ঝরে
মাকে মনে পড়ে আমার মাকে মনে পড়ে।
তার মাথায় ভরা সজল দিঠি
সে কি কভু হারায়।
সে যে জড়িয়ে আছে ছড়িয়ে আছে
সন্ধ্যা রাতের তারায়
সেই যে আমার মা।

বিশ্বভূবন মাঝে তাহার নেইকো তুলনা
সেই যে আমার মা।
তার ললাটের সিদূর নিয়ে ভোরের রবি ওঠে
আলতা পরা পায়ের গোরায়
রক্ত কমল ফোঁটে
প্রদীপ হয়ে মোর শিয়রে
কে জেগে রয় দুখের ঘরে
সেই যে আমার মা।
বিশ্বভূবন মাঝে তাহার নেইকো তুলনা।

কিন্তু এই মা দেহজ মা। পার্থিব মা। পার্থিব সবকিছুর মতো এই মায়েরও একদিন বিনাশ আছে। আছে অবসান। মাটির মা চিন্ময়ী হয়ে বর্ষে বর্ষে ফিরে ফিরে আসেন পূজার বেদিতে। কিন্তু এই মা চলে গেলে আর কোনো দিনই ফিরে আসেন না। তাই সন্তান তাঁরই স্মৃতি বহন করে বেড়ায় জীবন ধরে বিপদে-বিষাদে, আনন্দ-উৎসবে।

"শুধু যখন আশ্বিনেতে ভোরে শিউলিবনে
শিশির-ভেজা হাওয়া বেয়ে ফুলের গন্ধ আসে
তখন কেন মায়ের কথা আমার মনে ভাসে।
কবে বুঝি আনত মা সেই ফুলের সাজি বয়ে-
পূজোর গন্ধ আসে যে তাই মায়ের গন্ধ হয়ে।"
[শিশু ভোলানাথ, মনে-পড়া-রবীন্দ্রনাথ]

আর এই হারিয়ে যাওয়া মাকে ফিরে পাবার জন্যই সমস্ত জীবন ধরে সন্তানের কতোই না আকুতি।

ও তোতা পাখি রে
শিকল খুলে উড়িয়ে দেবো
মাকে যদি এনে দাও
আমার মাকে যদি এনে দাও।
কেউ বলে মা ভোরে বেলায়
চাঁপার বনে ফুলের মালায়
ফুল কুড়িয়ে কখন যেন ঠাকুর ঘরে আসে,
ভোরের আলো ফোটার আগে
জেগে কত খুঁজি মাকে
চাপাতলায় ঠাকুর ঘরে বাড়ির আসেপাশে
আমাকে মা ভুলেই গেছে, পাইনা তাকে আর কোথাও।

কেউ বলে রোজ নিশুত রাতে
তারার দেশের আঙ্গিনাতে
মা দেখা দেয় চুপিচুপি আলো ছায়ার মাঝে।
রোজই ভাবি জেগে থাকি
মা কি আমায় দেবে ফাঁকি
কখন যে ঘুম জড়িয়ে আসে
বুঝতে পারি না যে,
পাখি তুমি লক্ষ্মী আমায় মায়ের কাছে নিয়ে যাও।

বিশ্ব ও বিশ্বাতীত মা

কিন্তু মা কি ফিরেন? ফিরেন না। আর এজন্যই তাঁকে বিশ্ব হ'তে বিশ্বাতীত করে দেখার প্রয়াস। 'ব্যাপিয়া সমস্ত বিশ্বে দেখো তারে সর্বদৃশ্যে বৃহৎ করিয়া।' একদিকে মা যেমন রূপবতী সাকার; আবার তিনি রূপের অতীত, অরূপও। অরূপ তোমার রূপের লীলায় জাগে হৃদয়পুর। নয়ন সম্মুখে তুমি নাই, নয়নের মাঝখানে নিয়েছ যে ঠাঁই। দেবতাকে যেন আমরা বিশেষ পুণ্যলগ্নে রূপময় করে পাই, আবার পুণ্যলগ্নের অবসানে তিনিই হন রূপের অতীত, অরূপ, তেমনি মাকেও আমরা একসময় পাই রূপময় করে, সাকাররূপে, আবার অন্যসময় পাই রূপাতীত ও নিরাকারা করে। রূপে-অরূপে দু'ভাবেই তিনি নিত্যসত্য। একটিকে বাদ দিলে অন্যটিকে পাবার প্রয়াস শুধুই অপপ্রয়াস। একই মুদ্রার এদিক-ওদিক। মুদ্রার দুটোদিকই যেমন সত্য, নতুবা অপূর্ণ, তেমনি মাও রূপ-অরূপ নিয়েই পরিপূর্ণ সত্য। কেন না মা তো ক্ষুদ্র নন, মা বৃহৎ ও মহৎ। তাই তাঁর মাঝে রয়েছে ভূমার প্রকাশ। আর 'যদবৈ ভূমা তৎ সুখম্।' ভূমা বলেই তিনি সুখ ও শান্তির আগার। 'নাল্পে সুখমস্তি।' যদি তিনি বৃহৎ না হয়ে ক্ষুদ্র হতেন, তাহলে কি তিনি সন্তানকে ধারণ করতে পারতেন? করতে পারতেন এমন অন্তহীন মহৎ ত্যাগ? পারতেন সন্তানকে এমন বড় করে তুলতে? মহৎ করে তুলতে? কে না জানে সন্তানের জীবনে মায়ের প্রভাবই বেশি। মহৎ ও বৃহৎ বলেই পারেন। মন্দিরে মন্দিরে প্রতিমাতে যেমন একই শক্তির প্রয়াস, তেমনি অসংখ্য মূর্তিমতী মায়েতেও রয়েছে সেই একই শক্তির প্রকাশ। প্রতিমার মতে এখানেও পরিমাণগত প্রভেদ আছে, কিন্তু গুণগত কোনো প্রভেদ নেই। শক্তিরূপে এক; শরীর ভেদে আলাদা। একই শক্তি হন আমার মা, তোমার মা, রামের মা, রমার মা। অর্চনার অবসানে প্রতিমা যেমন রূপায়িত হয় শুধুমাত্র মাটির প্রতিমায়, তেমনি মূর্তিমতী মাও শক্তিহীনা হলে তিনিই তখন হন মৃতা। শব। মাটির প্রতিমায় শক্তিকে দেখতে পারলে, অনুভব করতে পারলে যেমন অনন্ত শক্তির আধার মাকেই পাওয়া যায়; তেমনি রক্তমাংসের মায়ের মধ্যেও শক্তিকে দেখতে পারলেই যথার্থ মাকেই পাওয়া হয়। তখন মা হারিয়েও হারান না। তখন কে বলে গো মা নেই? রূপ থেকে তাঁর শুধুই অরূপে রূপান্তর। মা তখন শক্তিরূপেণ সংস্থিতা। সবরূপেতে সব কিছুতে। তখন হারানো মার জন্য আর দুঃখ পেতে হয় না। তখন মা হারালে মা'ই রয়। পূর্ণ মা পূর্ণ হয়েই বিরাজ করেন।

[ক্রমশ:]



মাতৃ-স্বরূপামৃত

[পূর্ব্বানুবৃত্তি]

— শ্রী প্রিয়ব্রত ভট্টাচার্য্য

মা তাঁর যে স্বরূপ প্রকাশ করেছেন তাতে নানা প্রশ্ন উঠেছে, যুগে যুগে আরো কত প্রশ্ন উঠবে। কিন্তু রহস্যময় নারায়ণতত্ত্বের আলোচনায় তাঁকে পূর্ণব্রহ্ম নারায়ণ বলে যদি ভাবা যায় তাহলে ব্রাহ্মণ্যশাস্ত্রের অবমাননা হবে না।

আসলে ব্রহ্মতত্ত্ব ব্রাহ্মণ্যশাস্ত্রে যা ব্যক্ত হয়েছে তা আর কতটুকু? ব্রহ্ম কোন শ্রেণীতে নেই, তিনি বর্ণাশ্রমের বাইরে, সকল সংস্কারের উর্ধে, সংস্কারাবদ্ধ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সমগ্রশক্তির দ্বারা তাঁর মাহাত্ম্যও বর্ণনা করা যায় না, তাঁকে ধরা তো দূরের কথা। অথর্ববেদ চমৎকার কথা বলেছেন — "ব্রাত্যস্তং প্রণৈকঋষিরত্তা বিশ্বস্য সৎপতি: / বয়মাদ্যস্যদাতারঃ পিতাস্তং মাতরিশ্বনঃ।" অর্থাৎ ব্রহ্ম ব্রাত্য, তিনি কোন শ্রেণীতে নেই। তিনি দেবদেবীর শ্রেণীতে নেই, নেই কোন অবতারের শ্রেণীতে, তিনি শ্রেণীহীন। তাঁর সঙ্গে কিছুর তুলনা হয় না, তবে নারায়ণের সঙ্গে তাঁকে তদাত্মক ভাবে দেখা হয় শাস্ত্রীয় বিচারে, তাই মা পূর্ণব্রহ্ম নারায়ণ বললে অব্যহত খণ্ডিত হয় না। সবাই যে মাকে এই পূর্ণব্রহ্ম নারায়ণ ভাবে ভাবদৃষ্টিতে দেখেছে তা নয়, তবে নবদ্বীপের সেবাদাসী নামে এক বৈষ্ণবী মাকে গোবিন্দ বলে জেনে ছিলেন বুঝেছিলেন। সেবাদাসী বাইশ বছর কিছু আহার করেন নি। জলও গ্রহণ করতেন না। গোবিন্দের চরণামৃত মাথায় ধারণ করতেন। গোবিন্দের সঙ্গে তাঁর কথাবার্তা হত। গোবিন্দজী সেবাদাসীকে বলেছিলেন, "যে দেহে গোবিন্দ বিরাজ করিতেছেন সেই দেহ নবদ্বীপে উপস্থিত, তুমি নিজে যাইয়া তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়া লইয়া আস।" (শ্রীশ্রী মা আনন্দময়ী প্রসঙ্গ, ২য় ভাগ, পৃ: ১২২)। মা সেবাদাসীর আবাহন স্বীকার করে তাঁর কাছে নৌকা করে গেলেন। মা সেবাদাসীকে সবাইর সামনে জিজ্ঞাসা করলেন "কত দিন হইতে গোবিন্দ এ দেহে বিরাজ করিতেছেন?" সেবাদাসী উত্তরে জানালেন যে ছোটবেলা হতেই গোবিন্দ মার দেহে বিরাজিত। এখানে সেবাদাসীর আমন্ত্রণ গ্রহণ এবং সেবাদাসীর বক্তব্যের মধ্য দিয়ে মা যে তাঁর আত্মপরিচয় প্রকাশ করেছেন, তা মায়ের পূর্ণব্রহ্ম নারায়ণ স্বরূপের চমৎকার অভিব্যক্তি বলে ধরা যায়।

মা তাঁর আপন খেয়ালে স্বরূপ প্রকাশ করেন। গুরুপ্রিয়াদিদি শ্রীশ্রী মা আনন্দময়ী দ্বিতীয় ভাগে লিখেছিলেন যে নিশিবাবুর প্রশ্নে মার মুখ থেকে বের হল তাঁর স্বরূপ পরিচয় শব্দ — "পূর্ণ ব্রহ্ম নারায়ণ।" জানকীবাবুর প্রশ্নেও স্বরূপ প্রকাশিত হল, "পূর্ণ ব্রহ্ম নারায়ণ" বলে (শ্রীশ্রী মা আনন্দময়ী, ২য় ভাগ, পৃ: ৮৮)। এই মহাপ্রকাশে যে শব্দতরঙ্গ উঠে ছিল মাতৃদেহ থেকে তা তো সন্তানদেরই ভাবনার শব্দমূর্ত্তি। যা শুনতে চাওয়া হয়েছিল তাই তো শোনা গেল।

ভোলানাথও জিজ্ঞাসা করেছিলেন "তুমি কে?" মার মুখ থেকে তখন বের হ'ল 'মহাদেবী'। একই সময়ে মা একবার হলেন "নারায়ণীও"। মার স্বরূপ পরিচয় বাক্যে এই যে বিভিন্নতা প্রকাশিত হল, নারায়ণ, নারায়ণী এবং মহাদেবী প্রভৃতি শব্দে, তার কারণ কি? শ্রীশ্রী মা আনন্দময়ী ২য় ভাগে গুরুপ্রিয়াদিদি মায়ের শ্রীমুখ দিয়ে যা শুনেছেন তা তো বক্তারই ভাবনার প্রতিফলন। প্রশ্নকর্ত্তাদের স্ব-স্ব ভাবনার প্রকাশই তো ঘটেছে মাতৃবাক্যে। আসলে নারায়ণ, নারায়ণী এবং মহাদেবী তো একাত্মক। মা তাই বলেছেন, "মোট কথা মূর্ত্ত অমূর্ত্ত বলিয়াও কোন কথা নাই। যে কিছুই পূর্ণকেই বুঝাইতেছে।" মা নিজে ব্যাখ্যা করে যা বলছেন "পূর্ণব্রহ্ম নারায়ণ" সম্পর্কে তাকে কিন্তু ভক্তদের ভাবানুযায়ীই বলতে হবে। নারায়ণ ও নারায়ণী যে অবিচ্ছেদ্য তা বুঝে নিতে মাতৃভক্তের অসুবিধা হবে না কিন্তু মহাদেবীতে এসে ভক্ত ভাবনায় আটকে থাকার সম্ভাবনা দেখা গেল, তাই ভক্তের ভাবানুযায়ী মা আবার বলে উঠলেন — "নারায়ণ শব্দটাই ঠিক ভাবে বাহির হইয়াছিল।" (শ্রীশ্রী মা আনন্দময়ী, ২য় ভাগ, পৃ: ৮৯)। ভক্তদের ভাবে মা তখন আরো প্রকাশ করেছিলেন, "আর মহাদেবী শব্দটা বাহির হওয়ার একটা কারণ এই যে, যখনই যে দেবী বা দেবতার পূজা করা হয়, পূজক তদ্ভাবাপন্ন হইয়া যায়।" আসলে মা পূর্ণ, অখণ্ড রূপে এলেও পূর্ণ। মা বলেছেন — "পূর্ণ, তাই যখন যে রূপে প্রকাশ সেই রূপেই পূর্ণতা। সত্যের প্রকাশ ঐ। পূর্ণ কথাটাও কিন্তু সম্পূর্ণ কথা নয়।" কারণ পূর্ণকে জানা যায় না-পূর্ণ তো স্বয়ং।

গুরুপ্রিয়াদিদি লিখেছেন যে শাহবাগে একবার মাকে তাঁর পরিচয় পুন: পুন: জিজ্ঞাসা করেন, তখন মা তাঁকে একটা লেবুর কাঁটা নিয়ে আসতে বলেন। একটা ফল দিয়ে দোয়াত বানানো হল। লেবু কাঁটা রূপ কলম দিয়ে মা গুরুপ্রিয়াদিদির হাতে কি কাপড়ে সেই দোয়াতের কালি দিয়ে লিখে দিলেন, "নারায়ণ।" প্রশ্ন ওঠে স্বয়ং পূর্ণব্রহ্ম কি আত্মস্বরূপ ব্যক্ত করতে পারেন? স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গীতায় আত্ম পরিচয় দিয়েছেন, তিনি পরমাত্মা পরব্রহ্ম, নারায়ণও তো তিনিই। যোগযুক্ত অবস্থায় শ্রীকৃষ্ণ গীতায় আপন স্বরূপ ব্যক্ত করেন, তেমনি মার স্বরূপ প্রকাশ যোগযুক্ত অবস্থায়। মা তাঁর পূর্ণব্রহ্ম স্বরূপে নারায়ণতত্ত্বে সর্বদা স্থিত। তাঁর কথা বলা, চলা, নিদ্রা, আহার-সব সময়ই তিনি যোগযুক্ত অবস্থায় আছেন বা সমাধিস্থ অবস্থায় আছেন। মা নারায়ণ বলেই যোগযুক্ত অবস্থায় থাকেন। মা বলেন — "শোন, আমি ত সব সময়ই শুইয়া থাকি, তোমার সঙ্গে যে কথা বলিতেছি এও শুইয়াই আছি" (শ্রীশ্রী মা আনন্দময়ী ৪র্থ ভাগ)। শুয়ে থাকেন কেন তিনি? বিষ্ণুপুরাণ বলেছেন — "একার্ণবেতু ত্রৈলোক্যে ব্রহ্মা নারায়ণাত্মক।" নারায়ণ ব্রহ্মা রূপে সলিলে অনন্ত শয়নে থাকেন। এই যে সলিল তাতে সবকিছু ছিল। কি ভাবে নারায়ণ সলিলে থাকেন? কূর্মপুরাণ বলেন — "নারায়ণো মহাযোগী" (কূ.পু. পূর্বভাগ, ৬/২৭) অর্থাৎ তিনি শেষ নাগকে আশ্রয় করে যোগনিদ্রায় মগ্ন থাকেন, "যোগনিদ্রাসমাসাদ্য শেষাহি শয়নে দ্বিজা।" মৎস্যপুরাণ তা স্বীকার করে বলেছিল যে নারায়ণ মহাসলিলে তপোমগ্ন থাকেন (মৎস্য, পু. ১৬৮/১৫)। নারায়ণ নিদ্রাগত বলা হচ্ছে-এখানে নিদ্রা বলতে স্থিতি বুঝায়। নিদ্রাকালীন নারায়ণ অব্যক্ত, নিত্য, স্থাণু, অপরিবর্ত্তনীয় — এক। তখন তিনি পূর্ণ, পুরুষ, অনাদিকাল, অজ, কারণ ও কেবল। তিনি যখন নিদ্রা থেকে জাগেন তখন সক্রিয় হন। গতি

আছে বলেই তিনি সূত্রাত্মা হয়ে প্রবেশ করেন সবকিছুর মধ্যে। থাকেন বলেই তিনি গুণাতীত এবং একই সঙ্গে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের গুণ ও ভাব তাঁর মধ্যে সক্রিয় হয় সৃষ্টির প্রয়োজনে।

নারায়ণকে মহাভারতে বলা হয়েছে "পঞ্চরাত্রস্য কৃৎস্নস্য বেত্তা তু ভগবান স্বয়ম্" (মহা. ভা. শান্তি পর্ব. ৩৪৯/৬৮) অর্থাৎ নারায়ণ স্বয়ম্ ভগবান। পুরুষ নারায়ণকে মহাভারতে বলা হয়েছে যে নর ও নারায়ণ একই সত্তা। এই পূর্ণসত্তা দ্বিধা বিভক্ত হয়েছিল। "এষ নারায়ণ: কৃষ্ণ: ফাল্গুনশ্চ নরস্মৃত" অর্থাৎ তিনি নারায়ণ কৃষ্ণ এবং ফাল্গুনী নর নামে প্রসিদ্ধ হন। তাই মহাভারতে নারায়ণই কৃষ্ণ, উভয়ের মধ্যে প্রভেদ নেই। স্বয়ং অর্জুন কৃষ্ণের স্তুতি করতে গিয়ে বলেছেন —— "স ত্বং নারায়ণো ভূত্বা হরিবাসীঃ পরন্তপ ব্রহ্মা সোমশ্চ সূর্যশ্চ ধর্মো ধীতা যমোঽনিল।" (মহা. ভা. বন পর্ব. ১২/২১) অর্থাৎ হে পরন্তপ, তুমি নারায়ণ হয়ে হরি ছিলে, হে পুরুষোত্তম, তুমি ব্রহ্মা, সোম, সূর্য, যম, ধাতা, অনিল। বনপর্বে আরো বলা হয়েছে যে কৃষ্ণ ইন্দ্রের অনুজ বিষ্ণু নামে বিখ্যাত ছিলেন। কিন্তু ইন্দ্র বৃত্রের ভয়ে প্রভু নারায়ণেরই শরণাপন্ন হন, অনুজ বিষ্ণুর সাহায্য নেন নি। "কালেয় ভয়সন্ত্রস্তো দেবঃ সাক্ষাৎপুরন্দরঃ। জগাম শরণং শীঘ্রং তং তু নারায়ণং প্রভুম।" (মহা. ভা. বনপর্ব, ১০১/৯-১১)। তাই মহাভারতে নারায়ণই আদিসত্তা। গরুড় পুরাণ বলেছেন যে স্রষ্টা নিজেই নিজেকে সৃষ্টি করেন, 'স্রষ্টা সৃজতি চাত্মানং।" এই স্রষ্টা হলেন হরিনারায়ণ, তিনি ব্রহ্মা, রুদ্র, বিষ্ণু হয়ে সৃষ্টি স্থিতি লয় করেন। (গরুড় পুরাণ ৪/১১-১২)। মহাভারত বলেছেন যে স্বায়ম্ভব মনুর কালে নারায়ণ ধর্মের পুত্র হয়ে নর, হরি, নারায়ণ ও কৃষ্ণ এই চারঅংশে অবতীর্ণ হন। তাঁদের মধ্যে নরনারায়ণ বদরিকা আশ্রমে তপস্যা করেন। নারদ তাঁদের জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে তাঁরা আবার কার উপাসনা করেন। নারদের প্রশ্নের উত্তরে নারায়ণ বলেন যে যিনি সূক্ষ্ম, সবিজ্ঞেয়, কর্মহীন, অচল, নিত্য, গুণাতীত, যা থেকে ত্রিগুণ উদ্ভব হয়েছে। যিনি অব্যক্ত হয়েও ব্যক্ত হয়ে প্রকৃতি নামে অভিহিত, সেই পরমাত্মা নারায়ণের উৎপত্তির কারণ, তাঁকেই নারায়ণ উপাসনা করেছেন। নারদ যে নারায়ণের রূপ বদরিকাশ্রমে দেখেছিলেন, তা কিন্তু নারায়ণের পরম রূপ নয় —— নারদ মূলত নারায়ণের মায়িক রূপ দেখেন।

ভাগবতে নারায়ণ তাঁর পূর্ণব্রহ্ম স্বরূপের মধ্যেই আছেন। ভাগবত বলছেন যে আদি নারায়ণ থেকেই নর নারায়ণ এবং বিংশ অবতারে শ্রীকৃষ্ণ নামে যদুবংশের বাসুদেব জাত হন। ভাগবতে ব্রহ্মা নারদকে বলেন, "নারায়ণ পরা বেদা দেবা নারায়ণাঙ্গজাঃ, নারায়ণ পরালোকা নারায়ণ পরা মখাঃ।। নারায়ণ পরো যোগো নারায়ণঃ তপঃ। নারায়ণ পরং জ্ঞানং নারায়ণ পরা গতি।" ভাগ. ২/৫৫-১৬) অর্থাৎ নারায়ণ বেদ, বেদাঙ্গ, ত্রিলোকানন্দ এবং স্বয়ং যজ্ঞ। যোগ, তপস্যা, জ্ঞান প্রভৃতির ফলাফলের কারণ একমাত্র তিনি।

মা সর্ব সময় তাঁর পূর্ণস্বরূপের মধ্যেই আছেন। সন্তান মায়ের যে রূপ প্রত্যক্ষ করে থাকে, তা কিন্তু মায়ের পরমরূপ নয়। বদরিকাশ্রমে নারদের মতই মায়ের মায়িকরূপ দেখে থাকেন মাতৃ সন্তানগণ। নারায়ণ তাঁর পূর্ণস্বরূপে অবস্থান করতে পারেন বলে ভাগবত বলেছেন, "যাই বাব মহিম্নি স্বে পরস্মিন্ কালমায়য়োঃ। রমেত গতসম্মোহস্ত্যক্তোদাস্তেতদোভয়ম।"

(ভাগবত, ২/৯/৩) অর্থাৎ যখন তিনি ভক্তি যোগ দ্বারা মায়া ও কালের অতীত স্ব-মহিমাতে ক্রীড়া করেন, তখনই গত সম্মোহ হয়ে 'আমি' 'আমার' এই দুই অভিমান পরিত্যাগ পূর্ব্বক আপনার পূর্ণ স্বরূপে অবস্থান করেন। মা পূর্ণব্রহ্ম নারায়ণ স্বরূপিনী হয়ে আমি ও আমার এই দুই অভিমান ত্যাগ করেছিলেন, তাই তাঁর 'পূর্ণব্রহ্ম নারায়ণ' স্বরূপ ভক্তের দৃষ্টিতে বা ভাবে যুক্তিগ্রাহ্য বলে ধারণা করা চলে।

মা 'পূর্ণব্রহ্ম নারায়ণ' ভাবের দৃষ্টিতে ভক্তের উপলব্ধিতে প্রকাশিত। তাহলে প্রশ্ন ওঠে তাঁর পূর্ণত্ব কোথায়? যে মায়িক দেহ নিয়ে এসেছেন তা কি সম্পূর্ণ পূর্ণ? পূর্ণব্রহ্মের জন্ম কি হয়? পূর্ণব্রহ্মের জন্মের কোন প্রশ্নই ওঠে না। অবতারের জন্ম হয়, কিন্তু মা তো অবতার নন। রূপে আসাই তো অদ্বৈতের হানিকারক। রূপে আসা মানেই জাত হওয়া। দেবতা রূপে যখন নারায়ণকে ভাবা হবে তখন তাঁর রূপ থাকবে, তিনি জাত হবেন, কিন্তু যখন তিনি ব্রহ্ম তখন দেবতা কোথায়? নারায়ণকে কখনও ব্রহ্ম ভাবে, কখন ও বা দেবতা রূপে ব্যক্ত হতে দেখা যায়। পুরাণের নারায়ণকে বলা হয়েছে জ্যোতির্ময়, তাঁর খণ্ড খণ্ড রূপ সর্বদেবদেবী এবং বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড, তাঁর জ্যোতিতে তো সব জ্যোতিষ্মান— "তস্য ভাসা সর্বমিদং বিভাতি"। নারায়ণ থেকেই "আগচ্ছতি যস্মাৎ" অর্থাৎ দেবতা সহ জীবাদি যা থেকে আসে এবং "গচ্ছতি যস্মিন" অর্থাৎ যাতে সবাই চলে যায়। সব বলতে কিন্তু সবই, মৃত্যুরও নিস্তার নেই। দেবতা আর ব্রহ্মরূপী নারায়ণ কি এক? দেবতা ব্রহ্মে লীন হয়ে যান, তাই তখন কে দেবতা আর কে ব্রহ্ম খোঁজার প্রয়োজন পড়ে না। পূর্ণব্রহ্ম নারায়ণ স্বরূপিণী মা দেবতা না হয়েও পূজা গ্রহণ করতে পারেন, আর দেবতা হলেও তাঁর পূর্ণত্বের হানি হয় না, রূপে এসেও তিনি পূর্ণই থাকেন।

পূর্ণব্রহ্ম নারায়ণ যখন মাকে বলা হবে তখন তিনি তুলনার উর্ধে, কারো সঙ্গে তাঁর তুলনা হয় না, হতে পারে না। মা আর নারায়ণ তখন একাত্মক। তবে তিনি এক হয়ে তিন হতে পারেন— 'ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব'। পূর্ণব্রহ্ম শব্দ ভগবৎ সত্তার চরম অভিব্যক্তি, তিনি অখণ্ড, পূর্ণ। তবে তাঁর কিছু অংশ নিয়ে অংশাবতার, খণ্ডাবতার, দেবতা, মানব ইত্যাদি সৃষ্টি হয়। তাঁরা ভগবান হতে পারেন কিন্তু বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের নিয়ন্ত্রক হতে পারেন না। মা ব্রহ্মভাবে নিত্যমুক্ত স্বরূপে বিরাজমান, তিনি ভাবাতীতা। তাঁর মন নেই, আপন ভাবই নেই তাঁর। ভাবুকের ভাবই তাঁর ভাব, তা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে।

জানকীবাবু তাঁর ভাবে মাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "আপনি কে?" মা শান্ত ধীর কণ্ঠে জবাব দেন— 'পূর্ণ ব্রহ্ম নারায়ণ'। জানকীবাবু মাকে বিদ্রূপ করেন এবার, 'আপনি শয়তানী।' মায়ের ভ্রূক্ষেপ নেই। হাসিমুখ, পরীক্ষার ব্যাপারটা ধরে ফেলেছেন। জানকী বাবুদের নতুন প্রশ্ন এবার, 'আপনি যে পূর্ণব্রহ্ম নারায়ণ তার প্রমাণ কী?' মা জানান, 'দেখতে চাও?' বলেই ভোলানাথকে কাছে আসতে বলেন এবং নিজেই উঠে গিয়ে তাঁর ব্রহ্ম তালুতে হাত রাখলেন। (আনন্দময়ী মায়ের কথা, পৃঃ ১৬)। ভোলানাথ 'ওঁ' শব্দ করে আপনা হতে আসন করে বসে গেলেন। তারপর "মা বেশ স্থির ভাবে বসিয়া মুখে হাসি হাসি, তামাসা দেখার ন্যায় দেখিতেছেন।

এদিকে নিশিবাবু ও জানকীবাবু আলোচনা করিতে লাগিলেন। জানকীবাবু তাঁহাদেরও কেমনই এক ভাব এই পরিস্থিতিতে। ঘন্টার পর ঘন্টা চলিয়া যাইতেছে। শান্ত স্থির, সবই অদ্ভুত স্থিতি ইহাদের মধ্যেও যেন, যাহা শোনা গিয়াছে। এই খানকার পরিস্থিতিও যেন ভিন্ন, হঠাৎ সৃষ্টি করিয়া দিয়াছিল, সাময়িকের জন্য। হঠাৎ জানকীবাবু কেমনই বিশেষ এক ভাব সহকারে একটু ব্যস্ত হইয়া মাকে বলিলেন — 'রমনীবাবুর (ভোলানাথ) এখন স্বাভাবিক অবস্থা হয়, এই আমাদের প্রার্থনা।' বেশ কিছুক্ষণ পরে মা আবার ভোলানাথের ব্রহ্মতালু স্পর্শ করিলেন। তিনি ক্রমে ক্রমে তাহারা যেরূপ চাহিয়া ছিল প্রায় সেই অবস্থায় ফিরিয়া আসিলেন।" (সক্রিয় স্বরসামৃত, চতুর্থ ভাগ, পৃঃ ১২০-২১)

মায়ের খেয়ালে এই যে লীলার অবতারণা হল তার পেছনে ভক্তদের চাওয়াই মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। তার সঙ্গে অবশ্যই ছিল মায়ের 'পূর্ণব্রহ্ম নারায়ণ' স্বরূপের প্রকাশ। ভগবান নারায়ণের পূর্ণমর্যাদা নিয়ে তিনি আবির্ভূত হয়েছেন, তিনি ছোট, মেজ বা বড় ভগবান নন তা আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। তিনি স্বয়ং পূর্ণব্রহ্ম, পূর্ণ ভগবান। ভগবান এবং স্বয়ং ভগবান কিন্তু এক নন-ঐশ্বর্য্য, বীর্য, যশ, শ্রী, জ্ঞান ও বৈরাগ্য ইত্যাদি গুণের সমাহার যাঁর মধ্যে থাকে তিনিই ভগবান হতে পারেন। স্বয়ং ভগবান একমাত্র পূর্ণব্রহ্ম। তিনি চরম পরম সত্তা, তিনি যা পারেন অন্য কেহ তা করতে পারেন না। তাঁর খেয়ালে সবকিছু হতে পারে। পূর্ণত্বে প্রতিষ্ঠিতা মা পূর্ণব্রহ্ম নারায়ণের মর্যাদা নিয়ে উচ্চারণ করে ছিলেন যে মহাবাক্য, তা একমাত্র পূর্ণব্রহ্ম নারায়ণই পারেন। পূর্ণব্রহ্ম নারায়ণ প্রাকৃতশক্তিকে পর্যুদস্ত করতে সক্ষম। ভোলানাথের প্রাকৃতশক্তিকে উপরোক্ত ঘটনার মাধ্যমে মা পর্যুদস্ত করেন মুহূর্ত মধ্যে এবং ভোলানাথকে আধ্যাত্মিক স্থিতিতে প্রতিষ্ঠার সূচনা করেন অহৈতুক কৃপায়। পূর্ণব্রহ্ম নারায়ণরূপিণী মাকে কি ভোলানাথ তাঁর সাধনার প্রথম অবস্থায়ই ধরতে পেরেছিলেন। না। তা সম্ভব হয় নি, হবারও নয়। পূর্ণত্বে প্রতিষ্ঠিতা মা স্তরে স্তরে, একের পর এক ভক্তকে সাধনার জগতে কিছু কিছু দেখান। ভক্ত এই খণ্ডরূপের তথা আনন্দের অবস্থাকে অনেকক্ষণ ধরে রাখতে পারেন, দেখিয়ে ভক্তের মত মায়েরও আনন্দ হয় — এ হল লীলানন্দ। তবে ভক্ত দেখার মধ্যে বিচারের জালে আবদ্ধ হয়ে পড়েন। ভোলানাথ যখন বিচার অবিচারের উর্ধে উঠেছিলেন, তখনই তাঁর সমক্ষে মায়ের স্বরূপ তথা পরম রূপ প্রকাশিত হয়েছিল ধারণা করতে বাধা নেই।

মা প্রকাশ করেছিলেন যে নারায়ণ বলতে শুধু চতুর্ভূজ মূর্ত্তিই বুঝায় না। (মায়ের কথা, ভাইজী)। 'নার' শব্দের পৌরাণিক অর্থের মধ্যে দেখা যায় যে প্রকৃতি, ভক্তি ও জল অর্থে এই শব্দের ব্যবহার হয়। 'অয়ন' শব্দের অর্থ তো আশ্রয়। তাই নারায়ণ হলেন যিনি প্রকৃতির আশ্রয়, ভক্তির আশ্রয় এবং জলের আশ্রয়। নারায়ণ ভাবে এলেন, ভক্তিতে এলেন, জ্ঞানে এলেন, শক্তিতে এলেন, ত্রিগুণে এলেন — তবে একথা মানতে হবে যে তিনি ঋক্‌বেদের আগেও ছিলেন, এখনও আছেন, অনাগত ভবিষ্যতেও থাকবেন। তাঁকে কোন মতবাদে সীমাবদ্ধ করা যায় না, ধরাও যায় না। পূর্বেই বলা হয়েছে পূর্ণব্রহ্ম নারায়ণের দর্শনে শ্বেতদ্বীপে নারদ

যান, দিব্যমূর্তিধারী নারায়ণের দর্শন পেয়ে তিনি অহমিকায় আচ্ছন্ন হন। পরে আকাশবাণী শুনে বুঝতে পারেন যে ভূতগুণযুক্ত নারায়ণের রূপ তাঁর পরমরূপ নয়। নারদ যাঁকে দেখেছেন তিনি মায়িক রূপে নারায়ণ। কিন্তু এ তাঁর স্বরূপ নয়। নারায়ণ পূর্ণব্রহ্ম রূপে মার সত্তায় একাত্ম হয়ে থাকতে পারেন, এ রূপও তাঁর মায়িক রূপ। নারায়ণে সর্ব দেবতা আছেন। মায়ের দেহেও পৌরাণিক সকল দেবতাকেই লক্ষ্য করা গেছে, কারণ যে যেভাবে মাকে চেয়েছেন, মা তাঁর কাছে সে ভাবেই প্রকট হয়েছেন, প্রকাশ হয়েছে রূপ-মূর্ত্তিতে এই সব সত্য হলেও, তা মার স্বরূপের পরিচয় নয়। বৃহদারণ্যকের শান্তিপাঠ মন্ত্রটির পারমার্থিক ব্যাখ্যায় দেখা যায় যে সেখানে দুটি পূর্ণ রয়েছে — প্রথমটি 'পূর্ণমদঃ', দ্বিতীয়টি 'পূর্ণমিদং'। 'অদঃ' হল তৎ, অপরিচ্ছিন্ন। অদঃ সর্বব্যাপী, নির্গুন, অব্যয়, অক্ষর, নিশ্চল, নিষ্ক্রিয় এবং পূর্ণব্রহ্ম। 'অদঃ' থেকেই বের হয় 'ইদং', যা পরিচ্ছিন্ন, ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য। 'ইদং' মায়া আবরণে আবৃত, তাঁর দেহ বিরাট, 'ভূ' তাঁর পা, 'ভূবঃ' শরীর এবং 'স্ব' তাঁর মস্তক। তিনি স্বক্রিয়, সাকার, সগুণ, কার্যব্রহ্ম বা হিরণ্যগর্ভ। হিরণ্যগর্ভই নারায়ণ রূপে, রূপে রূপে প্রকাশিত হন। 'অদঃ' এবং 'ইদং' উভয়কেই প্রণব দ্বারা প্রকাশ করা হয়, তাই উভয়েই পূর্ণ। লীলার জন্য পূর্ণব্রহ্ম নারায়ণের রূপ গ্রহণ, তাই এবার মা আমাদের 'পূর্ণব্রহ্ম নারায়ণ' রূপে প্রকাশিত হয়েছেন বলে ভক্ত ভাবের দৃষ্টিতে দেখলে বলার হয়তো কিছু থাকে না। তবে ভাবা আর স্বরূপ উপলব্ধি করা এক নয়।

[ক্রমশ:]



বিন্ধ্যাচল

—দীপা গাঙ্গুলী

মন চলে যায় বিন্ধ্যাচলে
জানিনা কোন মন্ত্র বলে।
কি দেখেছি কি দেখি নাই
চোখ ভাসে মোর অশ্রুজলে॥
ভোরের আলো সন্ধ্যা তারা
বিন্ধ্যাচলে অবাক করা।
কবে যে মার দয়া হবে
আবার হবো দিশে হারা॥
তোমার কৃপা পাব কবে
দিন যে চলে যায়।
মন যে অস্থির বড়
কবে হবে সহায়॥

ভাইজীর সপ্তম বাণী

— 'জয়'

"তাঁহাকে তাঁহার আপন ভাবে (আমাদের চোখে ভাল বা মন্দ যাহাই লাগুক না কেন) যতই রাখা যাইতে পারে ততই জগতের মঙ্গল। কদাচ ইহার ব্যত্যয় না ঘটে সর্বদা ইহার দিকে সকলের লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন। তাঁহার কোন কার্যে, এমন কি তাঁহার শরীর রক্ষা বা অসুখ অসুবিধা সম্বলিত ব্যাপারাদিতেও আমাদের আপন বুদ্ধি বিবেচনায় ঢেউ তুলিতে নাই; তাঁহার ইঙ্গিত পাইলে তাহা নির্বিচারে প্রতিপালন করিবে; নতুবা নীরবে দেখিয়া ও শুনিয়া যাওয়াই শ্রেয়।"

ধন্য ভাইজীর অন্তর্দৃষ্টি, ধন্য তাঁর সংস্কারের পাশ-মুক্ত, শুদ্ধ, স্বচ্ছ চিত্ত। চিত্ত প্রাকৃত সংস্কার থেকে মুক্ত না হলে, আকাশবৎ না হলে, সে সত্য দর্শনে সমর্থ হয় না। আমরা বিচার ও ব্যবহার করি আপনাপন সংস্কার অনুযায়ী। শ্রীমায়ের সঙ্গে ব্যবহারের সময় বা তাঁর সেবা করার সময়ও এর ব্যতিক্রম হয় না। বহু সময়েই তাই শ্রীমায়ের প্রত্যক্ষ ইঙ্গিত সত্ত্বেও আমরা আমাদের বিচার ও স্বভাব অনুযায়ী কর্মে প্রবৃত্ত হয়েছি, পরিণতিতে যার ফল আমাদের পক্ষে তখন তেমন মঙ্গলজনক হয়নি, আনন্দময়ও হয়নি।

মহাভাবময়ী মা জগতের সমস্ত ভাবের মূল কারণের সঙ্গে একিভূতা, আবার মা-আত্মারাম, আপ্তকাম, সম্পূর্ণভাবে অভাব বোধ শুন্য, নির্দ্বন্দ্ব, নির্বিকার, ভাবাতীতা। মা একাধারে যুগপৎ দুই-ই।

তাহলে আমরা ভাইজীর কথাটা একটু বুঝতে চেষ্টা করি। তিনি যে বললেন, 'তাঁহাকে তাঁহার আপন ভাবে যতই রাখা যাইতে পারে..........' ইত্যাদি। এখানে 'তাঁহার আপন' কথারই বা অর্থ কি আর 'তাঁহার ভাব' এই কথারই বা অর্থ কি? নির্বিকার আত্মারামের কি আপন-পর ভেদ আছে? মায়ের আপন কি? কে? বোঝাতে নিজেই মা বলেছেন, "এ শরীরের নিজস্ব যদি কিছু বলিতে চাও তবে জগৎময় সবই ইহার নিজস্ব' (মাতৃদর্শন)। অদ্ভুৎ কথা, মায়ের বাক্যে ব্যবহারে সীমাবদ্ধতার কোন ভাবই নেই, উচ্চ নীচ, আপন পর, কোন ভেদই নেই। ভূমা, সর্বদা-সর্বময়, সমবোধে স্থিতা। জগতের সমস্ত ভাবেব উৎপত্তি, আশ্রয় ও বিলয় স্থানের সঙ্গে মা একীভূতা। ভাইজী মায়ের এ ভাবকে বোঝাতে গিয়ে বলেছেন, 'তিনি-মহাভাবময়ী'। ঐ একই সময়ে তিনি আবার দেখেছেন জগতের সমস্ত ভাবের উর্দ্ধে স্থিতা, ভাবাতীতা, মহাভাবময়ী মা—ব্রহ্মের এই যুগপৎ রূপের আভাস দেবার জন্য মিষ্টি করে বলেছেন, "শূন্য হলে সাদা হওয়া যায়, কিংবা সকলের ভিতর হারিয়ে গেলেও সাদা হওয়া যায়। সাদা সকল রূপ নিয়ে অরূপ হয়ে আছে, অথবা অরূপের রূপই সাদা" (সদ্‌বাণী-৩৬) সত্যই ত, সাদাই ত সব রূপ

রঙের আশ্রয়। তার থেকেই ত এত রঙের জন্ম। তারই বুকে ত এত রকমারি রঙের খেলা। সাদা ভেঙেই রামধনুর সাত রং, আবার সব রং মেশালে তা হয়ে যায় সাদাই — নির্বিকার, অরূপ, নির্গুণ। এমন করেই ভাবাতীতা হন মহাভাবময়ী; সব ভাবের তিনিই ত আশ্রয়। তাঁরই বুকে ত এত সব ভাবের লীলা চলছে, আবার সব ভাব আপনাতে বিলয় করে তিনি রয়েছেন তাঁর ভাবাতীত স্বরূপে, নিরঞ্জনং, নির্বিকল্পং, ত্রিগুণরহিতং মা হয়ে। তাঁর ভাবকে আমরা জগতের কোন ভাবের সঙ্গে তুলনা করে দেখব, বুঝব ?

আমাদের ভাব ও কর্মের পিছনে থাকে আমাদের ব্যক্তিগত প্রয়োজনবোধ ও অভাব পূরণের চেষ্টা। শ্রীমায়ের আপ্তকাম স্বরূপে অভাব বোধের যে কোন স্থানই নেই। মা কতবার বলেছেন, "আমার নিজের কিছু করিবার বা বলিবার প্রয়োজন নাই; আগেও ছিল না, এখনও নাই, পরেও হইবে না। যাহা কিছু প্রকাশ পাইয়াছে, পাইতেছে বা পাইবে তোমাদের কল্যাণের জন্য।" (মাতৃদর্শন পৃ:-৩৫)। মায়ের দিব্য তনুতে কত সাধনার ধারা রূপ ধরে প্রকাশ পেল। মা বলছেন, 'আমার সাধন সম্বন্ধে আমি ত অনেকবার বলিয়াছি যে ইহা খেলা ভিন্ন আর কিছু নয় এবং জানিও জীবভাব আমাতে আছে সত্য, কিন্তু আমি জীব নই এবং অজ্ঞানতা নাশ করিবার জন্য এ দেহ সাধন করে নাই। অনেক সময় তোমাদিগকে বলি না যে, চল অমুক জায়গায় একটু বেড়াইয়া আসি। ইহার অর্থ ত এই নয় যে ঐ স্থানে আমি কখনও যাই নাই, জানাশুনা স্থানে যেমন বেড়াইতে যাওয়া হয়, আমার সাধনটাও সেইরূপ।' (মায়ের কথায় মা, পৃষ্ঠা-৫৮) এমন মায়ের আদেশ, নির্দেশ, ইঙ্গিত, চলাফেরাকে আমরা যেন আমাদের প্রাকৃত অভাব বোধের সংস্কারের মাপকাঠিতে বিচার করতে গিয়ে ভুল না করি, তাই ভাইজীর এই সাবধান বাণী।

শ্রীমায়ের লীলাতনু আশ্রয় করে যে ভাব প্রকাশ পায় তা কোন প্রাকৃত ভাব নয়, তা মহাভাবেরই স্বতোৎসারিত প্রকাশ। যে ইচ্ছাময়ের ইচ্ছায় জগতের সৃষ্টি হয়, জগতের পালন হয় — শ্রীমায়ের ইচ্ছা বা ভাব, পরমের সেই ইচ্ছার সঙ্গে অভেদ, তাই তা আপন ভাবে সদাই অশেষ কল্যাণকারী।

মায়ের ভাব সাধারণের পক্ষে সত্যিই দূর্বোধ্য। মায়ের জ্বর হলে যখন আমরা ওষুধ খেয়ে সুস্থ হওয়ার কথা বলি, তখন মা বলেন, তাঁর কাছে সুস্থ, অসুস্থ এই দুই ভিন্ন বোধই নেই, আত্মারাম তিনি সদা আত্মানন্দে আছেন। মা আরও বলেন, "তোমরা এলে ত তোমাদের চলে যেতে বলি না। 'রোগ' বেশে ওরা এসেছে, শরীরটাকে নিয়ে কদিন খেলা করবে, তারপর চলে যাবে। ওদের ওপর বিদ্বেষ কেন?" একবার মা শ্রী রাজমোহন গাঙ্গুলী মহাশয়ের কাছে বলছেন, "দেখ বাবা, একবার চাঁদপুরে এক দিন পেটের অসুখ হইল; এমন অসুখ যে পায়খানা হইতে আর ঘরে আসিতে পারি না। ৫০/৬০ বার পায়খানা যাইতেছি, তাহাতেও মহা আনন্দ, যেন এই এক মহাকীর্তন চলিয়াছে। সারাদিন এইভাবে বেশ এক আনন্দে চলিল। রাত্রিতে স্বাভাবিক ভাবে সবই খাইলাম, আর কিছুই হইল না।" এই ত আত্মস্থিত পুরুষে সর্বাবস্থায় সদাই আনন্দস্বরূপে অবস্থান। আমাদের বাইরের দৃষ্টিতে এই অবস্থা যতই কষ্টকর ও ভয়ঙ্কর দেখাক না কেন, মহাভাবময়ীর

স্বরূপের আনন্দকে কখনই তা স্পর্শ করতে সমর্থ হয় না। জগতের মধ্যে অনন্ত রূপে অনন্ত ভাবে তাঁর লীলা চললেও একই সময়ে তিনি রয়েছেন জগদাতীত তূরীয়ানন্দে, স্ব-ভাবে। মা 'স্ব-ভাবে'র অর্থ বলতেন, 'স্ব'-এর ভাব, পরমপুরুষের ভাব। আরও বলতেন-জীব সাধারণ ভাবে আছে-'অভাবের স্বভাবে'। এই নেই, এই চাই-এর মধ্যেই জীবের ঘোরা ফেরা, চিন্তা ভাবনা। মা সদা আছেন 'স্ব'-ভাবের ভাবে সদানন্দময়ী রূপে। এখানে প্রশ্ন ওঠে যে জীবের যে-এই 'অভাবের স্বভাব' তার আশ্রয় কে? তার উৎপত্তি কোথা থেকে? আর তার গতিই বা কি? শ্রীগীতায় ভগবান বলছেন, 'যতঃ প্রবৃত্তির্ভূতানাং যেন সর্বমিদং ততম্'। (শ্রীগীতা ১৮/৪৬)। জগতের যত আদি প্রবৃত্তি ও জীবের কর্ম প্রচেষ্টা-সমস্তই তাঁহাতেই উদ্ভুত। লীলার প্রয়োজনে তিনিই আপন প্রকৃতির ত্রিগুণের সাম্য ভঙ্গ করে গুণ বৈষম্যের সৃষ্টি করেছেন, আর অনন্ত আধারে অনন্ত রূপ গুণ প্রকাশ করে বিচিত্র ছন্দে লীলা করে চলেছেন।

মা নিজেই বলেছেন —

ওঁ অহং রুদ্রেভির্বসুভিশ্চরাম্যহমাদিতৈরুত বিশ্ব দেবৈঃ।
অহং মিত্রাবরুণোভা বিভর্ম্যহমিন্দ্রাগ্নী অহমশ্বিনোভা॥
....
যং কাময়ে তং তমুগ্রং কৃণোমি
তং ব্রহ্মাণং তমৃষিং তং সুমেধাম্ (দৈবীসূক্ত)

'আমিই রুদ্র, আমিই বসু, আদিত্য ও আমিই বিশ্বদেবগণ রূপে বিচরণ করি। আমি মিত্র, বরুণ, ইন্দ্র ও অশ্বিনী কুমারদের ধারণ করি...... আমি যাহাকে ইচ্ছা করি, তাহাকে শ্রেষ্ঠত্বে উন্নত করি। আমার ইচ্ছায় কাহাকেও ব্রহ্মা করি, কাহাকেও ঋষি করি। কাহাকেও আমার স্বরূপ উপলব্ধি করার বোধ প্রদান করি।'

আদ্যাশক্তি মহামায়া যুগপৎ সব-ই। তিনি নির্গুণ, নিরাকার, আবার তিনিই সগুণ, সাকার। উপনিষদের ঋষিরা অক্ষরের ক্ষরণের পূর্বের অবস্থার সংজ্ঞা দিয়েছেন 'অসম্ভুতি', আবার অক্ষরের ক্ষরণকে বলেছেন 'সম্ভুতি'। 'অনেজদ্' আত্মাকে সৃষ্টি প্রকাশের সময় বলছেন 'তদ্ এজতি'। তাঁর ঈক্ষণে আত্মার নিষ্কম্প স্থিতি থেকে এ জগৎ কাঁপতে কাঁপতে বেরিয়ে আসছে। একম, এবম্, অদ্বৈতম্ আত্মা যখন উপশম স্থিতিতে তখন ঋষিরা তাঁকে 'ব্রহ্মা' বলেছেন। আবার তাঁরই আত্মশক্তি, যিনি এ সমস্ত চরাচর ব্যপ্ত হয়ে রয়েছেন, যা হতে সকল জীবের প্রবৃত্তির প্রকাশ হয়, তিনি যখন সৃষ্টি লীলার উল্লাসে নৃত্যরতা তখন তাঁকেই ঋষিরা 'শক্তি' বলেছেন। শিব শক্তি অভেদ তত্ত্ব। তাই যখন আত্মা উপশমে তখনও তিনি শক্তি শূন্য নন। মা আত্মা, ঐ যুগপৎ সব-ই। ঐ মায়ের প্রকৃত পূর্ণ রূপ। তাঁর প্রজ্ঞান অবাধ, তাঁর স্মৃতি কালের অধীন নয়। সৃষ্টি তাঁর (কোলের ছেলে) আত্মসৃষ্টি। অব্যক্ত থেকে মহাভাবময়ীর ভাব জগতে তার প্রথম প্রকাশ, তারপর তাঁরই গর্ভে তাঁরই রসে পুষ্ট হয়ে প্রসবের পর তাঁরই কোলে আশ্রয়ে আছে।

আমরা স্থূলের সংস্কারে নাড়ি কাটার পর ভাবি মায়ের থেকে আমরা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছি। তা কি কখনও হয়? মহাভাবময়ীর স্নেহ, করুণা, মমতার নাড়ীর যোগ অবিচ্ছিন্নই থাকে। বায়ু হয়ে আমার প্রাণের সঞ্চার, জল হয়ে রসের সঞ্চার, অগ্নি হয়ে আমার তেজের সঞ্চার এখনও ত তিনিই করে চলেছেন। 'অপরোক্ষ প্রিয়' (ঐঃ উঃ) তিনি, নিজেকে সম্পূর্ণ উজাড় করে দিয়েও নিজে রয়েছেন আড়ালে। দুর্ভাগ্য এই যে আমরা এই চরম সত্যকে বিস্মৃত হয়ে আছি। ভাইজীর মুক্ত দৃষ্টি সেই চরম সত্যকে দর্শন করেছে; তাই তিনি বলছেন-লীলাময়ী মায়ের ইঙ্গিত, আদেশ বিশ্বের সর্বভূতের সর্বকালের জন্য অশেষ কল্যাণকারী, আর তা অমোঘও। এখানে আমাদের বুদ্ধি বিবেচনার ঢেউ তুলে তার আনন্দময় পরিণতির মাঝে আবর্তের সৃষ্টি করে না।

ঘর ভরা জিনিষ। শিশু একটু বড় হয়েছে, মা শিশুকে আনন্দ করে জিজ্ঞেস করছেন, কি নিবি বল। শিশু লজেন্সের বাক্সটার দিকে হাত বাড়াচ্ছে। তার বোধ বুদ্ধিতে ঐটাই সর্বোত্তম। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে শিশুর চাওয়া পাল্টাতে থাকে। আজ ব্যাট বল, তারপর বন্ধু বান্ধব, তারপর সংসার, তারপর ঐশ্বর্য। অনন্ত স্বাদে জগৎ ভোগের সব উপকরণ মায়ের ভাঁড়ারে মজুত। শ্রেয়, প্রেয় চিনিয়ে দেবার পরও সে যখন যা চায় মা তাই সামনে এগিয়ে দেন। চাওয়া মত সব কিছু পেয়েও সে কখনও বলতে পারে না; আর আমার কিছু চাই না; আমি তৃপ্ত, পূর্ণ। জগৎ থেকে তার চাওয়া কিছুতেই ফুরোয় না। দিনে দিনে আয়ু ফুরিয়ে আসে, বয়সে বৃদ্ধ হয়েও তার জানা হয় না কি চাইতে হয়, কি চাইলে অতৃপ্তি, অসম্পূর্ণতার বোধ থেকে চিরতরে মুক্তি পাওয়া যায়। যে শক্তি সামর্থ্য সামান্য, যে বোধ বুদ্ধি সীমিত, যে দৃষ্টি ক্ষমতা দেশ কালের ক্ষুদ্র সীমার বাঁধনে বাঁধা-তার ওপর নির্ভর করে, গোঁ ভরে চলে, ভাইজীর কথায় 'আপন বুদ্ধি বিবেচনার ঢেউ তুলে' জীবনে বোঝাই বেশি বাড়িয়ে তুলি আমরা। ভাইজী আমাদের এই প্রাকৃত সংস্কারকে চেনেন তাই সাবধান করে দিয়ে বলছেন যে, যে আবৃত বুদ্ধি বিবেচনা দিয়ে নিজের জীবনটাকেই আমরা গুছিয়ে আনন্দময় করে তুলতে পারিনি, সেই বুদ্ধি বিবেচনা দিয়ে মহাভাবময়ী মায়ের আদেশ, ইঙ্গিতের কি বিচার করবে? মা আমাদের মাঝে এসে, হেসে, খেলে আমাদের মত কথা বার্তা ব্যবহার করছেন দেখে আমরা ভাবাতীত মায়ের স্বরূপ বিস্মৃত হয়ে যাই।

মহাত্মারা মায়ের স্বরূপের আভাস পেয়ে স্তব্ধ হয়ে থাকতেন ও মায়ের সামনে শিশুর মত আত্মনিবেদন করে তাঁর ইঙ্গিতের অপেক্ষা করতেন। পরম শ্রদ্ধেয় গোপীনাথ কবিরাজ মশাইকে দেখা যেত যে তাঁর কাছে আগত বিভিন্ন বিদ্বজ্জনের প্রশ্নের উত্তরে কত উচ্চ শাস্ত্রীয় বিচার করে তাঁদের সন্দেহ তিনি নিরসন করছেন, কিন্তু মায়ের সামনে মাথাটি নিচু করে তিনি চুপ করে থাকতেন। কারণ জিজ্ঞেস করলে বলতেন, 'মায়ের সামনে আমার অবস্থা পাঁচ বছরের শিশুর মত হয়ে যায়, তাই কি কথা বলব?' খান্নার বাবা ত্রিবেণীপুরীজী বলতেন — 'আমি মাকে অবতার বলতে পারি না, মা ত সাক্ষাৎ দুর্গা।' একবার দিল্লীর আশ্রমে দুর্গাপূজার সময় শ্রীমা শ্রদ্ধেয় অবধুতজী মহারাজকে বললেন, "বাবা, তুমি এদের নিয়ে একটু সৎসঙ্গ কর", বলে মা কোথায় যেন গেলেন। পঞ্চবটির নিচে মাদুর্গার প্রতিমায় পূজা হচ্ছে, তার সামনের

উঠানে আমরা সবাই বসে। অবধূতজী মহারাজ বললেন — 'এই মণ্ডপে তোমরা যাঁর পূজা করছ, তিনিই হেঁটে চলে এসে আমাদের সঙ্গে কথা বলে এই চলে গেলেন। এ সত্য কি তোমরা অন্তর থেকে উপলব্ধি কর? না করলে করতে চেষ্টা কব। এটার জন্যই সকলের এ উৎসবে আসা।' এই বলে শ্রীমায়ের সম্বন্ধে শ্রীহরিবাবার উপলব্ধির এক অদ্ভুত কথা শোনালেন। বললেন যে একবার তিনি হরিবাবাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন যে অধ্যাত্ম জগতের আর কোন অনুভব কি হরিবাবার অপ্রাপ্ত আছে? হরিবাবা উত্তরে জানান যে, 'না ভগবৎ রাজ্যে অপ্রাপ্ত বলে তাঁর আর কোন কিছুই নেই। তাঁর ইষ্ট দর্শন হয়েছে, কথোপকথন হয়েছে, সব হয়েছে, তবে একটা জায়গায় একটু আটকাচ্ছে।' বললেন যে, 'আগুন যেমন আগুনকে জ্বালিয়ে শেষ করতে পারে না, তেমনি নিজের অহং দিয়ে নিজের অহং বোধের বিলয় হচ্ছে না। আর এখন দেখতে পাচ্ছি তার চাবিকাঠি রয়েছে মায়ের হাতে, তাই মা কে ধরে বসে আছি।'

এই মায়ের আদেশ-নির্দেশের বিচার কি মানুষে সম্ভব? তাই মায়ের সঙ্গে ব্যবহারের সময় ভক্তদের প্রতি ভাইজীর অনুরোধ ছিল, নির্বিচারে মায়ের ইঙ্গিত নির্দেশকে পালন করা। এখানে এখন একটা প্রশ্ন ওঠে যে এখন মায়ের লীলা বিগ্রহ স্থূল ভাবে অপ্রকট, বর্তমান প্রজন্মের কাছে ভাইজীর এই বাণীর মননের উপযোগীতা এখন কতটা? সত্য বলতে গেলে বলতে হয় বেদ, উপনিষদ, পুরাণের মন্ত্র ও বাণী সত্য স্বরূপের কালাতীত বাঙ্ময়ী মূর্তি। ঋষিদের তপস্যায় ও মননে তা তাঁদের বোধিতে প্রকাশিত হয় মাত্র। বৈজ্ঞানিক নিউটন মাধ্যাকার্ষণ শক্তির অস্তিত্ব কে অনুভব করেছিলেন, মাধ্যাকর্ষণকে সৃষ্টি করেননি। তেমন ঋষিরা সত্যের দিব্য তনুকে দর্শন ও অনুভব করেন মাত্র। 'পশ্যন্তি'র স্তরে তাঁদের দর্শন ও অনুভব আর 'বৈখরী'তে ঐ রূপেরই প্রকাশ - 'নামে', 'মন্ত্রে'। শ্রীমায়ের বাণীও কালের অতীত আদি পরাশক্তির বাঙ্ময় অভিব্যক্তি, তাই সন্তানের প্রতি মায়ের করুণাধারার মত সৃষ্টিতে তা সর্বকালের সকল জীবের জন্য সদা কল্যাণময়ী। তাই ব্রহ্মানন্দের, ভূমানন্দের স্বাদ পেতে হলে, মাতৃ হৃদয়ের করুণা অনুভব করতে হলে, নির্বিচারে মাতৃ বাণীর অনুস্মরণ, মাতৃ প্রসঙ্গ, মা-আত্মার ধ্যান ও মাতৃ নির্দেশিত পথে চলা ছাড়া আমাদের গতি কই?



দিব্য গুরুর দেশ

—শ্রী চিত্তরঞ্জন পাত্র

যেথায় কখনো করে না নৃত্য হিংসা কিম্বা দ্বেষ,
চল্ পাখী উড়ে সেথায়—
যেথায় দিব্য গুরুর দেশ।

যেথায় জীবনে নেই কোনো জ্বালা,
যেথায় রহে না 'আমি'র পেয়ালা,
যেথায় হয় না মানবতার অপমান,
উড়ে চল পাখী সেথায়—
যেথায় দিব্য গুরুর দেশ।

যেথায় জীবনে নেই কোনো ছল,
যেথায় রোদন করে না মানুষ প্রতিপল,
যেথায় থাকে না শোষিত শোষক,
যেথায় না রহে 'আমি' উপাসক
উড়ে চল পাখী সেথায়—
যেথায় দিব্য গুরুর দেশ।

যেথায় ছায়া কলুষিত নহে তমসায়,
যেথায় মানবে মরে না কোনো নিরাশায়,
যেথায় 'নির্বাণ মার্গে' আসে না ক্লেদ
দিব্য আলোকে মিটে যায় সব খেদ,
উড়ে চল পাখী সেথায়—
যেথায় দিব্য গুরুর দেশ।



আনন্দময়ী স্মৃতি

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

—কুমারী চিত্রা ঘোষ

দমদমে মা—আপতাপ মিত্রের বাগানবাড়ী। ১৫ই থেকে ১৯শে এপ্রিল, ১৯৫৩

প্রায় মাস ছয়েক পরে মা আসছেন শুনে অবধি মনটা মার আগমনের প্রতীক্ষায় ছটফট করছিল। ২রা বৈশাখ গত বছর মা এসেছিলেন। এবারও সবাই কাশী থেকে এলেন।

আমরা স্টেশনে গিয়ে অপেক্ষা করছি—ট্রেন কিছুতেই আসে না। পাঞ্জাব মেলে আসছিলেন। এবার এসে মার দমদমে ওঠার কথা। ট্রেন এত late হচ্ছে ১১টা (সকাল) বেজে গেল দেখে অনেকে বলছিল যে বোধহয় on the way Bandel এ মা নেমে পড়েছেন। যাই হোক শেষ মেশ গাড়ী এল। গাড়ী থামতেই মকে দেখতে পাইনি। এত দূর থেকে আসছেন বলে compartment এর জানলা সব বন্ধ ছিল। একটু পরেই দিদি দরজা খুললেন ও মাকে দর্শন করলাম। সেই হাসিভরা মুখ, চূড়ো বাঁধা মা আমার হেলতে দুলতে নেমে cordon এর মধ্যে দিয়ে এসে গাড়ীতে উঠলেন। গাড়ীর ভেতরেই সকলে প্রণাম করছে। মা আমার দিকে তাকিয়ে হেসে, "ভাল আছ?" বললেন।

কিছুক্ষণের মধ্যে মার গাড়ী দমদমের দিকে রওয়ানা হল। আমরাও দমদমে গেলাম। গিয়ে দেখি aerodrome এর shed এর পেছনে আপতাপ মিত্রের বাড়ী। মা লেখা লাল flag উড়ছে। মার জন্য একটা আলাদা বাড়ী করেছেন। তার নীচে দুখানা ঘর ও ওপরে ঠাকুর ঘর ও মার ঘর। মায় চূড়ো বাধা ছবিটায় জড়ির বালা ও মালা পড়িয়ে বারান্দায় টাঙ্গিয়েছেন। মার ঘরে উপরে গেলাম। ঘরের দরজাগুলিতে wire netting। মা খাটে বসে আছেন। সামনে কার্পেট পাতা। মার তিন বন্ধুর মধ্যে এক বন্ধু ও তাঁর ভাগ্নী বসে আছেন।

মা আমাদের দেখে কিছু বললেন না। আমরা ওঁদের পাশে বসলাম। কিছুক্ষণ পর আপতাপ মিত্রের স্ত্রী মার চরণ পূজার সামগ্রী ও সেবার জিনিষ নিয়ে ঘরে ঢুকলেন। মা তো কিছুতেই পা দেবেন না। খালি লুকিয়ে ফেলেন। ভদ্রমহিলা খুব সরল। 'আমার মেয়ে এসেছে' বলে মার চরণ দুটি বুকের ভিতর নিয়ে ধুইয়ে, চন্দন ও আতর দিয়ে দিল। তারপর মার কপালে সিঁদুরের টিপ দিল। এবার মাকে খাওয়ানোর জন্য পীড়াপীড়ি, গাজর দিয়ে কী মিষ্টি তৈরী করেছেন মাকে খাওয়াতে যেতেই মা বললেন যে, এ শরীর তো গাজর খায় না।

মালপোয়া, সন্দেশ ও সামান্য পায়েস মা নিলেন। তারপর মা খুব হেসে হেসে 'বন্ধুর' সঙ্গে ঘরোয়া গল্প করতে লাগলেন। 'এর মধ্যে মহারাজের যজ্ঞে আমরা গিয়েছিলুম'—আমার

মা বলাতে মা বললেন, 'কই যাবার তো কোন কথা হয়নি—উনি তো এখানে এসেছেন।' আমার খুব আশ্চর্য্য লাগল মা মহারাজকে আপনি বলে repeat করছেন দেখে। আরো কিছুক্ষণ বসে আমরা চলে এলাম। সেদিন বিকেলে দমদমে যাবার কোন ব্যবস্থা নেই। অথচ মার কাছে যেতে বড্ড ইচ্ছে করছিল। আমি তো প্রায় কাঁদ-কাঁদ। শেষে মঞ্জু-মিলনের গাড়ীতে করে মার কাছে যাওয়া হল।

গিয়ে দেখি মা বসে সৎসঙ্গ করছেন। আমরা গিয়ে বসে শুনতে লাগলাম। আজ হয়তো সব কথা মনে নেই, তবে এই কথাগুলি আজও মনে আছে—

'রোজ রাতে শোবার সময় ঠাকুরকে বলবে—ঠাকুর আমার সারাদিনের সব কাজ তোমার পায়ে অর্পণ করলাম। আমার বলার জন্য আমার আমিকেও তোমার পায়ে দিলাম। কে জানে কোনদিন পূর্ণাহুতি হয়ে যায়।'

"সাধনা মানে স্বধন—ঠাকুর তোমাকে আমি সাধছি। তুমি আমাকে তোমার করে নেও। Cupboard এ যেমন জিনিষ রাখলে নষ্ট হয় না সেরকম ভগবান প্রত্যেক জিনিষকে রক্ষা করেন, যেমন কমলালেবুর কোয়াগুলিও খোসার ভিতরে রাখা থাকে। কে করেছে গো?"

একটু পরেই ৮:৪৫ এ মৌনের সময়। মার সন্নিকটে বসে মাঠের মধ্যে কোলাহলের বাইরে মৌনাবস্থায় নিজের নিজের জপ করার সুযোগ কখনও হয়নি। মাতো অন্ধকারে স্থির হয়ে যোগাসনে বসা। আমি তো মাকে দেখব বলে চোখ খুলেই নাম করছিলাম। মার সামনে উন্মীলনই মুক্তি। মাকে অন্ধকারে ঝুঁটী বাঁধা অবস্থায় ঠিক মহাদেবের মত লাগছিল। মাঝে মাঝে কি রকম যেন উঠে যাচ্ছেন মনে হচ্ছিল। ঠিক যেন spring এর coil টানালে যে রকম মনে হয়। এক একবার স্বামীজীর ধ্যানস্থ যে ছবি দেখেছি ঠিক তার মতন লাগছিল এমন কি profile পর্য্যন্ত। মা যখন বাতি জ্বালার পর চোখ খুললেন ঠিক যেন মনে হল কোন জগত থেকে ফিরে এলেন। ৯:৩০টার একটু পরে pandal থেকে উঠে গেলেন। ডা০ সর্বাধিকারী মেসোমশাইকে নিয়ে দূরে বসে কিছুক্ষণ কথা বললেন। তারপর ঘরে চলে গেলেন।

১৬ই এপ্রিল—

ভোর বেলা উঠেই রেণু মাসীমার সঙ্গে আমি ও রেণুমাসীমা দমদমের বাসে মার ওখানে গেলাম। গিয়েই দেখি যে মা পুকুরপারে ঘাটের সিঁড়ির থামের উপর বসে আছেন। আমরা গিয়ে প্রণাম করলাম। আমি সেদিন camera নিয়ে গিয়েছিলাম, ও পরপর মাকে না বলেই মার অনেকগুলি ছবি তুললাম। মার সেই অপলক দৃষ্টি, ঝলমলে হাসি ও মাঝে মাঝে কথা শুনতে বড্ড ভাল লাগছিল। রাহুল চ্যাটার্জ্জী হঠাৎ জিজ্ঞেস করলেন, 'মা, তোমার পুকুরে স্নান করতে ইচ্ছে করে না?' মা—'খেয়াল হলেই করব। এবার কাশীতে সংক্রান্তির দিন অবগাহন করেছিলাম। ১০০ বছরের মধ্যে এমন যোগাযোগ (সংক্রান্তির দিন) আর হবে না।'

কিছুক্ষণ পরে মা এসে pandal এ বসলেন। মেয়েরা গীতাপাঠ করল। তারপর অভয় ব্রহ্মচারী গান ধরল। গান করতে করতে হঠাৎ মা 'রামনারায়ণ-রামনারায়ণ' বলে গান করতে লাগলেন। সে যে কী অপূর্ব্ব মধুর কণ্ঠস্বর তা শুনলে মনে হয় শ্রীকৃষ্ণের বংশী ধ্বনি বুঝি। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে আখর দিয়ে মার কী গান 'রাম রাম রাম রাম' ইত্যাদি। বেশ অনেকক্ষণ গাইলেন। মহারাজ কলকাতায় 'রামনারায়ণ' করছেন, মা দমদমে, কী অপূর্ব্ব আত্মিক যোগাযোগ। ডঃ নলিনী ব্রহ্ম মার 'রাম নারায়ণ' শুনে বললেন— 'মা খুব তো রামনাম করলে। আমাদের ভূত ছাড়িয়ে দাও না।' মা বললেন, "বাবা, খেয়াল হলে সকলকে নিয়ে চলে যাব।"

বাড়ীর গিন্নি গাছের কলা নিয়ে এলেন। মা প্রত্যেককে কলা নিজের হাতে ছুঁড়ে ছুঁড়ে দিলেন। তারপর ঠিক ১১টায় ঘরে যাবেন বলে উঠলেন। তখন খুকী মাসী প্রভৃতি কয়েকজন আসাতে মা বললেন, "বোধ হয় তোমাদের জন্যই আমার ঘরে যাওয়া হচ্ছিল না।"

মা এবার ভোগে বসলেন। হঠাৎ উঁকি মেরে দেখি যে মার হাত বেলফুলের মালা দিয়ে বেঁধে দিয়েছে বুনিদি, মা খেতে আপত্তি করছেন বলে। মা ছোট্ট মেয়েটির মতন, "ঠাকুর আমার হাত খুলে দাও, দয়াময় আমাকে খুলে দাও" বলে বলে হাসছেন।

কিছুক্ষণ পরে মা এসে বারান্দায় একটু বসলেন। প্রণাম করে কোলে মাথা রাখতে মার হাতের কড়ে আঙ্গুল মাথায় লাগতে মাথাটা কিরকম electric shock লাগলে যে রকম চন্ করে সেরকম করে উঠল।

বৃহস্পতিবার রাতে কাকা, কাকীমা, আলো ও বাবা মাকে নিয়ে গেলাম। আমরা পৌঁছে প্রণাম করতেই মা বাবাকে খুব হেসে জুঁই ফুলের মালা পরিয়ে দিলেন।

সেদিন এত ভীড় হয়েছিল যে আমি ঠিক মার সামনে না বসে পাশে হাঁটু গেড়ে দাঁড়িয়ে মাকে বাতাস করছিলাম। এবার টুলটুলরা এল। টুলটুল ভারী সুন্দর করে মার চূড়োয় বেলফুলের মালা দিয়ে দিল। অনিল গাঙ্গুলী মাকে ভ্রমণের গল্প করাতে মা South India টুরের গল্প করতে লাগলেন।

পণ্ডিচেরীর কথা সকলে শুনতে চাইলেন। মা বললেন, 'হরিবাবার সঙ্গে ছোট্ট মেয়েটি পণ্ডিচেরীতে পৌঁছাল। মাদারের কাছে খবর পাঠাতে মাদার বলে পাঠালেন যে আলাদা দেখা করবেন। তা এ শরীরের তো কোন প্রাইভেট নেই। তাই ছোটমেয়েটা হরিবাবাকে বলে পাঠাল, বাবা যা বলে তাই হবে। মাদারের কাছে যেতে প্রথমে বাবা অরবিন্দের ঘরের সামনে দেখা হল—মাদার ছোট মেয়েটির দিকে তাকিয়ে রইল। ছোট মেয়েটাও মাদারকে দেখল।' তখন একজন জিজ্ঞেস করল, 'কতক্ষণ মা তোমরা পরস্পরের দিকে তাকিয়ে ছিলে?' অভয় ব্রহ্মচারী মার হয়ে উত্তর দিলেন— "৪৫ মিনিট।" তারপর মা বললেন, 'তারপর মাদার এ শরীরটাকে ঐ যে চক্‌লেট না কী তোমরা বল তাই দিল। দুটো ছোট মেয়ে মাদারকে একটা দিল। এবার বাবা অরবিন্দের সমাধির চারপাশে ঘুরে পদ্মের পাঁপড়ি ছড়ানো হল। মাদার এ শরীরটাকে Eternal Youth না কী যেন বলল।'

(ক্রমশ:)



মহা কুম্ভের বার্তা

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

ধীরে ধীরে শ্রীশ্রী মায়ের কুম্ভ প্রবেশের দিন এসে গেল। ৭ই জানুয়ারী শুভ মুহূর্তে স্বামী ভাস্করানন্দজীর উপস্থিতিতে স্বামী নির্গুণানন্দজী পদ্মনাভের বিগ্রহ নিয়ে ও কন্যাপীঠের ব্রহ্মচারিণীরা মায়ের সুন্দর ছবি নিয়ে শঙ্খ, ঘন্টা, বেদধ্বনি সহ নবনির্মিত মায়ের কুটীরে প্রবেশ করা হল। শ্রীশ্রী মায়ের সুন্দর ছবিকে দুগ্ধ ধবল স্বচ্ছ চাদর বিছানো বিছানায় বিরাজিত করা হল। শ্রীশ্রী মা যেন স্বয়ং সাক্ষাৎ এসে বিরাজিত হয়েছেন। কনখল হতে মৈত্রেয়ীজী ও পূর্ণানন্দজী (শান্তাজী) কুম্ভস্নানের জন্য এসেছিলেন।

এই শুভ অবসরে এলাহাবাদের প্রাক্তন বিচারপতি শ্রী অমিতাভ ব্যানার্জ্জী ও তাঁর ধর্মপত্নী শ্রীমতী মঞ্জু ব্যানার্জ্জী উপস্থিত ছিলেন। এই একমাস ব্যাপী মহাকুম্ভ পর্ব অনুষ্ঠানে ব্যানার্জ্জী পরিবারের সহযোগিতা বিশেষ উল্লেখনীয়। শ্রীশ্রী মায়ের প্রবেশের পর যথাবিধি পূজা, আরতি ইত্যাদি আরম্ভ হয় যা বসন্ত পঞ্চমী পর্য্যন্ত অব্যাহত ভাবে চলেছিল।

বিকালে সাড়ে ৪টা হতে স্তব, রামায়ণের পর সাড়ে ৬টা পর্য্যন্ত সদ্‌গ্রন্থ পাঠ ও মাতৃ প্রসঙ্গ আলোচনা হত। এরপর সান্ধ্য আরতি এবং কীর্তনের পর রাত্রিবেলার কার্য্যক্রমের সমাপন হত। ভোর ৫টায় উষাকীর্তনের সঙ্গে প্রাত:কালীন কার্য্যক্রম আরম্ভ হত। সকাল ৭টায় পূজা এবং আরতি, বেলা ১০টার সময় শ্রীমদ্ভগবতগীতা ও চণ্ডীর এক অধ্যায় প্রতিদিন নিয়মিত ভাবে পাঠ। তারপর ভাগবত পাঠ হত। দুবেলাই সৎসঙ্গের দায়িত্বে ছিল ব্রহ্মচারিণী গীতা ব্যানার্জ্জী।

৯ই জানুয়ারী, পূর্ণিমা ছিল। পূর্ণানন্দজীর উদ্যোগে মায়ের কুটীরে সেদিন শ্রী সত্যনারায়ণের পূজা আয়োজিত হয়। পদ্মনাভের বিগ্রহ ও সেখানে রাখা হয়েছিল। পূজা এবং পাঁচালী পাঠ করেন কনখল হতে আগত ব্রহ্মচারী সর্বানন্দজী। স্বামী ভাস্করানন্দজীও ঐ সময়ে উপস্থিত ছিলেন। মৌনী অমাবস্যার পর ভাস্করানন্দজী অন্যত্র যান।

সেদিন চন্দ্র গ্রহণ ছিল। রাত্রি ১২টায় গ্রহণ লাগার পর রাত্রি ৩টায় গ্রহণের মুক্তি পর্য্যন্ত মায়ের কুটীরে 'হরেকৃষ্ণ' মহানাম কীর্তন চলেছিল। সকালে ত্রিবেণীতে গিয়ে সকলে স্নান করে আসেন।

মকর সংক্রান্তির স্নানের জন্য ১০ই জানুয়ারী হতেই বহুভক্তের সমাগম হতে থাকে। ত্রিপুরার রাজধানী সুদূর আগরতলা হতে, মধ্য প্রদেশের রাজধানী ভোপাল ও অন্যান্য বহু দূর

ও নিকটবর্তী শহর হতে বহু মাতৃভক্তের আগমন হয়। ধীরে ধীরে ভক্তজনের আগমনে মায়ের শিবির জনাকীর্ণ হয়ে উঠল।

১৪ই জানুয়ারী মকর সংক্রান্তির পুণ্য তিথিতে ব্রহ্মচারী জ্যোতির্ময়ানন্দজীর সন্ন্যাস দীক্ষা নির্দ্ধারিত হয়। স্বামী ভাস্করানন্দজীই দীক্ষা দেন। এই উপলক্ষ্যে কনখল হতে শ্রী গোপাল শাস্ত্রীজী এলেন। ১৩ই জানুয়ারী হতেই অনুষ্ঠানের কাজ আরম্ভ হয়ে যায়।

১৪ই জানুয়ারী শ্রী পদ্মনাভের বিশেষ পূজা ও ভোগের ব্যবস্থা হয়েছিল। তারও আয়োজন পূর্বদিন হতেই আরম্ভ হয়ে যায়। ইতিমধ্যে মহানির্বাণী আখাড়ার মহন্ত শ্রী গিরিধর নারায়ণ পুরীজী আশ্রম শিবিরে এসে সব ব্যবস্থার নিরীক্ষণ করে গেলেন।

মকর সংক্রান্তির দিন ভোর ৫টা পর্য্যন্ত সর্ব সাধারণের স্নানের জন্য রাস্তা খোলা ছিল। এরপর সমস্ত রাস্তা শাহী স্নানের জন্য বন্ধ হয়ে যায়। আগত ভক্তদের স্নানের সুবিধার্থে মহানির্ব্বাণী আখাড়ার শোভাযাত্রার সঙ্গে এদিন স্নানের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। ভোর চারটার সময়েই বহিরাগত ভক্তদের নিয়ে মাতৃনামাঙ্কিত পতাকা সহ যোগেনভাই ও সমাগত ব্রহ্মচারিগণ মহানির্ব্বাণী আখাড়ায় চলে যান। তাঁরা মার নাম কীর্তন করতে করতে শোভাযাত্রায় সম্মিলিত হলেন। এই স্নানে কলকাতা হতে শ্রী স্বপন গাঙ্গুলী এবং অন্যান্য ভক্তও এসেছিলেন। আশ্রম শিবিরে এদিন ২০০রও বেশী ভক্ত ছিল।

"মাঘ মকরগতরবিযব হোই। তীরথপতিহি আবে সবকোই।" গোস্বামী তুলসীদাসজীর এই পংক্তিটি সাকার হয়ে উঠেছিল।

মকর সংক্রান্তির পুণ্য তিথিতে ত্রিবেণী স্নান করে পবিত্র হয়ে সকলে পদ্মানাভের পূজার আয়োজন করলেন। নবীন সন্ন্যাসী জ্যোতির্ময়ানন্দজী শ্রীশ্রী মায়ের চরণে চাদর ও বস্ত্র অর্পণ করলেন।

শ্রী পদ্মানাভের পূজা স্বামী নির্গুণানন্দজী করলেন। পূজার সময় স্বামী ভাস্করানন্দজী উপস্থিত ছিলেন। পূজা মায়ের কুটীরেই হল। বাইরে কীর্তন হচ্ছিল। ঠিক ১২টায় ভোগ ও আরতি হল। তারপর সকলে প্রসাদ পেলেন। পূজার সময় এলাহাবাদের স্থানীয় ভক্তরা আসতে পারেন নি, কারণ রাস্তা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল।

১৫ই জানুয়ারী ব্রহ্মচারী জ্যোতির্ময়ানন্দজীর সন্ন্যাস উপলক্ষ্যে ভাণ্ডারা হয়। এদিন মহন্ত শ্রী গিরিধর নারায়ণ পুরীজী (নির্ব্বাণী আখাড়া), ভোলাগিরি আশ্রমের মহামণ্ডলেশ্বর শ্রী ১০০৮ স্বামী দেবানন্দগিরিজী মহারাজ এবং অটল আখাড়ার আচার্য্য মহামণ্ডলেশ্বর শ্রী ১০০৮ স্বামী মঙ্গলানন্দ গিরিজী এবং অন্যান্য সাধু মহাত্মাগণ আসেন। পূজনীয় মঙ্গলানন্দগিরিজী নতুন সন্ন্যাস গ্রহণ সম্বন্ধে আনন্দিত হয়ে বলেন, "শ্রীশ্রী মা সাধু সমাজকে অত্যন্ত আদর করতেন। মায়ের আদর্শ পথে চলে মায়ের আশ্রমের পরম্পরা অক্ষুণ্ন রেখে অগ্রসর হওয়া এতো খুব ভাল কথা।

এই রূপে ভবিষ্যতেও এখান হতে সাধু পরম্পরার উদয় হোক মায়ের চরণে এই প্রার্থনা জানাই।"

প্রবচনাদির পর আশ্রমের রীতি অনুসারে বস্ত্র, কম্বল, দক্ষিণাদি সহ সাধুদের ভোজন করানো হল।

১৬ই জানুয়ারী মহানির্ব্বাণী আখাড়ার মহাত্মাদের ভাণ্ডারা ছিল। ১৫০ এরও অধিক মহাত্মাদের ভোজনের আয়োজন করা হয়েছিল। ব্রহ্মচারী পানুদার নির্দ্দেশে মায়ের শিক্ষা অনুসারে সব ব্যবস্থা হয়েছিল। আচার্য্য মহামণ্ডলেশ্বর এবং মহন্ত সকলের জন্য পৃথক পৃথক আসনের ব্যবস্থা আখাড়ার নিয়ম অনুসারে করা হয়েছিল। বেলা প্রায় ১০টা হতে মহাত্মাদের আগমন শুরু হয়ে গিয়েছিল। প্রথমে এসে সকলে সৎসঙ্গের প্যাণ্ডেলে পাতা আসনে বসেন। শ্রীশ্রী মায়ের চরণে কেউ শ্রদ্ধাঞ্জলি, কেউ বাক্য পুষ্পাঞ্জলি এবং কেউ বা প্রণামাঞ্জলি অর্পণ করলেন। তারপর সকলকে ভোজনাগারে নিয়ে যাওয়া হয়। সকলের যথাযোগ্য আসন গ্রহণ করার পর মালা, চন্দন দিয়ে আপ্যায়িত করে বস্ত্র এবং দক্ষিণা অর্পণ করা হল। ভোজ্য বস্তু পরিবেশনের পর আরতি করা হল। তারপর মন্ত্রোচ্চারণ সহ তাঁরা ভোজন আরম্ভ করলেন। এদিনের সাধু ভাণ্ডারার সমস্ত ব্যয়ভার শ্রী রাজেশ প্যাটেল বহন করেন।

১৭ই জানুয়ারী হতে মৌনী অমাবস্যার স্নানের জন্য দূর দূর হতে বহু ভক্ত সমাগম হল। আগরতলা হতে শ্রীসুমঙ্গল সেন সস্ত্রীক এসেছিলেন। তাঁর ভাষণে দক্ষতা আছে। বিকালে প্রতিদিন তিনি সুললিত বাংলা ভাষায় ভাগবত ব্যাখ্যা করতেন। চতুর্দিকের সৎসঙ্গের ধ্বনি আপনা হতেই কর্ণকুহরে প্রবেশ করত। বিরাট কুম্ভক্ষেত্রের সরকারী ব্যবস্থাও বিরাটরূপেই হয়েছিল। পরিষ্কার পরিচ্ছন্নের দিকে বিশেষ খেয়াল রাখা হয়েছিল। চতুর্দিকে সৎসঙ্গের বন্যা প্রবাহিত হচ্ছিল। পথের পথিকের মুখেও সৎসঙ্গের কথাই শোনা যাচ্ছিল।

১৮ই জানুয়ারী সন্ধ্যার পর যোগদা আশ্রমের স্বামী নির্ব্বাণানন্দজী একজন শিষ্য সহ এসেছিলেন। মায়ের কুটীরে বসে তিনি কিছুক্ষণ ধ্যান করেন। যাওয়ার সময় মায়ের কুটীরের সম্বন্ধে তিনি বলে যান, "এই স্থানের পরিবেশ সাধনের অনুকূল। অত্যন্ত সুন্দর স্থান।"

২০শে জানুয়ারী কৈলাস আশ্রমের মহামণ্ডলেশ্বর শ্রী ১০০৮ স্বামী বিদ্যানন্দজী মহারাজ ও অন্যান্য মহামণ্ডলেশ্বররা এলেন, সকলের উপবেশনের পর মাকে যাঁরা সাক্ষাৎ দর্শন করেছেন, তাঁরা নিজেদের মাতৃ প্রসঙ্গ শোনালেন। একজন মহাত্মা বললেন, "উত্তরকাশীর সংস্কৃত মহাবিদ্যালয়ের সঞ্চালক স্বামী শ্রী অদ্বৈতানন্দজী সাধনকালে একবার কিছু বাধার সম্মুখীন হন। তখন শ্রীশ্রী মা তাঁকে সাধনপথে উত্তরণের নির্দেশ দেন।" প্রবচনাদির পর সকলে বস্ত্রাদি গ্রহণ করে ভোজন করলেন। এদিন ভাণ্ডারার সম্পূর্ণ ব্যয়ভার শ্রীভগবান আগরওয়ালজী সানন্দে বহন করেন।

২১শে জানুয়ারী নিরঞ্জনী আখাড়ার বিশেষ ভাণ্ডারা ছিল। এদিন শতাধিক মহাত্মাদের

ভোজনের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। দেওঘরের শ্রীশ্রী নরেন ব্রহ্মচারীজীর শিষ্য এবং জগন্নাথপুরীর "ধ্যান মন্দিরের" প্রতিষ্ঠাতা স্বামী শ্রী ব্রহ্মানন্দজী মহারাজ মৌনী অমাবস্যার স্নানের জন্য সশিষ্য ২১শে জানুয়ারী পৌঁছালেন। সকাল ১০টা হতে এদিন সাধুদের আগমন আরম্ভ হল। আচার্য্য, মহামণ্ডলেশ্বর এবং মহন্তদের আগমনের পর প্রতিবারের মত বস্ত্র ও দক্ষিণা সহ ভাণ্ডারা সম্পন্ন হয়। আগরতলার ভক্ত শ্রীমতী দীপালী দত্ত এদিনের ভাণ্ডারার সম্পূর্ণ ব্যয় ভার বিশেষ আগ্রহ সহকারে বহন করেন। আশ্রম শিবিরের কার্য্যক্রম যথারীতি চলতে লাগল। স্বামী ব্রহ্মানন্দজীর প্রতিদিন সকাল সন্ধ্যায় সৎসঙ্গ হত।

মকর সংক্রান্তির একটি ঘটনার উল্লেখ করা আশাকরি অনুচিত হবে না। মকর সংক্রান্তির স্নানের জন্য সমাগত ভক্তদের মধ্যে অখণ্ড রামায়ণ পাঠের ইচ্ছা হয়। ১৩ই জানুয়ারী রামায়ণ পাঠ আরম্ভ হয়েছিল। শীত বেশী ছিল। তাই রাত্রি জাগরণের লোকের অভাব দেখা যাচ্ছিল। ভোপাল বৈরাগঢ়ের ছেলেরা রাত্রি জাগরণের দায়িত্ব নিল। অখণ্ড রামায়ণের উদ্যোক্তা ছিলেন ভোপালেরই পণ্ডিত স্বর্গীয় শ্রী ত্রিগুণনায়কজীর ধর্মপত্নী। তাঁর সঙ্গে আর একজন মহিলা রাত্রি ১২টা পর্য্যন্ত সমস্বরে রামায়ণ গান করছিলেন। এরপর বৈরাগঢ় আশ্রমের পূজারী পণ্ডিত শ্রী অশোক শর্ম্মার পাঠ করার কথা ছিল। ইতিমধ্যে ২০-২১ বছরের একটি যুবক এল। সে আশ্রম শিবিরের দ্বারে দাঁড়ানো যোগেনভাইকে জিজ্ঞাসা করল, "আমি কি রামায়ণ পাঠ করতে পারি?" যোগেনভাই বলল, "রামায়ণ পাঠে সকলের সমান অধিকার।" সেই যুবকটি অত্যন্ত খুশী হয়ে বলল, "আমি ক্ষেতে কাজ করি। কাল সংক্রান্তি স্নানের জন্য এসেছি। আমি মেলায় ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম, আর ভাবছিলাম যে যদি কোথাও রামায়ণ পাঠ হয়, তবে আমি অবশ্য রামায়ণ পাঠে অংশ গ্রহণ করব। রাত্রির নিস্তব্ধতায় এই রামায়ণ পাঠের ধ্বনি আমি দূর হতে শুনতে পেয়েছি। সেই ধ্বনি শ্রবণ করে আন্দাজে আমি যথাস্থানে পৌঁছে গেছি। এখন আমি আর কিছু চাইনা। শুধু রামায়ণ পাঠ করতে চাই।" ঐ যুবকটি রাত ১২টা হতে ভোর ৪টা অবধি উচ্চরবে মধুর স্বরে রামায়ণ গান করল। ভোর ৪টায় সে চলে গেল। এমনই মায়ের মহিমা। শ্রীশ্রী মা সকলেরই ইচ্ছা পূর্ণ করেন।

২৪শে জানুয়ারী কুম্ভমেলার এই বিরাট বেলা ভূমিতে তিলার্দ্ধ স্থানও রিক্ত দেখা গেল না। পূর্বদিন বিকাল ৩টা বেজে ১৭ মিনিটে অমাবস্যা লেগে গিয়েছিল। মাইকে পুলিস বিভাগ হতে অনবরত স্নানার্থীদের অমাবস্যার স্নান আরম্ভ করতে বলা হচ্ছিল। স্নান সেরে তৎক্ষণাৎ ঘাট খালি করার নির্দেশ এবং আশেপাশের শহর হতে আগত স্নানার্থীদের গন্তব্যস্থলের গাড়ীর তালিকা ও ঘোষিত হচ্ছিল। স্নান সেরেই যাতে যাত্রীরা ফিরে যেতে পারে। মেলাতে যেন কোন অবাঞ্ছনীয় ঘটনা না ঘটে সেদিকে কর্মকর্ত্তাদের সতর্ক দৃষ্টি ছিল। সবদিকেই তাঁদের বিশেষ লক্ষ্য। জনতার অপার শ্রদ্ধা সহজেই সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। উন্মুক্ত আকাশে কনকনে শীতে লোকেরা সপরিবারে এসে তীর্থবাস করে সেই পুণ্য ক্ষণটির অপেক্ষায় রয়েছেন, ত্রিবেণীতে মাত্র একটি ডুব দিয়ে তাঁরা সকল দোষ হতে মুক্ত হবেন। তাঁদের মনোকামনা পূর্ণ হবে। আজ উঁচু নীচুর কোন ভেদ নেই। অধিকারী কর্মচারী সব একাকার হয়ে গেছেন। সকলের একটিই

লক্ষ্য। ধন্য ভারতের আত্মা। ধন্য এই তীর্থরাজ প্রয়াগ। ধন্য মায়ের অমৃতবাণী, "জন সমুদ্রের দর্শন কর।"

আমাদের মধ্যে কেউ কেউ আগের দিন বিকালেও গিয়ে ত্রিবেণীতে স্নান করে এল। ত্রিবেণী সঙ্গমে তিলার্দ্ধ স্থান নেই। তার মধ্যেই লোকেরা স্নান করছে। পশ্চিমাকাশ রক্তিমাভায় রঞ্জিত হয়ে উঠেছে। অস্তাচলগামী সূর্য্যও যেন জনতার এই অনন্ত সমুদ্র দেখে ক্ষণকালের জন্য স্তম্ভিত হলেন। কোটি কোটি লোক একত্রিত; কিন্তু আকাশ নি:স্তব্ধ। ভারতাত্মার দর্শনের জন্য আকাশে যেন দেবগণ একত্রিত হয়েছেন। পুণ্যক্ষণ আরম্ভের সূচনা পুন: পুন: ঘোষিত হচ্ছে।

মকর সংক্রান্তির স্নানের মতই অমাবস্যার স্নানেরও ব্যবস্থা করা হল। বহিরাগত ভক্ত এবং আশ্রমের সাধু ব্রহ্মচারীরা এদিন নিরঞ্জনী আখাড়ার শাহী স্নানের শোভাযাত্রার সঙ্গে স্নান করতে গেলেন। অপার জন সমুদ্র। শ্রীশ্রী মায়ের অহৈতুকী কৃপায় সকলে স্নান করে সমস্বরে কীর্তন করতে করতে ফিরে এলেন। কীর্তনের পদ ছিল, "আনন্দ কুম্ভ জয়, কুম্ভ জয় ব্রহ্ম জয়, ব্রহ্মময় কুম্ভ জল।" মহাকুম্ভের প্রধান স্নান সম্পন্ন হল। যেদিকে তাকাই বিরাট জন সমুদ্র।

সমবেত ভক্তগণও অনেকেই বিদায় নিলেন। স্বামী ভাস্করানন্দজীও নিজের গন্তব্য স্থলের উদ্দেশ্যে রওনা হলেন। এই মহাকুম্ভে মাতৃভক্ত শ্রীমতী ইন্দিরা সক্সেরিয়াও যোগদান করেছিলেন। আশ্রমের অন্নভাণ্ডারে তাঁরও বিরাট অবদান ছিল।

২৯শে জানুয়ারী বসন্ত পঞ্চমীর তিথিতে প্রাচীণ পরম্পরা অনুসারে পূর্ণকুম্ভের শেষ শাহী স্নান। ভীর অপেক্ষাকৃত কম ছিল এইদিন। আশ্রমের শিবিরে আগত সাধু ব্রহ্মচারী এবং ভক্তগণ সকালে মহানির্ব্বাণী আখাড়ার শোভাযাত্রায় সম্মিলিত হয়ে বেশ ভাল ভাবে সঙ্গমে স্নান করে ফিরে এলেন।

আশ্রম শিবিরে শ্রীশ্রী সরস্বতী পূজা আয়োজিত হয়েছিল। শ্রীশ্রী মায়ের কুটীরেই পূজার ব্যবস্থা করা হয়। প্রাতে ত্রিবেণী স্নান সেরে সকলে পূজার কাজে লেগে গেলেন। কন্যাপীঠের ব্রহ্মচারিণী গীতা ব্যানার্জ্জী পূজা করেছিল। আগরতলার শ্রীমতী আহ্লাদেবীর সুমধুর সঙ্গীতে পরিবেশ ভক্তিরসময় হয়ে উঠেছিল। মাঝে মাঝে ভজনানন্দজীর (পুষ্পদির) ও কীর্তন, ভজন ইত্যাদি শোনা যাচ্ছিল। আজ রামকৃষ্ণ মিশনের সাধুরা ভাণ্ডারায় আমন্ত্রিত হন। বেলা প্রায় ১১টার সময় মিশনের মহারাজরা এলেন। তাঁরা পূজা দর্শন করলেন। পূজার পর স্বামীজী পুষ্পাঞ্জলি দিলেন। তারপর ভোগ ও আরতি হল। হোমের পর পূজার পূর্ণাহুতি হয়। শ্রীশ্রী মায়ের কৃপায় এই অন্তিম অনুষ্ঠানটিও নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হল।

এবার বিদায়ের পালা। ৩০শে জানুয়ারী অবধি শিবিরের ব্যবস্থা ছিল। মহাকুম্ভের মহানন্দ সকলের হৃদয়ে অনুভূত হল। ক্ষণে ক্ষণে অনুরণিত হল সেই স্তোত্রটির পদ—

"শ্রুতিঃ প্রমাণং স্মৃতয়ঃ প্রমাণং পুরাণমন্যত্র পরং প্রমাণম্।
যত্রাস্তি গঙ্গা যমুনা প্রমাণং সতীর্থরাজো জয়তি প্রয়াগঃ ॥"



স্মৃতি চারণ

(পাঁচ)

—শ্রীমতী রেণুকা মুখার্জ্জী

ঢাকা, এপ্রিল ১৯৪৬—

ঢাকায় এক সপ্তাহ থাকা হল। অভিনব সব অভিজ্ঞতা। আমার প্রথম Steamer যাত্রা। এত বিশাল নদী কখনও দেখিনি। মনে হল সমুদ্র বোধ হয় এই রকমই দেখতে লাগে পারাবারহীন। Steamer এ উঠে railing এর পাশে জায়গা করে নেওয়া হ'ল। আমরা সকলেই ক্লান্ত বেশ ঘুমিয়ে নিলাম। অবশ্য মায়ের কাছে যথারীতি লোকজন। আমিও দু একবার Ist class cabin এ গিয়ে মায়ের দর্শন করে এলাম কিন্তু ঘুমের তাগিদ বেশী। মায়ের ত দিনে রাতে বিশ্রামের বালাই নেই। শুধু লোক আর লোক।

ঢাকায় জটুদা মাকে receive করতে এসেছেন। চমৎকার ব্যবস্থা। আশ্রম দেখে মন জুড়িয়ে গেল। ঠিক যেন একটি তপোবন। বিশেষ করে কোলকাতার পর মনে হ'ল একটি স্বপ্ন রাজ্য।

হরিবাবার তীর্থযাত্রা চলছে। শাহবাগ, সিদ্ধেশ্বরী আদি মায়ের পুরোনো লীলাস্থলী অতি ভক্তিভাবে তিনি দর্শন করছেন। আমরাও দিদির কাছে, মায়ের কাছেও কত কথা গল্প শুনেছি যেগুলি এখন বাস্তবে পরিণত হল। আমরা আগ্রা থাকাকালীন বীরেন জ্যাঠা মশাই এর (বীরেন্দ্র চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, দিদির বড় ভাই, যিনি আগ্রা College এ Professor ছিলেন ও আমার বাবার বিশেষ বন্ধু) কাছেও ঢাকার অনেক লীলা কথা শুনেছি। একটি গল্প স্পষ্ট মনে পড়ছে। নিরঞ্জন বাবুর স্ত্রী খুব অসুস্থ। তাঁরা স্বামী স্ত্রী মায়ের ভক্ত এবং ভাইজীর বিশেষ বন্ধু। ঢাকার সকলেরই স্নেহভাজন। বীরেন জ্যাঠামশাই একদিন মার ঘরে বসে আছেন এবং সর্বান্ত:করণে প্রার্থনা করছেন 'মা, নিরঞ্জনের স্ত্রীকে ভাল করে দাও। প্রার্থনার পর চোখ খুলে দেখলেন মা স্থিরনেত্রে তাঁর দিকেই চেয়ে আছেন। তাঁর মনে হল যে মা প্রার্থনা শুনেছেন। কয়েকদিন পরই নিরঞ্জন বাবুর স্ত্রী মারা গেলেন। বীরেন জ্যাঠামশাইর মায়ের প্রতি খুব অভিমান হল। মুখেত কিছুই বলা হয়নি অথচ মৃত্যুর পরদিন মায়ের সামনা সামনি হওয়াতে মা বলছেন, "তুমি ত ওকে ভাল করে দাও" বলেছিলে—ভালই করেছি। জীবন লাভ করলেই যে ভাল হত তা নয়। জীবন-মৃত্যু ভাল-মন্দর মাপ কাঠি হয় না।' বীরেন জ্যাঠামশাই অনুতপ্ত হলেন যে তিনি মায়ের মঙ্গল বিধানে সন্দেহ করছেন।

এবার ঢাকাতে বীরেন জ্যাঠামশাইকে দেখলাম। খুকীর সঙ্গে আলাপ হল। ভোলানাথজীর শিষ্যা এবং খুব দরাজ গলায় কীর্তন করত। একদিন মেয়েরা সারারাত কীর্তন করল। খুব সমারোহ ও জমজমাট কীর্তন।

একদিন সন্ধ্যা থেকেই মা বীরেন জ্যাঠামশাই, অমূল্যবাবু এবং আরও অনেকের সঙ্গে কথায় কথায় প্রায় সারারাত কাটিয়ে দিলেন। আমি মায়ের কাছে একটু পিছনে বসে ছিলাম। মা এক সময়ে শরীর আমার কোলে এলিয়ে দিলেন। আমি হাঁটু একটু উপরে করে মাকে support দিয়ে রাখলাম। আমার position টা খুব সহজ ছিল না তবে একটুও নড়িনি কেননা তাহলেই মা উঠে বসবেন। আমার আরামের থেকে মায়ের একটু সামান্য বিশ্রাম বেশী জরুরী। পরে মনে করে আশ্চর্য্য হলাম যে তিন চার ঘন্টা ঐ ভাবে থেকেও আমার কোন কষ্ট হয়নি। অনেক ভাল ভাল আলোচনা শুনলাম, কিন্তু তখন লেখা হয়নি বলে স্মৃতিতে ধরে রাখতে পারলাম না। শাহবাগের বাগানবাড়ীতে ঝাউগুলি চন্দন বৃক্ষ হয়ে গেছে, সেগুলি দেখলাম। কি অদ্ভুত লীলা মাহাত্ম্য। আমরা ত মায়ের আগেকার ঐশ্বর্য্যময়ী চেহারা দেখিনি। মা নিজের রূপ ঐশ্বর্য্য অনেক সম্বরণ করে নিয়েছেন পুরোনো ভক্তদের কাছে শুনতে পাই। এখন আমরা যা পেয়েছি তাইতেই আমরা মুগ্ধ। সাধারণ ভাবে চলাফেরা করলেও মায়ের অতি অসাধারণ প্রতিভা ও মধুরিমা যেন উপছে পড়তে থাকে।

গত বছরের বহরমপুরের ঘটনার পর এইদিকের ভক্তদের ও জন সাধারণের মধ্যে আমি একটু উল্লেখযোগ্য হয়ে গেছি। লোকেরা তাকিয়ে থাকে ও কানাঘুষি করে বুঝতে পারি। Very unpleasant মা ও এ বিষয়ে খুব খেয়াল করেন দেখছি। সমানেই আমাকে যতদূর সম্ভব সঙ্গে সঙ্গে রাখেন, যেন আগলে রাখেন, পাছে কেউ কিছু কৌতুহলী হয়ে প্রশ্ন করে। মুক্তি মহারাজের সঙ্গে অনেক বোঝা পড়া মাকে করতে হয়েছিল। তারপর মা আমাকে বলেছিলেন, "তোমার জন্য এই কাঁটার বোঝা আমি মাথায় চাপিয়েছি" বলে হাতদুটি তুলে মাথার কাছে তুললেন যেমন একটি ঝুড়ি লোকে balance করে। মার কাজ মাই জানেন। আমি ত আগে, পরে, মাঝে কিছুই বোঝবার চেষ্টা করিনি। মায়ের খেয়ালের স্রোতে নিজেকে ভাসিয়ে দিতে পেরেছি এই যা। ভালও জানিনা মন্দও জানিনা। মা যদি এমন করে আগলে রাখেন তাহলে আর কিসের চিন্তা।

ঢাকাতে বেশ আনন্দ হল। এই মায়ের last visit পরে শুনেছিলাম, যে যারা যারা মায়ের কাছে ভবিষ্যতে কি করা কর্ত্তব্য জানতে চেয়েছিল তাদের মা বলেছেন, "সম্ভব হলে ঢাকা ছেড়ে কোলকাতায় বা অন্য শহরে চলে আসতে।" Partition হবার কথা মুখে মুখে। সবাইকার মনে উদ্বেগ, ভয়, আতঙ্ক। কয়েক দিন মায়ের সান্নিধ্যে সকলে আনন্দ করে নিলেন।

ফিরবার পথে Steamer থেকে নামতে গিয়ে স্বামীজী, মৌনীমা আর সুরবালাদি পদ্মাতে পড়ে গেলেন। বিপদ, তবে ওনারা সাঁতার জানেন পারে এসে উঠলেন। বুনি ও আমি ওঁদের সঙ্গেই ছিলাম। আমরা কি করে বেঁচে গেলাম জানিনা। পড়লে কেলেঙ্কারি হত কেননা আমরা সাঁতার জানিনা। Station অন্ধকার। আমরা বিরাট party কখনও বলে এই train এ ওঠ, কখনও বলে ঐ train বদল করতে হবে। এত গোলমালের মধ্যে মা আমাকে তাঁর নিজের compartment এ বসিয়ে রাখলেন। এই সময়ে আমার হাত থেকে দিদির ছোট একটি attache case হারিয়ে

গেল ভীড়ের মধ্যে। দিদি ত খুবই বকলেন এবং এই বকুনির জের চলবে তাও বুঝতে পারছি।

২৩শে এপ্রিল —

কোলকাতায় জোড়া শিব মন্দিরে কয়েক ঘন্টার জন্য থাকা হল। বকুনি টকুনি খেয়ে আমার মন খারাপ বলে বোধ হয় মা সমানেই আমাকে ডেকে সামান্য সামান্য সেবা গ্রহণ করছেন। একবার ফল খাইয়ে দিলাম। বুনিদির মামার নতুন বিয়ে হয়েছে। তার বৌটিকে নিয়ে মা অনেক হাসি তামাশা করতে লাগলেন। এই বাড়ীর সঙ্গে মার বহুদিনের পরিচয়। বুনিদির কাকারা, মামারা এবং অন্যান্য পরিবারের সকলেই মাতৃগত প্রাণ। মাও ওদের সঙ্গে খুব মজা করেন।

২৪শে এপ্রিল —

কোলাকাতা থেকে আমারা জামশেদপুর এলাম। এই শহর একেবারে অন্যরকম। পরিষ্কার ঝকঝকে, লোকজন খুব disciplined। তারা আমাদের বিরাট partyর যা সুবন্দোবস্ত করেছিল তা প্রশংসনীয়। বিল্লোজী আগে থেকে গিয়ে মায়ের থাকবার ঘর এত সুন্দর পরিষ্কার আর গুছিয়ে রেখেছিল যে মা প্রসন্ন হলেন। বিল্লোজীর খুব প্রশংসা করলেন — সেই সঙ্গে আমাদের একটু by comparison কাজের perfection এর ব্যাপারে মন্দ শুনতে হল।

হরিবাবা মহারাজ মন্দির দর্শনে বেরোলেন। মা নিজের মোটরে আমাকে গায়ের কাছে বসিয়ে নিলেন, বড় গাড়ী, অসুবিধা নেই। মন্দিরের পর হরিবাবা Tata Steel Works দেখলেন। তাঁর সব বিষয়েই আগ্রহ। আমরাও কারখানার বিশাল পরিকল্পনা দেখে অভিভূত হলাম। স্থানীয় ভক্তদের উৎসাহ ও management খুব ভাল। বাচ্চা বাচ্চা ছেলেমেয়েরা মাকে একটু cultural show দেখাল। কীর্তনও খুব জমিয়ে করল সবাই। যোগেশদার ভাই এখানে ছিলেন। যাঁর কাছে মা প্রথম জামশেদপুর আসেন। এখানে ভোলানাথজীর অনেক শিষ্য শিষ্যা আছেন।

২৬শে এপ্রিল, পুরী —

প্রথম সমুদ্র দেখলাম। অতি অদ্ভুত অভিজ্ঞতা। স্টেশন থেকে কিছু দূর আসতেই গম্ভীর গর্জ্জন ধ্বনি শোনা যেতে লাগল। অন্ধকার হয়ে গেল বলে আশ্রমে পৌঁছে সমুদ্র ঠিক দেখা গেল না বটে তবে শব্দ চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ছে। মা torch জ্বালিয়ে জ্বালিয়ে আমাকে সমুদ্র দেখাবার অনেক চেষ্টা করলেন।

পরদিন ভোরের আলোয় সমুদ্র যা দেখলাম অপূর্ব্ব। মা বলছেন — "দেখ্ দেখ্, কত রকমের রং।" একটার পর একটা, তাও আবার মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে বদলে যাচ্ছে, মিশে যাচ্ছে, আলাদা হয়ে যাচ্ছে। সংখ্যাহীন, সীমাহীন ঢেউগুলি অবিরাম চলে আসছে। সমুদ্রের দিকে ঘন্টার পর ঘন্টা তাকিয়ে থাকা যায়। সেই একেরই এত রকম পরিবর্ত্তন। সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে থাকলে মায়ের অনেক কথা বোঝা যায়।

আমরা মন্দির দর্শন করে আসতে মা বলছেন, "যত যত দেবতার মন্দির সেই একেরই নানা রূপ। সব মন্দিরেই নিজ নিজ ইষ্টকে দর্শন করা।"

মা একদিন নিজেই জগন্নাথকে দর্শন করাতে আমাদের নিয়ে গেলেন এবং আনন্দ বাজার থেকে ডাল, ভাত ইত্যাদি কেনালেন। মা সবাইকার মুখে দিচ্ছেন ও সবাই মার মুখে দিচ্ছে। আমি আগে এসব কিছুই দেখিনি বলে মা কৃপা করে জগন্নাথ ক্ষেত্রের মাহাত্ম্য দেখালেন।

মা এবার বহুদিন পর এখানে শোভনের সঙ্গে দেখা করলেন।

তার পর আবার সদল বলে কোলকাতা ফিরলাম। জন্মোৎসব। সকাল চারটে থেকে রাত দুটো পর্য্যন্ত অবিশ্রান্ত কাজ আর কাজ। ডায়েরী লেখার সময় নেই। মা তো programme এ বাঁধা। কখনও ক্বচিৎ মায়ের কাছে যাওয়া যায়। একদিন মায়ের অনুমতি নিয়ে আমি হাওড়া গেলাম আমাদের একমাত্র মাসীমার সঙ্গে দেখা করতে। মাসতুতো ভাই অমু এসে নিয়ে গেল। দিদি একদিনও আসতে পারেনি শুধু phone এ কথা হত।

জন্মোৎসবের পর শ্রীরামপুর। আমরা সকলেই অক্লান্ত পরিশ্রমের পর বিশ্রাম করবার সুযোগ পেলাম। যে যখন পারছে একটু ঘুমিয়ে নিচ্ছে। মা এখান থেকে Solan যাবেন। আমাদের বোধ হয় কাশী যেতে হবে।

মা আমাদের সবাইকে ডেকে কতগুলি কথা বললেন, "সকলকার সঙ্গে প্রীতিতে থাকবে। পক্ষপাতিত্ব যেন না হয়। আলাদা ক্বারোও সঙ্গে কারোও আলোচনা না করা। সমভাবে কাজ করা, সত্য কথা বলা, ব্যক্তিত্ব রক্ষা। আগে একরকম ভাবে থাকতে বলা হয়, এখন অন্য রকম, এইতেই কল্যাণ ও মঙ্গল।" (মা বোধ হয় একান্তে থাকার ও লোকজনের সঙ্গে থাকার নিয়ম আলাদা করছেন। "যেখানে আলোচনা হয়, সেই স্থান ত্যাগ করবে। জপ ধ্যান বেশী করে রেখে দেবে, নয় ত ভগবদ্ বুদ্ধি আসে না, জড়তা আক্রমণ করে।"

মায়ের যাবার আগে শুনলাম বিল্লোজী ও আমি মার সঙ্গে যাব—অন্যান্যরা কাশী এবং নিজ নিজ স্থানে চলে যাবে। হরিবাবাজী দলবল সহ মার সঙ্গেই আছেন।

(ক্রমশ:)



আশ্রম সংবাদ

১. কনখল আশ্রম :

দক্ষরাজ-নন্দিনী ভগবতী সতীর পূত চরণচিহ্নিত প্রাচীন তীর্থ এই কনখলে মায়ের আশ্রমে গত ৫ই জুলাই, ২০০1 গুরু পূর্ণিমা মহোৎসব মহা ধূমধামের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই উপলক্ষ্যে শ্রী স্বামী মুক্তানন্দ গিরিজীর (দিদিমার) ও শ্রীশ্রী মায়ের বিশেষ পূজা হয়। বিভিন্ন জায়গা হতে বহু ভক্তের সমাগম হয়। এই উপলক্ষ্যে সকলেই শ্রীগুরু ও ইষ্টের চরণ ধ্যানে মগ্ন হয়ে নিজ জীবন সফল করেন।

আগামী ২২ শে অক্টোবর হতে ২৬শে অক্টোবর শ্রীশ্রী শারদীয়া দুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হবে। বিশেষ জ্ঞাতব্য হল এই যে আগড়পাড়া, কনখল ও রাঁচী এই তিন জায়গাতেই মায়ের আশ্রমে প্রতিবছরই শ্রীশ্রী শারদীয়া দুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হয়।

২. বারাণসী আশ্রম :

বারাণসী আশ্রমেও ৫ই জুলাই মাতৃ মন্দিরে শ্রীশ্রী মায়ের বিশেষ পূজা ও গিরিজীর মন্দিরে শ্রীশ্রী গিরিজীর পূজা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ২৭শে জুলাই গিরিজীর তিরোধান তিথিতে গিরিজীর বিশেষ পূজা ও সাধু ভাণ্ডারা হয়।

শ্রীশ্রী মায়ের অন্যতম লীলাক্ষেত্র এই বারাণসী ধাম। আজ থেকে প্রায় ৫৬ বছর আগে এই বারাণসী ধামে গঙ্গা তটে মায়ের আশ্রম নির্মিত হয়। শ্রীশ্রী অন্নপূর্ণা মন্দির, চণ্ডী মণ্ডপ, যজ্ঞশালা প্রভৃতি প্রাচীন তপোবনের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। কালের বিপাকে আশ্রমের উত্তর দিকের চণ্ডী মণ্ডপ ও তার সামনের বারান্দা আপনা হতেই নীচে বসে যাচ্ছিল। এই দেখে সুদক্ষ ইঞ্জিনীয়াররা ও আশ্রমের কর্মাধিকারীরা চিন্তান্বিত হন। আশ্রম রক্ষার্থে অবিলম্বে জীর্ণ সংস্কারের আবশ্যকতা ছিল। মাতৃভক্ত সুদক্ষ ইঞ্জিনীয়ার শ্রী সোমেশ চন্দ্র ব্যানার্জ্জীর নির্দেশনায় ও আশ্রমের বরিষ্ঠ ব্রহ্মচারী শ্রদ্ধেয় শ্রী পানুদার তত্ত্বাবধানে প্রায় একলক্ষ টাকা ব্যয়ে কয়েক মাসের মধ্যেই শ্রীশ্রী মায়ের পূত চরণচিহ্নিত চণ্ডীমণ্ডপ, পূজার বেদী, নৈবেদ্য ঘর, পাশের পূজার সামগ্রী রাখার ছোট ঘর ও চণ্ডীমণ্ডপের সামনের বারান্দা আবার নতুন করে মার্বের্ল পাথর বসিয়ে যেন ছবির মত সুন্দর দর্শনীয় হয়েছে।

এই নব নির্মিত চণ্ডী মণ্ডপের উদ্‌ঘাটন হল গত ৩০শে জুলাই। এই উপলক্ষ্যে ঐ দিন ঝুলন একাদশীর পবিত্র তিথিতে প্রাতে চণ্ডীমণ্ডপে নারায়ণ, শিব ও শ্রীশ্রী মায়ের ছবি নিয়ে বেদপাঠ ও কীর্তনের মধ্যে প্রবেশ করার পর বাসন্তী বেদীতে নারায়ণ ও মাকে বসিয়ে বিশেষ পূজা করা হল। চণ্ডীমণ্ডপে প্রতিষ্ঠিত শ্রীরাধাগোবিন্দেরও বিশেষ পূজা হয়। শিবেরও বিশেষ পূজা করে রুদ্রাভিষেক ও রুদ্রীপাঠ করা হয়। সন্ধ্যায় শ্রীশ্রী সত্যনারায়ণের পূজা, কীর্তন ও পাঁচালী পাঠ হল।

শ্রাবণ মাসে চতুর্দিকে বর্ষার শ্যামল শ্রী দেখা যায়। মন্দিরে মন্দিরে ঠাকুরের ঝুলন সাজানো হয়। শ্যাম সুন্দরের ফুলদোলনায় দোলার সঙ্গে সঙ্গে মন-ময়ূর ও যেন দুলে ওঠে প্রফুল্লিত হয়ে ওঠে। মনে প্রতিক্ষণ গুঞ্জরিত হতে থাকে ঝুলনের গানের এই পদটি—

"কুসুমদোলায় দোলে শ্যামরায়
তমাল শাখে দোলে ঝোলে ঝুলনে।"

আশ্রমেও ৩০শে জুলাই হতে ৩রা আগষ্ট ঝুলনোৎসব উপলক্ষ্যে প্রতিদিন সন্ধ্যায় শ্রীগোপালজীকে বিশেষভাবে সুসজ্জিত ঝুলনায় ঝোলানো হয়। তখন সুন্দর কীর্তন হয়। কন্যাপীঠের ঠাকুর ঘরেও বিশেষ ভাবে সাজিয়ে ঝুলনায় সব ঠাকুরদের ঝোলানো হয়।

৩১শে জুলাই ঝুলনদ্বাদশীর দিন শ্রদ্ধেয় ভাইজীর তিরোধান তিথি উপলক্ষ্যে স্মৃতি মন্দিরে ভাইজীর বিশেষ পূজা ও সাধু ভাণ্ডারা হয়।

৩রা আগষ্ট ঝুলন পূর্ণিমার দিন শ্রীশ্রী গোপালের বিশেষ পূজা ও রাত্রিতে শ্রীশ্রী মায়ের স্বয়ং দীক্ষা উপলক্ষ্যে পৌনে ১২টা হতে সওয়া ১২টা পর্য্যন্ত ধ্যান হয়।

প্রতি বছরই কন্যাপীঠের কন্যারা ঝুলন ও জন্মাষ্টমীর মধ্যের কয়েকদিন রাত্রিবেলা উপরের হল ঘরে ঠাকুরের সুন্দর সুন্দর লীলাভিনয় করে। এবারেও রামচরিত মানসের সুন্দর কাণ্ড হতে হনুমানের সীতান্বেষণে লঙ্কা গমন, ভক্ত দাদু, ভক্ত গোবর্দ্ধন ডাকু এবং শ্রীকৃষ্ণের নিকুঞ্জ লীলার খুব সুন্দর লীলাভিনয় করে।

জন্মাষ্টমীর উৎসব উপলক্ষ্যে গত ১১ই আগষ্ট রাত্রিতে শ্রীগোপালজীর অভিষেক, শৃঙ্গার, ষোড়শোপচারে বিশেষ পূজা অনুষ্ঠিত হয়। খুব সুন্দর কীর্তন হয়। কন্যাপীঠের হলঘরে মাটির পুতুল ও ঠাকুরের মূর্তি দিয়ে মধুর কৃষ্ণলীলা সুন্দরভাবে সাজানো হয়। মায়ের সময় থেকেই এই নিয়ম চলে আসছে। পরদিন ১২ই আগষ্ট গোপালের সামনে কন্যাপীঠের ছোট ছোট কন্যারা গোপ বালক সেজে মাথায় হলুদ মাখা দইয়ের হাঁড়ি নিয়ে কীর্তন ও নৃত্য করতে করতে দইয়ে হাঁড়ি ভেঙ্গে প্রতিবারের মত নন্দোৎসব পালন করে।

কলকাতাবাসী শ্রীশ্রী মায়ের পুরাতন ভক্ত ৺অপূর্ব্ব কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও ৺তরুণেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং শ্রী স্বপন কুমার গাঙ্গুলীর পরলোক গত মাতা পিতার মুক্তি কামনায় ২৩শে আগষ্ট হতে আশ্রমে শ্রীমদ্‌ভাগবত সপ্তাহ আরম্ভ হয়। মহারাষ্ট্রের প্রসিদ্ধ বক্তা (যিনি মহারাষ্ট্রে শ্রদ্ধেয় 'বাবা সাহেব' নামে পরিচিত) মাতৃভক্ত শ্রী অশোকভাই কুলকর্ণীজী ভাগবতের সুললিত ব্যাখ্যা করেন। প্রথম দিন সকালে ভাগবতের আনুষ্ঠানিক কৃত্যের সঙ্গে মা, গোপালজী ও মা অন্নপূর্ণার বিশেষ পূজা অনুষ্ঠিত হয়। বিকালে ভাগবতের ব্যাখ্যা আরম্ভ হল। শ্রী অশোকভাই শ্রীমদ্‌ভাগবতের মাহাত্ম্য বর্ণন করতে গিয়ে খুব সুন্দর মার কথা বললেন। কি ভাবে একজন মাতৃভক্তের জীবনে ভাগবতী কথা শ্রবণের ফল ফলিত হয়েছিল সেই কথা শোনালেন। কথা প্রসঙ্গে বললেন, "যিনি

যুক্ত তিনিই ভক্ত, আর যিনি অযুক্ত তিনি অভক্ত।" অর্থাৎ যাঁর মন ভগবানের চরণে যুক্ত থাকে তিনি ভক্ত, আর যার মন ভগবানের চরণে যুক্ত থাকে না তিনি অভক্ত।

শ্রীমদ্ ভাগবতের হৃদয় হল ভাগবতের দশম স্কন্ধ। দশমস্কন্ধের হৃদয় হল দশম স্কন্ধের পূর্বার্দ্ধ। দশম স্কন্ধের পূর্বার্দ্ধের হৃদয় হল রাস পঞ্চাধ্যায়ী, আর রাস পঞ্চাধ্যায়ীর হৃদয় হল মধুর গোপীগীত। শ্রীকৃষ্ণের মধুর মাখনচুরি লীলার আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা করলেন শ্রী অশোক ভাই। নন্দ-নন্দন ভগবান শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের অপূর্ব গোষ্ঠ লীলা। বাঁশী হাতে শ্রীকৃষ্ণ ও বলরামের গোপ বালকের সঙ্গে গোচারণের জন্য ব্রজভূমিতে বনগমন ও সঙ্গে বনভোজনের জন্য যাঁর যাঁর বাড়ী থেকে আনা নানা ভোজ্য বস্তু। শ্রীকৃষ্ণের এই গোপ বালকদের সঙ্গে বন ভোজনের লীলাকেই মারাঠীতে "গোপালকালা" লীলা বলা হয়। এই লীলা সুন্দরভাবে প্রদর্শনের দ্বারা বর্ণিত হয়েছিল। গোবর্দ্ধন ধারণের দিন ভাগবতের মঞ্চের সামনে একটি সুন্দর গোবর্দ্ধন পর্বতও নির্মিত হল। ব্যাখ্যার পর সকলে নিম্নলিখিত মন্ত্রের সঙ্গে গোবর্দ্ধনের পরিক্রমা করেন—

"গোবর্দ্ধন ধরাধার গোকুল ত্রাণকারক।
বিষ্ণুবাহুকৃতচ্ছায় গবাংকোটিপ্রদোভব।"

রাসলীলা, কংসবধ, উদ্ধব সংবাদ, রুক্মিণী হরণ, রুক্মিণী বিবাহ প্রভৃতি খুব সুন্দর ভাবে বর্ণিত হল। ৩০শে আগষ্ট অপূর্ব সুন্দর ভাবে ভাগবত সপ্তাহের সমাপন হল। ৩১শে সম্পূর্ণ গীতা ও বিষ্ণু সহস্রনাম পাঠ, হোম, পূর্ণাহুতি এবং ব্রাহ্মণ ভোজন প্রভৃতি হয়েছে।

ভাগবত সপ্তাহের মধ্যেই ২৫শে ললিতা সপ্তমী তিথিতে গুরুপ্রিয়াদিদির তিরোধান তিথি উপলক্ষ্যে গুরুপ্রিয়াদিদির ষোড়শোপচারে বিশেষ পূজা ও সাধু ভাণ্ডারা হল। রাধাষ্টমীতে রাত্রিতে মায়ের ধ্যান ও কীর্তন হয়।

৮ই সেপ্টেম্বর উত্তর প্রদেশের রাজ্যপাল ডা. বিষ্ণুকান্ত শাস্ত্রীজীর উপস্থিতিতে মহামহোপাধ্যায় পদ্মবিভূষণ শ্রী গোপীনাথ কবিরাজ মহাশয়ের ১১৫ তম শুভ জন্ম দিবস পালিত হয়। এই উপলক্ষ্যে সম্পূর্ণানন্দ সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন দুই কুলপতি পদ্মভূষণ ডা. বিদ্যানিবাসমিশ্রজী ও প্রো: বিশ্বনাথ বেঙ্কটাচলমজী এবং বর্তমান কুলপতি ডা: রামমূর্তি শর্মাজী ও আরো অনেক গণ্যমান্য জন মহামণীষীর চরণে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করেন। অনুষ্ঠানের প্রারম্ভে কন্যাপীঠের কন্যারা বেদপাঠের দ্বারা বৈদিক মঙ্গলাচরণ করে। স্বাগত ভাষণ করেন কাশীর স্বনামধন্য বিদ্বান ডা: বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য্য। কন্যাদের 'গোপীনাথ বন্দনা' দ্বারা মহামণীষীর সম্বর্ধনার পর শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করতে গিয়ে মহামহিম রাজ্যপাল বলেন—"শ্রদ্ধেয় কবিরাজ মহাশয়ের মান, প্রতিষ্ঠা, ধনের প্রতি পূর্ণ মাত্রায় লিপ্সা শূন্যতা দেখে অবাক হতে হয়। অজাত শত্রু তিনি নিশ্ছল নিষ্কপটভাবে শ্রীগুরুদেব ও শ্রীশ্রী মায়ের চরণে পূর্ণভাবে নিজেকে সমর্পণ করেছিলেন। তাই তাঁদের আশীর্বাদ ও তাঁর জীবনে পূর্ণভাবে ফলিত হয়েছিল দেখা যায়। তিনি মহা পণ্ডিত হয়েও মহাসাধক ছিলেন।"

শ্রীশ্রী মা আনন্দময়ী কন্যাপীঠ — বারাণসী :

শ্রীশ্রী মায়ের দিব্য খেয়ালপ্রসূত মায়ের আশীর্ব্বাদপূত বারাণসী আশ্রমের প্রাণকেন্দ্র শ্রীশ্রী মা আনন্দময়ী কন্যাপীঠে প্রতি বছরই কয়েকটি উৎসব বিশেষভাবে পালিত হয় যেমন — বার্ষিকোৎসব, সংস্কৃত দিবস, স্বাধীনতাদিবস ও গণতন্ত্রদিবস প্রভৃতি। এবারেও ১৫ই আগষ্ট কন্যাপীঠে সুষ্ঠুভাবে স্বাধীনতা দিবস পালিত হয়েছে।

গত ২১শে আগষ্ট কন্যাপীঠে সংস্কৃত দিবস অনুষ্ঠিত হয়। এই উপলক্ষ্যে কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাধ্যাপক ডা: শ্রী নারায়ণ মিশ্রজী সভার অধ্যক্ষতা করেন এবং মুখ্য অতিথি হন প্রসিদ্ধ ভাগবত বক্তা শ্রী অশোকভাই কুলকর্ণীজী ও বিশিষ্ট অতিথি ছিলেন কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাধ্যাপক ডা: শ্রী কমলেশ ঝা। কন্যাদের দ্বারা বিবিধ কার্য্যক্রম সংস্কৃত ভাষায় অনুষ্ঠিত হয়। এরপর পণ্ডিত কমলেশ ঝা সংস্কৃত ভাষার মহিমার বিষয়ে বলেন। শ্রদ্ধেয় শ্রী অশোক ভাই বললেন, "ভাষা ভাবের অভিব্যক্তি করে। শ্রীশ্রী মা বলেন যে এমন একটি স্থিতি আছে যে সেখানে পৌঁছালে আপনা হতেই সকল ভাষার উদ্গম হয়। সেই স্থিতি লাভের জন্য সংস্কৃত ভাষাই সর্বাধিক সহায়ক। সংস্কৃত ভাষার বৈশিষ্ট্য হল বিভিন্ন উপসর্গের দ্বারা একটি শব্দের বিভিন্ন অর্থ করা যেতে পারে। উদাহরণার্থ ভাগবতের গোপীগীতের উল্লেখ করলেন। আর বললেন যে মায়ের সূত্ররূপে এক একটি বাণীতে যেমন বিরাট অর্থ নিহিত আছে তেমন বিন্দুতে সিন্ধুর মতই সংস্কৃত ভাষার এক একটি শব্দতেও বিপুল অর্থনিহিত আছে। শ্রীনারায়ণ মিশ্রজী বললেন যে এখানে কন্যাদের সংস্কৃত সম্ভাষণের পটুতা দেখে মনে হয় যে সংস্কৃত ভাষা চিরকাল উজ্জীবিত হয়ে থাকবে। পরাবিদ্যা (ঔপনিষদ্ বিদ্যা) ও অপরাবিদ্যা (বিজ্ঞান প্রভৃতি অর্থকরী বিদ্যা) দুইটির জন্যই সমানভাবে সংস্কৃত ভাষার জ্ঞানের উপযোগিতা রয়েছে। অন্তে ধন্যবাদ জ্ঞাপনের দ্বারা সভার পরিসমাপ্তি ঘটে।

মাতা আনন্দময়ী চিকিৎসালয়, বারাণসী :

গত ১৫ই আগষ্ট স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষ্যে মাতা আনন্দময়ী চিকিৎসালয়ে বিশেষ কার্য্যক্রম অনুষ্ঠিত হয়। উত্তর প্রদেশের বিত্তমন্ত্রী শ্রীহরিশচন্দ্র শ্রীবাস্তবজী মুখ্য অতিথি রূপে এসে হাসপাতালে রাষ্ট্রীয় পতাকা উত্তোলন করেন। কন্যাপীঠের কন্যাদের 'বন্দে মাতরম্' গানে হাসপাতালের প্রাঙ্গণ মুখরিত হয়ে ওঠে। পরে হাসপাতালের সভাগারে কন্যাদের দেশগীতি ও রাষ্ট্রগানের পর মুখ্য অতিথির পদ হতে শ্রীহরিশচন্দ্র শ্রীবাস্তবজী বলেন, "আজ বন্দে মাতরম্ গাইছে। পতাকা উত্তোলন করা হচ্ছে। কিন্তু একদিন এমন ছিল যে শুধু মাত্র একবার 'বন্দে মাতরম্' বলার জন্য প্রাণ দিতে হয়েছিল একজনকে। তিনি ভারত জননীর বীর পুত্র শ্রীচন্দ্রশেখর আজাদ। পতাকা উত্তোলন করতে গিয়ে কত শত মাতঙ্গিনী হাজরাদের মৃত্যু বরণ করতে হয়েছে তার ইতিহাস কে রাখে? আজ আমরা স্বাধীন। স্বাধীন ভারতের স্বাধীন নাগরিক আমরা। আমাদের এমন কিছু করা উচিত নয় যাতে পরস্পরের ভালবাসা কুণ্ঠিত হয়। আজকের দিনে আমাদের লৌহপুরুষ সরদার বল্লভভাই

প্যাটেলকেও শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করা উচিত কারণ তিনিই সর্ব প্রথম সমগ্র ভারতকে একটি সংঘরাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন। আজ রোম, গ্রীক প্রভৃতি প্রাচীন সমৃদ্ধ শালী সাম্রাজ্য ধূলিসাৎ হয়েছে দেখতে পাই। কিন্তু প্রায় ১২০০ বছর পরাধীন থাকার পর কঠিন সংঘর্ষ করে আজও ভারত সকলের সামনে মাথা উঁচিয়ে গৌরবের সঙ্গে দাঁড়িয়ে আছে। এখানেই ভারতের সুমহান মহিমা।" বিধায়ক শ্রী শ্যামদেব রায় চৌধুরীও সুন্দর ভাষণ দেন।

গত ৬ই সেপ্টেম্বর Inner Wheel Club Varanasi North এর মাধ্যমে হাসপাতালে স্ত্রীরোগ বিভাগের জন্য ৪০,০০০/- হাজার টাকার যন্ত্রাদি ও উপকরণ প্রদান করা হয়েছে। এই উপলক্ষ্যে একটি বিশেষ অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা হয়েছিল এবং অনেকেই উপস্থিত ছিলেন।

গত ১২ই সেপ্টেম্বর Varanasi Metro Junior Chamber দ্বারা হাসপাতালে দু:স্থ ও গরীব রোগীদের জন্য বেশ কয়েক হাজার টাকার মূল্যবান অনেক ওষুধ ও ইনজেক্সন আদি দেওয়া হয়েছে এবং সেই সঙ্গে দুটি অক্সীজেন সিলিণ্ডরও প্রদান করেন। শ্রীশ্রীমার শ্রীমুখনি:সৃত বাণী "কাশী বিশ্বনাথ ধাম মুক্তিক্ষেত্র জন জনার্দ্দন সেবা" এই হাসপাতালের মূখ্য আদর্শ। প্রতিমাসে প্রায় পনের হাজার টাকার মত ওষুধ আদি সাধু সন্ন্যাসী ও গরীব রোগীদের সম্পূর্ণ বিনা মূল্যে হাসপাতাল থেকে নিয়মিত ভাবে দেওয়া হয়ে থাকে সেই জন্য উপস্থিত অনেকেই হাসপাতালের সেবার বিশেষ প্রশংসা করেন এবং Junior Chamber এর পক্ষ হতে হাসপাতালের কর্ত্তৃপক্ষদের বিশেষ স্মৃতিচিহ্ন প্রদান করা হয়।

তারাপীঠ আশ্রম :

প্রসিদ্ধ সাধক শ্রীবামাক্ষ্যাপার তপোভূমি শ্রীশ্রী তারামায়ের সিদ্ধ পীঠস্থান তারাপীঠে শ্রীশ্রীমায়ের আশ্রমে গত ৪ঠা ও ৫ই জুলাই গুরুপূর্ণিমার বিশেষ উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এই উপলক্ষ্যে গুরুপূর্ণিমার পূর্বদিন সন্ধ্যায় অধিবাস ও আরতির পর সৎসঙ্গ, ভক্তবৃন্দের দ্বারা ভক্তিগীতি, নাম কীর্তন ও রামায়ণ গান ইত্যাদি অনুষ্ঠিত হয়। পরদিন গুরু পূর্ণিমার পুণ্য তিথিতে স্থানীয় মন্দির সমূহে বিশেষ পূজা, নগর ভ্রমণ ও কীর্তন, পূজা, হোম, ভোগারতি, গীতা চণ্ডীপাঠ, কীর্তন এবং শিব মন্দিরে বেদপাঠ, রুদ্রাভিষেক, সাধু ভাণ্ডারা ও নর নারায়ণ সেবা সম্পন্ন হয়। সন্ধ্যায় ভক্তবৃন্দের দ্বারা ভক্তিগীতি, মা নাম, সৎসঙ্গ ও আনন্দ মিলনোৎসবের সমাপ্তি হয়।

পুণা আশ্রম :

শ্রীশ্রী মায়ের গ্রীষ্মকালের বিশ্রামস্থলের মধ্যে অন্যতম চমৎকার আবহাওয়া যুক্ত এই পুণা নগরীতে মায়ের সুন্দর আশ্রমে গুরুপূর্ণিমার পুন্যময় লগ্নে গুরুপূর্ণিমা মহোৎসব খুব ধুমধামের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয়। এই উপলক্ষ্যে শ্রীশ্রী মায়ের বিশেষ পূজা, ভজন, কীর্তন, হোমের পর সকলে মহা প্রসাদ গ্রহণ করেন।

গত ১১ই আগষ্ট রাত্রিতে জন্মাষ্টমীর বিশেষ পূজাও অনুষ্ঠিত হয়। এই উপলক্ষ্যে রাত

১২টার সময় ঠিক শ্রীকৃষ্ণর জন্মের ক্ষণে মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত শ্রীরাধা গোবিন্দ ও শ্রী গোপালজীর বিশেষ পূজা এবং রাত্রি ৯টা হতে মধ্য রাত্রি পর্য্যন্ত কীর্তন চলতে থাকে। পূজার পর প্রসাদ বিতরণ করা হয়।

বৃন্দাবন আশ্রম :

গোপীজনচিত চোর রাসবিহারী শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের চিন্ময়ী লীলাভূমি শ্রীধাম বৃন্দাবনে গত ২৩শে জুলাই হতে ৪ঠা আগষ্ট শ্রীশ্রী রাধা কৃষ্ণ-ছলিয়াজীর ঝুলনোৎসব সুন্দরভাবে অনুষ্ঠিত হয়। এই উপলক্ষ্যে ২৩শে জুলাই হতে ৪ঠা আগষ্ট প্রতিদিন প্রখ্যাত রাস মণ্ডলী দ্বারা রাসলীলা ও প্রতিদিন সন্ধ্যায় রাধাকৃষ্ণ ছলিয়াজীর বিশেষ ঝুলন পূজা উদ্‌যাপিত হয়। ৩১শে জুলাই শ্রদ্ধেয় ভাইজীর তিরোধান তিথি পূজা অনুষ্ঠিত হয়। ৪ঠা আগষ্ট ঝুলন পূর্ণিমার দিন উদয়াস্ত অখণ্ড শ্রীহরিনাম সংকীর্তন, প্রাতে বেদপাঠ, শ্রীবিষ্ণু সহস্রনাম পাঠ, ভজন, কীর্ত্তন, শ্রীশ্রীরাধা কৃষ্ণ, শ্রীশ্রী মা, শ্রীশ্রী নিত্যানন্দ গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু এবং ভগবান শিবের ষোড়শোপচারে বিশেষ পূজা, মধ্যাহ্নে ভোগ, আরতি, সাধু সেবা প্রভৃতি আয়োজিত হয়।

১১ই আগষ্ট জন্মাষ্টমীর পুন্য তিথিতে প্রাতে শ্রীকৃষ্ণ ছলিয়ার পাটোৎসব এবং রাত্রি ১১টা হতে শ্রীকৃষ্ণ জন্মাষ্টমী বিহিত বিশেষ পূজা অনুষ্ঠিত হয়।

২৬শে আগষ্ট মন্দিরে শ্রীশ্রী রাধা অষ্টমীর পূজা অনুষ্ঠিত হয়।

দিল্লী আশ্রম :

ভারতের প্রাণকেন্দ্র দিল্লী নগরীতে শ্রীশ্রী মায়ের আশ্রমে স্বামী আশীষানন্দের পুণ্য স্মৃতিতে ২৬শে আগষ্ট হতে ২রা সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত শ্রীমদ্ভাগবত সপ্তাহ মহাযজ্ঞ আয়োজিত হয়। শ্রীধামবৃন্দাবনের সুপ্রসিদ্ধ ভাগবত বক্তা স্বামী রুদ্রদেবানন্দজী ভাগবতের সুললিত ব্যাখ্যা করেন। ৩রা সেপ্টেম্বর প্রাতে হোম, সাধু সেবা এবং ব্রাহ্মণ সেবা করানো হয়।

কোলকাতা :

কলা ও কৃষ্টির উৎসভূমি মহানগরী কোলকাতাতে আগরপাড়া আশ্রমেও গত ২৬শে আগষ্ট হতে ২রা সেপ্টেম্বর ভাগবত জয়ন্তী সপ্তাহ পারায়ণের আয়োজন হয়। স্বামী নির্মলানন্দজী মধুর ভাষায় বাংলায় ভাগবতের সুললিত ব্যাখ্যা করেন। ভাগবত শ্রবণে সকলে অনাবিল আনন্দ অনুভব করেন।

রাঁচী আশ্রম :

ঝাড়খণ্ডের রাজধানী রাঁচী নগরীতে শ্রীশ্রী মায়ের আশ্রমে ৫ই অক্টোবর হতে ১০ই অক্টোবর পঞ্চদিবসীয় জ্ঞানযজ্ঞ পারায়ণ আয়োজিত হয়েছে। কৈলাস পীঠাধীশ্বর মহামণ্ডলেশ্বর স্বামী

বিদ্যানন্দগিরিজী মহারাজ শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতার শাঙ্কর ভাষ্য পারায়ণ, বিষ্ণু সহস্রনাম ভাষ্য পারায়ণ এবং কঠোপনিষদের বিদ্বতাপূর্ণ প্রবচন করবেন।

জামশেদপুর আশ্রম :

উদ্যোগ নগর জামশেদপুরে শ্রীশ্রী মায়ের আশ্রমে গত ৪ঠা জুলাই সন্ধ্যায় মাতৃ নামকীর্তন ও শ্রী সুজিত কুমার চক্রবর্ত্তী (দাদাজীর) উপস্থিতিতে সৎসঙ্গ হয়। ৫ই জুলাই শ্রীশ্রী গুরু পূর্ণিমা উপলক্ষ্যে শ্রীশ্রী মা ও স্বামী মুক্তানন্দ গিরিজীর বিশেষ পূজা, সমবেত নাম জপ, বিষ্ণু সহস্র নাম পাঠ, ভোগারতি, ভাণ্ডারা ইত্যাদি এবং ২৭শে জুলাই শ্রী গিরিজীর তিরোধান তিথি উপলক্ষ্যে গিরিজী বিশেষ পূজা অনুষ্ঠিত হয়। ২৭শে আগষ্ট সৎসঙ্গ, মাতৃবাণী পাঠ, নামকীর্তন ইত্যাদি অনুষ্ঠিত হয়।

আশ্রম প্রাঙ্গণে অতিথি ভবন উদ্ঘাটন, ত্রিশুরের স্বামী ভূমানন্দের আশ্রম প্রাঙ্গণে পদার্পণ ও সৎসঙ্গ এবং আমন্ত্রিত সাধুজনের সৎসঙ্গ ইত্যাদির অনুষ্ঠান, নিয়মিতভাবে প্রতি পূর্ণিমা দিবসে শ্রীশ্রী সত্যনারায়ণ পূজা, প্রতি অমাবস্যায় বিশেষ কালীপূজা ও প্রতি শনিবার শ্রীশ্রী শনি পূজার অনুষ্ঠান ইত্যাদি বিশেষ উল্লেখনীয়।



আগামী উৎসব সমূহ

১.	শ্রীশ্রী শারদীয়া দূর্গাপূজা	...	২২ - ২৬ অক্টোবর
২.	শ্রীশ্রী লক্ষ্মী পূজা	...	৩১ অক্টোবর
৩.	শ্রীশ্রী কালী পূজা	...	১৪ নভেম্বর
৪.	অন্নকূট উৎসব	...	১৫ নভেম্বর
৫.	সংযম সপ্তাহ	...	২৩ নভেম্বর
৬.	রাস পূর্ণিমা	...	৩০ নভেম্বর
৭.	গীতা জয়ন্তী	...	২৬ ডিসেম্বর

মা আনন্দময়ী বিদ্যালয়, আগরতলা

শ্রীশ্রী মায়ের দিব্যখেয়ালে ত্রিপুরা রাজ্যের রাজধানী আগরতলায় রাজপ্রাসাদের সংলগ্ন ভূমিতে নবপ্রতিষ্ঠিত আশ্রম ভবনে যে অপূর্ব্ব সুন্দর দেবী সরস্বতী বিগ্রহ আজ হতে দীর্ঘ ১৯ বছর আগে স্ব-হস্তে শ্রীশ্রী মা স্থাপিত করে গিয়েছেন তারই মূর্ত প্রকাশ এই মা আনন্দময়ী বিদ্যালয়।

ত্রিপুরা নরেশ মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর মাণিক্য বাহাদুরের ঐকান্তিক আগ্রহে 'ত্রিপুরা-কন্যা' বিশ্ববন্দিতা মায়ের শ্রীচরণে প্রাসাদ-সংলগ্ন সরোবরের পূর্ব্বপাড়ে অবস্থিত প্রসিদ্ধ উমা-মহেশ্বর মন্দির সহ যে বিস্তৃত ভূ-খণ্ড অর্পিত হয়েছিল সেই ভূমিতে শ্রীশ্রী মায়ের এক অপূর্ব্ব খেয়ালে আশ্রম ভবনের ভিত্তিস্থাপনের সাথে সাথেই ক্রমাগত তিনবার মৃন্ময়ী সরস্বতী প্রতিমার উপর শ্রীপঞ্চমী তিথিতে বিশেষ সমারোহের সাথে পূজা সম্পন্ন হয়েছিল। তারই পরে ১৯৮২ সনের চৈত্র নবরাত্রিতে শ্রীশ্রী মা স্বয়ং এসে ঠিক সেই স্থানেই অতি গোপনে সাথে নিয়ে আসা দেবী সরস্বতীর মর্ম্মর বিগ্রহ স্বহস্তে স্থাপনা করে যান। শত শত ভক্ত নরনারী তা দর্শন করে ধন্য হয়েছে। কিন্তু এই দিব্য খেয়ালের মূল সূত্র যে কি তা আজও সকলের নিকট অজ্ঞাতই রয়ে গিয়েছে।

ত্রিপুরা মহারাজারই বদান্যতায় আশ্রমের অতি সন্নিকটে স্থিত আরো একটি ভূ-খণ্ড মায়ের চরণে অর্পিত হয়েছিল। আগরতলা হতে বিদায় নেবার প্রাক্কালে সেই ভূমিটি দেখে শ্রীশ্রী মার শ্রীমুখ থেকে প্রকাশ হয়েছিল, "দেখ, এই জায়গাটিতেও পরে কোনও ভাল কাজ হতে পারবে।"

পরাবিদ্যাদায়িনী মা সরস্বতী স্বয়ং স্থানীয় ভক্তবৃন্দকে অন্ত:প্রেরণা দিলেন যে এই স্থানটির যথার্থ সদুপয়োগ হবে শ্রীশ্রী মায়ের আদর্শে স্থাপিত একটি বিদ্যালয়ের স্থাপনা দ্বারা। সকলের বিশেষ প্রচেষ্টায় এবং স্থানীয় এম.পি. শ্রী সুধীর রঞ্জন মজুমদারের সহযোগিতায় এম.পি. ফাণ্ড থেকে পাওয়া দুই লক্ষ টাকায় বিদ্যালয় ভবন নির্ম্মাণের কাজ আরম্ভ হয় ১৯৯৯ সরস্বতী পূজার পর হতে এবং পর বছর রথযাত্রার শুভদিনে ৩রা জুলাই, ২০০০ সনে কোনও ভাবে মাত্র চারটি ঘর সম্পূর্ণ হওয়ার পরই এই বিদ্যালয়ের শুভারম্ভ সম্ভব হয়েছে শ্রীশ্রীমারই বিশেষ খেয়ালে। আনুমানিক সাড়ে তিন লক্ষ টাকার উপর এ যাবৎ ব্যয় হয়েছে এবং এখনও প্রচুর কাজ অসম্পূর্ণ রয়ে গিয়েছে। এই বিশেষ কাজে যাঁরা স্বত:প্রবৃত্ত হয়ে এগিয়ে এসেছেন এবং নানাভাবে সহায়তা করেছেন তাঁদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য শ্রদ্ধেয় স্বামী ভাস্করানন্দজী মহারাজ, ব্র. নির্ব্বাণানন্দজী, স্বামী নির্গুণানন্দজী, মা আনন্দময়ী সেবা সমিতি (অ্যামেরিকা), ডা. বিপিন ভট্ট (অ্যামেরিকা), স্বামী সত্যানন্দজী (হাওয়াই আশ্রম), শ্রী মোহন মুরজানী পরিবার (ইংল্যাণ্ড), শ্রী ভূপেন্দ্র সিংহ রাঠোর (আমেদাবাদ), শ্রীমতী শুভ্রা মুখার্জী, শ্রী চিত্তরঞ্জন দাস, শ্রী বাণীব্রত সাহা, শ্রী কুমুদ বন্ধু সাহা, শ্রী প্রিয়ব্রত ভট্টাচার্য্য, ৺মধুসূদন চক্রবর্ত্তী, শ্রী তড়িৎ মোহন দাসগুপ্ত, শ্রী বিদ্যুৎকান্তি রায়, শ্রী অনিল সাহা, শ্রী কেশব সাহা, শ্রী বাসুদেব ভট্টাচার্য্য, শ্রী দেবু ব্যানার্জী প্রভৃতি।

বর্তমানে শ্রীশ্রী মায়ের নামে পরিচালিত এই বিদ্যালয়টিতে নার্সারী থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্য্যন্ত ছোট-ছোট বাচ্চাদের পড়ানো হয়। ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা মোট ২৮জন এবং শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীরা ৪জন। প্রধান শিক্ষক রূপে ব্রতী আছেন শ্রীশ্রী মায়ের অনুরক্ত ভক্ত শ্রী প্রিয়ব্রত ভট্টাচার্য্য।

নানা ভাবে এই বিদ্যালয়টির শ্রীবৃদ্ধি বিশেষ প্রয়োজন। যথা, বিদ্যালয়ের জন্য আবশ্যকীয় ফার্নিচার ও লাইব্রেরীর উপকরণ এবং আরো কয়েকটি ঘরের নির্ম্মাণ। এই উদ্দেশ্যে যাঁরা স্বেচ্ছায় এগিয়ে আসবেন তাঁরা যে অবশ্যই মা সরস্বতী ও শ্রীশ্রী মায়ের কৃপা লাভ করবেন সে বিষয়ে আমরা নি:সন্দেহ। যত সামান্যই দান হোক তা অত্যন্ত আদরের সঙ্গে গ্রহণ করা হয় এবং স্বভাবত:ই কোন বড় অনুদান আয়কর নিয়ম অনুসারে করমুক্ত হবে।

পত্র ব্যবহার এবং যে কোনও প্রকার সাহায্য পাঠাবার ঠিকানা —

সেক্রেটারী
শ্রীশ্রী আনন্দময়ী সংঘ
(মা আনন্দময়ী আশ্রম স্কুল ফাণ্ড)
প্যালেস কম্পাউন্ড, পোঃ আগরতলা-৭৯৯০০১
ত্রিপুরা (পশ্চিম)



শোক সংবাদ

শ্রী সনৎ কুমার চ্যাটার্জ্জী—

গত এপ্রিল সংখ্যা অমৃতবার্তায় কোলকাতা বাসী মাতৃভক্ত শ্রী সনৎ কুমার চ্যাটার্জ্জীর গত ১১ই ফেব্রুয়ারী কোলকাতায় পরলোক গমনের সংবাদ মাত্র প্রকাশিত হয়েছিল। কিন্তু বিবরণ কিছু প্রকাশ করা সম্ভব হয়নি তখন।

শ্রী সনৎ কুমার চ্যাটার্জ্জী ছেলেবেলা থেকেই ছিলেন অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র। ম্যাট্রিক, ইন্টার এবং বি.কম. সব পরীক্ষাই তিনি স্কলারশিপ নিয়ে পাশ করেছিলেন। এই সব স্কলারশিপের টাকা তিনি নিজের জন্য খরচ করেন নি। গরীব ছাত্র ছাত্রীদের পড়াশুনোর জন্য দান করে গেছেন সারা জীবন। এম.কম. পরীক্ষাও তিনি বিশেষ যোগ্যতার সঙ্গেই উত্তীর্ণ হন এবং বিদেশে ব্যাঙ্কের কাজে প্রথমেই ছিলেন প্রায় সাড়ে পাঁচ বছর। ১৯৬৯ সনে রাঁচীতে গেলেন ইউকো ব্যাঙ্কের ম্যানেজার হয়ে। বিখ্যাত হয়ে উঠলেন একজন কর্মদক্ষ ম্যানেজার হিসেবে। সেখানেই দেখা হল শ্রীশ্রী মায়ের সঙ্গে। অন্তর থেকে বরাবরই ছিলেন আধ্যাত্মিক। মায়ের সঙ্গে দেখা হওয়ার পর তা এক নতুন রূপ পেলো। নিয়মিত যাওয়া শুরু করলেন মায়ের আশ্রমে। সস্ত্রীক দীক্ষা নিয়েছিলেন ১৯৭৩ সনে। যখনই মা রাঁচীতে আসতেন দেখা করতে যেতেন মায়ের সঙ্গে। অংশ গ্রহণ করতেন নাম-গান-আধ্যাত্মিক আলোচনায়।

১৯৮৫তে কোলকাতায় বদলী হলেন Assistant General Manager হয়ে। কিন্তু বিহারে থাকাকালীন যে অমানুষিক পরিশ্রম করেছিলেন, তারই ফলস্বরূপ তিনি অসুস্থ হয়ে পড়লেন কয়েক মাস পরেই এবং স্বেচ্ছায় অবসর গ্রহণ করেন। বরাবর ঘড়ি ধরে কাজ করা পছন্দ করতেন। এমন কি পূজোটাও। মা তাই মজা করে বলেছিলেন—"বাবাজী আমার ঘড়ি ধরে পূজো করে।" মায়ের কথা, "আতার মাঝে কুল দিয়ে পূজো কোরো" (আকুলতা) সারা জীবন অনুসরণ করে গেছেন তিনি। বর্তমান জানুয়ারী মাসের প্রথমেই তিনি বিশেষ অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং অসুস্থতা বৃদ্ধি পাওয়াতে তাঁকে ভর্তি করা হয় নার্সিং হোমে। ১১ই ফেব্রুয়ারী প্রায় ৭৭ বছর বয়সে তাঁর আত্মা বিলীন হল শ্রী মায়ের মহাপাদপদ্মে। অধ্যাত্মবাদে বিশ্বাসী ছিলেন তিনি, তাই মৃত্যুতে তাঁর ভীতি ছিল না। আমরা তাঁর ঊর্দ্ধগতি প্রার্থনা করি ও তাঁর পরিবার জন সান্ত্বনা লাভ করুক মায়ের চরণে জানাই এই প্রার্থনা।

স্বামী দেবানন্দ গিরি—

আশ্রমের স্বামী নির্মলানন্দগিরিজীর গর্ভধারিণী মা স্বামী দেবানন্দগিরিজী গত ১লা জুলাই ৯৪ বৎসর বয়সে চন্দননগরে মহাপ্রয়াণ করেছেন। তিনি বহু বছর পূর্বে মায়ের আশ্রয় পেয়েছেন।

স্বামী মুক্তানন্দগিরিজীর (দিদিমার) কাছে দীক্ষা গ্রহণ করেন। পরবর্তী কালে স্বামী ভাস্করানন্দজীর কাছে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। আমরা মায়ের চরণে তাঁর আত্মার শান্তি ও পরিবার বর্গের জন্য সান্ত্বনা প্রার্থনা করি।

শ্রী অমূল্য চক্রবর্ত্তী—

কোলকাতা যাদবপুর নিবাসী অতি পুরাতন মাতৃভক্ত, অকৃতদার, সমাজসেবী, সর্বজনপ্রিয় শ্রী অমূল্য চক্রবর্ত্তী গত ৭ই আগষ্ট, ২০০১ ৭৪ বছর বয়সে ইহলোক ত্যাগ করে মাতৃচরণে আশ্রয় লাভ করেছেন। তাঁর জন্ম হয়েছিল পূর্ববঙ্গে (অধুনা বাংলাদেশ) ত্রিপুরা জেলায় বিতারা গ্রামে এক অতি সাত্ত্বিক পরিবারে। আশ্রমবাসী প্রাচীন সন্ন্যাসী স্বামী শাশ্বতানন্দজী মহারাজের পূর্বাশ্রমের জ্যেষ্ঠভ্রাতুষ্পুত্র ছিলেন তিনি।

১৯৪৯ সনে তিনি বারাণসী আশ্রমে মায়ের সন্নিধানে আসেন। সেই সময়ে আশ্রমে সাবিত্রী মহাযজ্ঞ চলছিল। অষ্টাদশ বর্ষীয়, সুদর্শন, সাত্ত্বিক যুবকটির প্রতি মায়ের দৃষ্টি পড়ে এবং সাবিত্রী মহাযজ্ঞের হোতা হিসাবে নিয়োগ করার জন্য প্রধান যাজ্ঞিক পণ্ডিত বাটুদাকে নির্দ্দেশ করেন। যজ্ঞের হোতা হিসেবে পূর্ণাহুতির ১৯৫০ সনের ১৪ই জানুয়ারী পৌষ সংক্রান্তির দিন পর্য্যন্ত যজ্ঞ কাজে নিয়োজিত থাকেন। যজ্ঞকালীন সময়েই যজ্ঞ অনুষ্ঠানে আগত উত্তরকাশী নিবাসী খ্যাতনামা মহাত্মা দেবীগিরিজী মহারাজের নিকট হতে দীক্ষা লাভ করেন।

পরবর্ত্তী কালে কর্মজীবনে স্থানীয় অধিবাসীবৃন্দের কাছে তিনি সমাজ সেবী, সৎ ও নিরলস কর্মী হিসেবে বিশেষ প্রশংসিত ছিলেন। স্থানীয় অতিদরিদ্র ও অবহেলিত জনের তিনি ছিলেন অভিভাবকের ন্যায়।

তাঁর এই দীর্ঘ, কর্মময়, কামনা-বাসনা মুক্ত, ঈশ্বরমুখী জীবনের পরিসমাপ্তিতে তাঁর আত্মা শ্রীশ্রী মায়ের চরণে চির শান্তি লাভ করুক এই কামনা করি।



AN APPEAL TO DEVOTEES

CONCERT FOR A CAUSE

A SANTOOR RECITAL

In aid of

MA ANANDAMAYEE

KANYAPEETH & VIDYAPEETH

To be held at Mumbai on Friday, 11th January, 2002.

featuring

Padmabhushan Pt. Shivkumar Sharma

with

Ustad Zakir Hussain
(tabla)



SOUVENIR-2002

To be released on this occasion.

Generous donations towards this noble cause

through advertisements/donations will be greatly appreciated.

Please contact :

Anand Trust : Sadhana Rayon House, Dr. D.N. Road, Fort,
Mumbai - 400 001. Tel. 261 4922

প্রখ্যাত সাহিত্যিক ডঃ বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য্য দ্বারা লিখিত কয়েকটি অমূল্য পুস্তক —

আনন্দময়ী মায়ের কথা — শ্রীশ্রী মার জন্ম শতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে প্রকাশিত অসংখ্য চিত্র সম্বলিত বিস্তারিত জীবন আলেখ্য ; ভারতের রাষ্ট্রপতি মাননীয় ডঃ শঙ্করদয়াল শর্মার ভূমিকা সহ এক অনন্য-সাধারণ গ্রন্থ। রেক্সিন বাঁধাই। প্রকাশক — শ্রীশ্রী আনন্দময়ী সংঘ, কনখল, হরিদ্বার - ২৪৯ ৪০৮, মূল্য - ৩৫০/-টাকা।

গল্পে মা আনন্দময়ী বাণী — গল্পে ও কথায় শ্রীশ্রী মায়ের অমূল্য উপদেশ এবং এই মহাজীবনের বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে আলোচনা ও সংক্ষিপ্ত জীবনী সহ। প্রকাশক - ডি. এম. লাইব্রেরী, ৩২, বিধান সরণী, কলকাতা-৬। দুই খণ্ডে প্রকাশিত। বোর্ড বাঁধাই। মূল্য২৫/-টাকা ও ৪০/-টাকা।

অমৃতের আহ্বান — শ্রীশ্রী মায়ের বিশিষ্ট কিছু বাণীর বিষদ আলোচনা সহ অপূর্ব গ্রন্থ। প্রকাশিকা — শ্রীশ্রী মা আনন্দময়ী সৎসঙ্গ সম্মিলনীর পক্ষে শ্রীমতী অঞ্জলি ভট্টাচার্য্য। এ-বি ১৭৫, সল্টলেক, কলকাতা - ৬৪, সুন্দর প্রচ্ছদপট সহ বোর্ড বাঁধাই। মূল্য - ৫০/-টাকা।

তিন মায়ের কথা — মা সারদা, মা আনন্দময়ী ও শ্রী অরবিন্দ আশ্রমের "মাদারের" অমৃত-জীবনের বিভিন্ন দিক ও তাঁদের সাদৃশ্য সম্পর্কে এক অভিনব পুস্তক। প্রকাশক —সাহিত্য বিহার, ১ বি, মহেন্দ্র শ্রীমানী স্ট্রীট, কলকাতা-৯, বোর্ড বাঁধাই। মূল্য ৩৫/- টাকা। প্রাপ্তি স্থান ঃ সাহিত্য - বিহার ও ওরিয়েন্টাল বুক কোম্পানী। ৫৬ সূর্য্য সেন স্ট্রীট, কলকাতা - ৯।

প্রাপ্তিস্থান ঃ উপরোক্ত সব কয়টি পুস্তকই কলকাতায় স্থানীয় বিভিন্ন প্রকাশক অথবা শ্রীমতী অঞ্জলি ভট্টাচার্য্য, এ-বি ১৭৫, সল্টলেক, কলকাতা - ৬৪ এই ঠিকানায় উপলব্ধ।

"হরি কথাই কথা, আর সব বৃথা ব্যথা।"

— শ্রীশ্রী মা

পেন্‌সিলভেনিয়া আমেরিকাতে স্থায়ী রূপে পঞ্জীকৃত প্রতিষ্ঠান "মা আনন্দময়ী সেবা সমিতি'র পক্ষ হতে পরমারাধ্যা শ্রীশ্রীমায়ের সকল ভক্তজনকে সপ্রেম 'জয় মা' জানানো হচ্ছে।

এই প্রতিষ্ঠানের মুখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে শ্রীশ্রীমায়ের জীবনলীলা ও অমূল্য বাণীর প্রচার, বিবিধ আধ্যাত্মিক কার্য্য সম্পাদন। সৎসঙ্গের পরিচালন, সনাতন ভাগবৎ ধর্ম্মযুক্ত প্রক্রিয়ার পরিচালনা এবং জনজনার্দ্দনের সেবা।

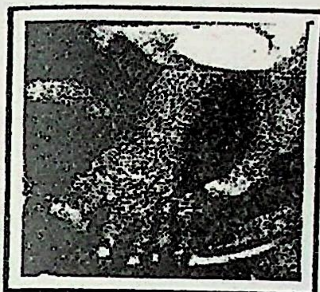
আমেরিকান সরকার দ্বারা এই সমিতি আয়কর হতে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত ঘোষিত হয়েছে —No. 23/2967597/I.R.S Code 501 (C) (3)

আমেরিকা ও নিকটবর্ত্তী দেশসমূহের স্থায়ী রূপে নিবাসী ভক্তদের কাছে অনুরোধ জানানো হচ্ছে যে 'মা আনন্দময়ী অমৃতবার্তা' (ত্রৈমাসিক পত্রিকা যা বাংলা, ইংরাজী, হিন্দি ও গুজরাতী এই চার ভাষায় প্রকাশিত হয়ে থাকে) সেই পত্রিকা এবং শ্রীশ্রী মায়ের দিব্যজীবন লীলা ও অমূল্য বাণী সম্বলিত নানা গ্রন্থ উপরোক্ত সেবা সমিতির কাছ থেকে সংগ্রহ করতে পারেন।

বিস্তৃত বিবরণের জন্য নীচের ঠিকানায় সম্পর্ক স্থাপন করুন —

Dr. Mahadev R. Patel
Ma Anandamayee Seva Samiti Inc.
212 Moore Road
Wallingford, P.A. 19086-6843
Tel : 610-876-6862, Fax : 610-879-1351

ওঁমা শ্রীমা জয় জয় মা ওঁমা শ্রীমা জয় জয় মা ওঁমা শ্রীমা জয় জয় মা



মা আমার আনন্দময়ী, সুখদায়িনী, শান্তিদায়িনী
জন্মদাত্রী মা ত্রিপুরাসুন্দরী, করুণারূপী, কৃপাময়ী,
দয়াময়ী মা আনন্দময়ী, জগৎরূপিনী জগত্তারিণী।

মায়ের শ্রীপাদপদ্মে —

ওঁমা শ্রীমা জয় জয় মা ওঁমা শ্রীমা জয় জয় মা ওঁমা শ্রীমা জয় জয় মা

❅ Branch Ashrams ❅

15. NEW DELHI : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram,
Kalkaji, New Delhi-110019 (Tel : 011-6826813)

16. PUNE : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram,
Ganesh Khind Road, Pune-411007, (Tel : 020-5537835)

17. PURI : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram,
Swargadwar, Puri-752001, Orissa.

18. RAJGIR : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram,
P.O. Rajgir, Nalanda-803116, Bihar (Tel : 06112-55362)

19. RANCHI : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, Main Road,
P.O. Ranchi-834001, Bihar (Tel : 0651-312082)

20. TARAPEETH : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram,
P.O. Chandipur-Tarapeeth, Birbhum-731233, W.B.

21. UTTARKASHI : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram,
Kali Mandir, P.O. Uttarkashi-249193,

22. VARANASI : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram,
Bhadaini, Varanasi-221001, U.P.
(Tel : 0542-310054+311794)

23. VINDHYACHAL : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, Ashtabhuja Hill,
P.O. Vindhyachal, Mirzapur-231307, (Tel : 05442-42343)

24. VRINDAVAN : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram,
P.O. Vrindavan, Mathura-281121 U.P. (Tel: 0565-442024)

IN BANGLADESH :

1. DHAKA : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram,
14, Siddheshwari Lane, Dhaka-17 (Tel : 405266)

2. KHEORA : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram,
P.O. Kheora, Via-Kasba, Brahmanbaria.



REGISTERED WITH THE REGISTRAR OF NEWSPAPERS
FOR INDIA AS NO. 65438/97



रत्ना ऑफसेट्स लिमिटेड कमच्छा, वाराणसी, फोन-३९२८२०